এবং
প্রেম-অপ্রেম

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

প্রকাশক ঃ সানুশ্রী ভট্টাচার্য
পোঃ বালি-দুর্গাপুর
জিলা ঃ হাওড়া,

মুদ্রক ঃ গীতা প্রিন্টার্স
২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ দোলা বসুরায়

এবং

প্রেম-অপ্রেম

কনিষ্ঠা

কন্যা

কৃষ্ণাকে

॥ সূচীপত্র ॥

।। লেখকের দুটি কথা ।।

সব চরিত্রগুলোই আমার সন্তান, কল্পনার পরিবারে একাত্ম। আরও ছিল, আরও আছে। ছাপ রেখে গেছে আমার অনুভবে। সেই অনুভবের কতোটা প্রকাশ পেল তা বলতে পারব না। তবে সকলেই আমার মনে শিবরূপে দীর্ঘ দিনের লালন পেয়েছে। অক্ষরের মূর্ত বাঁধনে গড়তে গিয়ে তাদের কি হাল হল তা পাঠকের বিচার্য।

যারা আমার ইচ্ছে হয়ে ছিল মনের মাঝারে, তারা আমার কনিষ্ঠা কন্যার আগ্রহে আর সুনীল সমীরের ব্যগ্রতায় ছাপাখানার শৃঙ্খলে, গীতা প্রিন্টারস্-এর চেষ্টায় সাধারণের সামনে এসে গেল।

চরিত্রদের স্মরণ করেছি সংবেদনশীল মন নিয়ে, আর এখন সহায়কদের স্মরণ করছি সকৃতজ্ঞ চিত্তে। বাকি রইল অপেক্ষা—পাঠকদের মতামতের। শিব মূল্যায়নে চরিত্রের কৃতিত্ব, অন্যথা আমার অক্ষমতা।

॥ ভূমিকা ॥

অনেকদিন নিজের বইয়ের ভূমিকা লিখে হাত পাকিয়েছি বলে পরের বইয়ের ভূমিকা লেখার অনুরোধ স্বীকার করেছি। শ্রীঅর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের গল্প সংকলন 'এবং প্রেম-অপ্রেম' এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছি। লেখক পেশায় দর্শনের অধ্যাপক, নেশায় জীবনের রূপকার। তাঁর ছোট গল্প জাতে সত্যি ছোট গল্প। কয়েকটি অণু-গল্পও আছে এই সংকলনে। 'পোষা-প্রাণী' শীর্ষকে আছে তিনটি অণু-গল্প : 'বাঘা' 'মুংলি' আর 'মিনি'। গৃহপালিত পশুর প্রতি ভালবাসার মূলে যে universal human compassion তা প্রকাশ করতে লেখক লজ্জিত নন। তা জেনে ভাল লেগেছে। এই compassion-এর অপরদিক সংসারে মার-খাওয়া নরনারীর প্রতি সমবেদনা। তার পরিচয় আছে 'সেই ছেলেটি' 'মেয়ের নাম বন্যা' 'শেষ আভা' 'রুকমিণী' 'সেই ঘুঁটেওয়ালী' 'শিবানী তড়িৎ ও আমি' প্রমুখ গল্পে। শ্রীভট্টাচার্য ভাগ্যের হাতে মার-খাওয়া নরনারীর জীবনের প্রতি একটা গূঢ় আকর্ষণ বোধ করেন বলে মনে হয়। তার ফলস্বরূপ আমরা পেয়ে যাই 'ভাস্করের স্ত্রীভাগ্য' 'শেষ আভা' 'প্রেম অপ্রেম'-এর মতো গল্প। ভাস্করের জীবনে পরপর তিনটি নারী এলো, তিনটিই তাকে ঠকাল। 'প্রেম-অপ্রেম' গল্পের মিতা প্রতারিত হল তার প্রেমিক গৌরবের দ্বারা, যে বিয়ে করল তারই দিদি সীতাকে। অথচ মিতার দুঃখ তার দিদিকে নিয়ে, গৌরবের অগৌরব নিয়ে, কেননা সীতা-গৌরবের দাম্পত্য জীবন সুখে ভরে ওঠেনি। মিতা আপন দুঃখ ভুলে সীতা-গৌরবের ব্যর্থতায় ব্যথা পায়। 'শেষ আভা' গল্পের আভাদি জীবন সায়াহ্নে রিক্ত। জীবনের অমোঘ নিয়মে তার ছেলে-মেয়ে অসীম আর সীমা চলে যায় নিজ নিজ জীবন কক্ষপথে। নিঃসঙ্গ আভাদির জীবনে একমাত্র আশ্রয়—প্রতি রবিবারে অসীমের আগমন। শেষ পর্যন্ত সেই প্রতীক্ষাও ব্যর্থ হল। রূঢ় সান্ত্বনাহীন জীবনে মার-খাওয়া মিতা, ভাস্কর আর আভাদি একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। অনুচ্চকণ্ঠে নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে এইসব ভাঙা মাস্তুল নরনারীর ছবি এঁকেছেন লেখক।

স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথের কলমে রচিত হয়েছে এমন কিছু ছোট গল্প যা

কবিতা, এবং এমন কিছু কবিতা যা ছোট গল্প। এই সঙ্গে আরো স্বীকার্য, ছোট গল্পে কাব্যধর্মিতা, বা কাব্যিক মেজাজ থাকলেও তাতে সোশ্যাল রিয়ালিটির প্রকাশ ঘটানো যায়। 'দেবতার গ্রাস', 'ব্রাহ্মণ' 'পুরাতন ভৃত্য' 'দুই বিঘা জমি' 'সাধারণ মেয়ে' 'ছেলেটা' 'ফাঁকি'—এইসব রবীন্দ্র-কবিতা গল্প, সেই সঙ্গে এগুলিতে আছে সোশ্যাল রিয়ালিটি। 'গল্পগুচ্ছে'র বেশ কিছু গল্প যে কাব্যধর্মী, তা লেখা বাহুল্যমাত্র।

শ্রীভট্টাচার্য এই শিল্পসত্য জানেন এবং আয়ত্তে এনেছেন এর শিল্পপ্রকরণ। তার পরিচায়ক প্রথম তিনটি গল্প—'ফড়িং আর প্রজাপতি' 'তুমি ও সময়' 'শালিক'। বস্তুত এই তিনটি গল্পে যে জীবনানুভূতি, কাব্যময়তা, শিল্প-দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তা তারিফ করার মতো। বিশেষত প্রথম গল্পটি। বালকের ফড়িং ও প্রজাপতি আর গল্পের 'আমি'র বাচ্চা ছেলে ও মেয়ে গভীর জীবনবোধ ও সৌন্দর্যবোধে এক হয়ে গেছে।

শতাব্দীর সায়াহ্নে এমনসব গল্প পড়বার সুযোগ দিয়েছেন বলে গল্পকার শ্রীঅর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের কাছে পাঠক হিসেবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

।। পূর্বাভাষ ।।

কিছু গল্প আর কয়েকটি ফিচার নিয়ে সংকলিত এই বইটি পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত। কখনও কৈশোরের আবেগানুভব, কখনও যৌবনের হৃদয়ানুভূতি, কখনও বা প্রৌঢ়ত্বের জীবন-জিজ্ঞাসা রচনাগুলির কেন্দ্রমূলে, কিন্তু সব কিছুকেই এক মানবিক মানদণ্ডে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়াসে লেখকের আন্তরিকতা সর্বত্রই পরিস্ফুট। ভিন্নধর্মী স্বাদের বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল লেখাগুলি পড়ে পাঠক তৃপ্তি পাবেন আশা করা যায়।

কৈশোরের নিষ্কলুষ মমত্ববোধ যে প্রায়ক্ষেত্রেই পোষাপ্রাণীদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় সে বিষয়ে আমাদের অনেকেরই কমবেশি বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে; কিন্তু বহমান সময়ের ভিন্নমুখী স্রোতে মানবসন্তান ও পালিত শাবকের মধ্যে আবেগের যে ঘূর্ণি নিরন্তর দ্বন্দ্বের অভিঘাত আনে যা আনন্দ-বেদনায় প্লাবিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদের দুঃসহ যন্ত্রণার মোহানায় নিমজ্জিত হয়ে যায়, লেখকের বর্ণনায় তার পরিচয় পেয়ে আমরা অভিভূত হয়ে যাই। আর 'মিনি' গল্পের বিড়ালটির ক্ষেত্রে এই বিদায় যখন নিছক মরণ না হয়ে আপন পালক প্রভুর স্বপক্ষে আত্মদানের সামিল হয়ে দাঁড়ায়, তখন অশ্রুসংবরণ করা আমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। 'সেই ছেলেটি' গল্পে সমান কুশলতায় লেখক বর্ণনা করেন জন্মভূমি থেকে উৎপাটিত এক দুঃস্থ আশ্রয়প্রার্থী যুবকের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী যখন বাস্তুহারা জীবনের মনোবেদনা পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়ে যায়। আবার রাজনীতি কেমন করে শূন্যগর্ভ শ্লোগানে পর্যবসিত হয়ে সমাজ-জীবনকে ক্লীব করে রাখে 'শহিদ' গল্পে লেখক তার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাঠকচিত্তকে সজাগ করতে চান। সংগ্রামী নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার অনমনীয় প্রচেষ্টা নিয়েও লেখকের কিছু গল্প এই বইতে স্থান পেয়েছে। 'মেয়ের নাম বন্যা' গল্পের বন্যা এমনই একজন নারী যে মধ্যবিত্ত সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার গণ্ডীবদ্ধ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েও আধুনিক প্রগতিবাদী মননের দীপ্ত-বর্তিকা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে! আর একজন সংগ্রামীনারী রুকমিণী। 'সেই ঘুঁটেওয়ালী' গল্পের লছমীর মা নিম্নবিত্ত পরিবারের এক সংগ্রামী নারী যে স্বামীর অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুরতায় হতবিহ্বল হয়েও অতি সত্বর সব প্রতিকূলতাকে দুই হাতে সরিয়ে আপন দৃঢ়তায় ভাঙ্গা-সংসারকে সাজিয়ে নেয় কেবলমাত্র শুভবোধকে সম্বল করে। সময়ের সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হলে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব যে শুধু-

মাত্র গরমিলের বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে, 'ভাস্করের স্ত্রীভাগ্য' গল্পটি সেই ট্রাজিক পরিণতির এক মর্মস্পর্শী আখ্যান। জীবন স্রোতের ঘূর্ণিজলে তাড়িত হয়েও স্বীয় প্রচেষ্টায় এককভাবে ভেসে থাকা এক স্বপ্নিল নারী প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছে বর্তমান যুগলব্ধ হৃদয়হীনতার প্রতিঘাতে কেমন করে হতাশার অতলে তলিয়ে যেতে থাকে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'শেষ আভা' গল্পে। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতে লেখা 'ফড়িং ও প্রজাপতি' গল্পটি যেন এক আশ্চর্য প্রশান্ত সায়রে নির্মল অবগাহনের মতই ক্লান্তিহরা। স্পন্দনে নন্দিত রমণীয় প্রকৃতির কোলে অজস্র ফড়িং আর প্রজাপতি, দুটি শিশু এবং সংসারী এক প্রৌঢ় কেমন করে যে একাত্ম হয়ে একটি মাত্র সুরের মূর্ছনায় অনুরণিত হতে পারে গল্পটি পড়তে পড়তে পাঠকও কখন নিজের অজান্তেই তার সরিক হয়ে যান।

বইটিতে কিছু প্রেমের গল্পও আছে যার কয়েকটি আবার রোমান্টিকধর্মী। 'শিবানী তড়িৎ ও আমি', 'টোল', 'অপেক্ষা', 'প্রেম-অপ্রেম' ইত্যাদি গল্পে লেখক প্রেমকে দেখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে। পুরুষশাসিত সমাজের মূল-কাঠামোটি যেখানে অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে অথচ স্বাধীনতা স্পৃহায় নারীর অন্তর্লোকে এসেছে মুক্তির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, সেখানে প্রেম বলে সামনে এসে যা দাঁড়ায় তার চলাফেরা নিত্যদিনের প্রয়োজনের সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়ার পর্যায় পর্যন্তই রেখিত হয়ে থাকে, সবকিছু ছাড়িয়ে তার উত্তরণ ঘটেনা সর্বব্যাপ্তির পূর্ণতায়। ভোগবাদী সমাজের আবর্তে পড়ে প্রেম কখনও ভিন্নতর আকাঙ্ক্ষার ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত, কখনও বা বাণিজ্যিক লাভ-ক্ষতির হিসেবী পণ্যমাত্র হয়ে সংশয়-নিপীড়িত। কিন্তু তবু প্রেম তো মানবিক অস্তিত্বেরই কেন্দ্রবিন্দু তাই বাস্তববিক্ষুব্ধ ক্ষেত্রের সীমানা ছাড়িয়ে সময়ের সরোবরে স্বপ্নের তরণীতে নালফুলের আবেশে ভাস্বর হয়ে সে আলো দেয়, ঠিক যেমন শত দুর্যোগ দুর্বিপাকের মধ্যেও অনির্বাণ থাকে শিল্প-চেতনা। 'তুমি ও সময়' গল্পে লেখকের বিশ্লেষণে আপ্লুত পাঠক অনায়াসে চলে যেতে পারেন রোমান্টিক কবি Keats-এর কাব্য-ভাবনায় যেখানে অনবদ্য চিত্রকল্পে কবি বলে ওঠেন, 'Bold lover, never, never canst thou kiss, though winning near the goal—yet do not grieve ; She cannot fade, though thou hast not thy bliss, For ever wilt thou love, and she be fair.'

।। লেখক পরিচিতি ।।

অর্ধেন্দু শেখরের জন্ম পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে যেখানে আদরে ও উপেক্ষায় কেটেছে তাঁর দুরন্ত বাল্যকাল যৌথ পরিবারের বিচিত্রতাপ ও সন্তাপের আকর্ষণ-বিকর্ষণে। সেখানে খেলার মাঠ-প্রান্তর জাঙ্গাল-নদী আর ফলন্ত ফসলের উদার ক্যানভাসে নিকট দূরের সকলেই তাঁর মননে ফেলেছে গভীর ছাপ। কৈশোরে তিনি পরবাসী অংকন শিল্পী হবার একাগ্র প্রত্যাশায়, কিন্তু স্থানীয় ও পারিবারিক দুর্যোগের যুগপৎ আক্রমণ নান্দনিক জগৎ থেকে উৎপাটিত করে তাঁকে সরাসরি নিক্ষিপ্ত করে কোলকাতায় এবং পরে সেখান থেকে ঢাকায়। শূন্য পুঁজি নিয়ে জীবিকার সন্ধানে এক উদ্যোগ থেকে ভিন্নতর উদ্যোগের বাস্তব পটভূমিতে আশানিরাশার টানাপোড়েনে যথার্থ অবলম্বনের সন্ধানে তিনি তখন অস্থির। সেই সময় রাষ্ট্রবিপ্লবের বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝায় তাঁর জীবনধারা প্রবাহিত হয় ভিন্নতর খাতে। বৃদ্ধ পিতামাতা আর নাবালক ভ্রাতা ভগিনীরা সদ্য স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে যাতে ছিন্নমূল আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়ে অনেকের মত নিঃশেষে হারিয়ে না গিয়ে উন্নত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার সতেরো বছরের এই তরুণকে নিতে হয় নিজস্কন্ধে। সেই কর্তব্য কঠোর ভাবে পালন করার পথে আর কোনও দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত তাঁর মেলেনি। ভিতরের ও বাইরের পর্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্নকে সরিয়ে সরিয়ে এক অবস্থান থেকে উন্নততর অবস্থানে উত্তরণের অবিরাম যে ঘটনাপুঞ্জ তাঁর দৃঢ়চিত্ত যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের দিনগুলিকে সতত দুর্বার গতিসম্পন্ন করে রেখেছিল সেই পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্থার অনুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত অন্যতর এক প্রসঙ্গ! কিন্তু মানসিক ভাবে সুস্থিত হতে হতে আর না হতে হতে সময় তাঁকে পেঁছে দেয় বার্ধক্যের মধ্যপর্বে যখন সরকারী কলেজের কৃতি অধ্যাপক হিসেবে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় সমাসন্ন। আর এই পর্যায়েই তাঁর কোমল শিল্পীমনে সুদীর্ঘদিন ধরে জমে ওঠা বিচিত্র অনুভবগুলো প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্যকেই অবলম্বন করে নেয়। অধুনা সুখ্যাত এক সাপ্তাহিকে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, এবং অতঃপর আরও হতে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস, কারণ অমৃতের সন্ধানে আজও তিনি এক ক্লান্তিহীন তরুণ পথিক। সাহিত্যের

অঙ্গনে অধ্যাপক অর্ধেন্দু শেখরের প্রবেশ বিলম্বিত অবশ্যই, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। ঘটনার ঘনঘটা যদিও তাঁকে তাড়িত করেছে স্থান থেকে স্থানান্তরে যখন মাঝে মাঝেই ঘটেছে তাঁর আকস্মিক প্রান্তবদল, তবুও তাঁর শিল্পীসত্বা প্রত্যয়ের বর্তিকায় ভাস্বর হয়ে অনুশীলনে অর্জিত অভিধার ধারায় সুস্নাত হতে হতে সর্বদাই সৃষ্টিশীল থেকেছে তাঁর অন্তরের নিভৃত উপত্যকায়।

তাঁর রচনায় সমান গুরুত্বে উন্মোচিত একদিকে হৃদয়সঞ্জাত সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতি অন্যদিকে মেধানির্দেশিত শানিত বিচারবোধ। আর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির সবুজ, আকাশের নীল, পাখির গান এবং বাতাসের মৃদু ব্যজন। ছোট ছোট স্পর্শের মতো। (এবং জলবাংলার মনচিত্র)। নারীর স্নেহ-বিশ্বাস-ভালবাসার প্রেরণা আশ্চর্য যাদুমন্ত্রের মত কি ভাবে পুরুষকে ও পরিবারকে সমৃদ্ধ করে তোলে তা যেমন তাঁর লেখায় উদ্ভাসিত, পুরুষ শাসিত সমাজে অত্যাচারিত নারীর যন্ত্রণার কথাও তেমনি তাঁর গল্পে নিপুণ-ভাবে বিধৃত। (এবং তুমি, এবং প্রেম-অপ্রেম)। আবার ভোগ্যপণ্যবাদী সামাজিক প্রেক্ষাপটে শূন্যগর্ভ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মিক বিপন্নতার বিষয়টিও বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর লেখায় মর্মস্পর্শীভাবে বিশ্লেষিত। (এবং ভাঙ্গাকুলো ; দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা)। এমন কি যখন তিনি ছোটদের জন্য সাবলীল রচনায় মগ্ন তখনও মনে হয় একই সঙ্গে তিনি বড়দের বোধকেও প্রোজ্জ্বল করে তোলেন (এবং ভূত)। আন্তরিকতা ও সংবেদনশীলতার সার্থক মেলবন্ধন সর্বক্ষেত্রেই তাঁর উপস্থাপনাকে রসগ্রাহী করে তুলেছে যা আমাদের মত সাধারণ পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। জড়তামুক্ত প্রকাশভঙ্গির নিজস্ব টেকনিকটি এখন তাঁর আয়ত্বাধীন বলেই মনে হয়। তাঁর পরবর্তী রচনার জন্যেও আমরা তাই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকবো।

—প্রকাশক

লেখকের অন্য বই প্রসঙ্গে মতামতের উদ্ধৃতি

১। এবং তুমি

"আমি ওঁর [অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের] লেখা আগে পড়িনি ; পড়া উচিত ছিল। পাকা হাত, ছোট ছোট ছবি, ছোট ছোট ক্যানভাসে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন, ভাষা মার্জিত, কাহিনী বলার রীতি আধুনিক এবং শেষমেষ মনটা আনন্দ-বিষাদে আপ্লুত হয়ে যায়।…আরও ভাল লাগে স্বর্ণলতার কাহিনী। কী চমৎকার লেখার ঢঙ্।…পাঠককে মুগ্ধ করে।…" —অমিতাভ চৌধুরী।

'এবং তুমি' প্রসঙ্গে শ্রী সুনীল আচার্য বলেন—

"চরিত্রগুলি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত।…কিন্তু নিতান্ত সাদামাঠা সাধারণত্বের মধ্যেও অসাধারণত্বের অন্বেষণে লেখকের আন্তরিকতা সুস্পষ্ট-ভাবে পরিস্ফুট। হৃদ্য আবেদনে সম্পৃক্ত চরিত্রগুলি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্পর্শে সাবলীল ও প্রাণবন্ত হয়ে গল্পকে এক বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করেছে।"

"গল্পগুলিতে পুরুষের মত নারীও এসেছে অনিবার্যভাবেই, কিন্তু লেখকের কলমে তাদের ভূমিকা প্রায় ক্ষেত্রেই এক বিশেষত্বের দ্যোতনা পেয়েছে।" কোথায়ও পাঠক দেখতে পাবেন কেমন করে 'নারী তার আপন বৃত্তে সুস্থিত থেকেই পুরুষের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠতে পারে' অথবা, 'স্নেহ ও প্রেমে পুরুষ ও পরিবারকে ভাঙনের সীমানা থেকে সরিয়ে এনে নিরাপত্তার রাজপথের দিকে চালনা করতে করতে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে', কোথাও পাঠক পাবেন 'লেখকের…অনবদ্য ভাবনার ফসল, মাতৃস্নেহের স্বরূপ উদ্ঘাটনের এক অসাধারণ মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা।' দেখবেন '…উপেক্ষিত শিশুদের স্নেহকাঙাল অন্তরের মন সমীক্ষণ…একটি শিশুর অন্তর্লোক ও বহির্লোকের ক্রমবিকাশের কিছু উজ্জ্বল বিবরণই শুধু নয়, পরিবারের প্রেক্ষিতে প্রবীন ও শিশুর পারস্পরিক চিৎ-অনুভবের আনন্দিত আখ্যানও।' দেখবেন—'একজনের সন্দেহের বিষ কি ভাবে একটি গোটা পরিবারের মানসলোককে এক বিষম ঘূর্ণাবর্তে দিকহীন করে' এবং পাবেন আরও কত মরমী অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি…।

"বইটি তাই সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে,…কঠোর কঠিন এই বাণিজ্যিক যুগ হৃদয়ের নিরিখে কৃপণ বলেই…বিষণ্ণ পাঠকের অতৃপ্ত মন অনুভবে প্রশান্ত হবে"

২। এবং জল বাংলার মনচিত্র

"এবং জল বাংলার মনচিত্র" প্রসঙ্গে ভূমিকায় সুসাহিত্যিক শ্রীশৈবাল মিত্র বলেন—

"অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য-এর 'এবং জলবাংলার মনচিত্র' গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি পাঠের সময়ে আচম্বিতে পুষ্পভারাবনত একটি গাছ আবিষ্কারের রোমাঞ্চ জাগলো।···লেখক এমন এক শৈলী উদ্ভব করেছেন, যার মধ্যে সাহিত্যের পরিচিত আঙ্গিকগুলির প্রায় সব লক্ষণ মিশে স্বতন্ত্র এক আকার গড়ে তুলেছে···"

"অর্ধেন্দুবাবুর স্মৃতিচারণায় দার্শনিকতার সঙ্গে আছে সরসতা, সারল্য।···প্রথম হলেও পরিণত, পোক্ত রচনা। পাকা লাঠিয়ালের মতো পয়লা আঘাতেই তিনি প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেছেন। তাঁর নৈপুণ্যে পাঠক যে বিমোহিত হবেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।"

ঐ একই প্রসঙ্গে বিদগ্ধ পাঠক ও সাহিত্যিক শ্রীসুনীল আচার্য বলেন—

"সচেতনে বা অবচেতনে আবেশময় প্রকৃতির রসে সম্পৃক্ত হয়নি এমন বাঙ্গালীমনন সংখ্যায় সম্ভবতঃ নগণ্য। পটভূমি পূব বাংলার দিগন্ত প্রসারী পরিবেশ প্রতিবেশ এবং মনীষা ··সৃজনশীল, সংবেদনশীল।···সেখান থেকে তুলে আনা কিছু সোনালী ফসলের সম্ভার নিয়ে এই বইটির আত্মপ্রকাশ। এর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকা মুক্তোর ঝিলিক···রসসৃষ্টির নিরিখে তিনি (লেখক) চিরন্তনের পাষাণে নিজের আখর চিহ্নিত করেছেন নিঃসন্দেহে।"

দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা

"দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করার এমন যে এক আলো উদ্ভাসিত সহজ সরল সরণী থাকতে পারে সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্যের লেখায় আমরা অবশেষে তার হদিস পেয়ে যাই। বাংলাভাষী পাঠকের দরবারে এ বিষয়টিতে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে পূর্বসূরির আসনে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

—শ্রীসুনীল আচার্য ॥

৩। এবং ভাঙাকুলো

কবি প্রাবন্ধিক শ্রীসুনীল কুমার নন্দী বলেন—

"ব্যক্তিগত প্রবন্ধমালার একটি মনোগ্রাহী সংকলন।······ভাষারীতি সংযত গতিশীল ও তির্যক-তীক্ষ্ণ; কোথাও গুরুগম্ভীর নয়। ধূসর পাতার জ্ঞান, নীতিবাক্য বা অযাচিত পাণ্ডিত্য বর্ষণের চেষ্টা নেই তাঁর কলমে।"

"গ্রন্থটিতে সর্বসমেত ২৪ টি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংকলিত। এক একটি গদ্য যেন জীবনের এক একটি দিকের পুনর্বিবেচনা। সেখানে ঘুরে ফিরে এসেছে শৈশবের মধুর স্মৃতি, বল্গাহীন তারুণ্য, প্রৌঢ়ত্বের স্থিরতা, বার্ধক্যের সংকট। কিছু গদ্য ··জীবন সম্পর্কে এক সামগ্রিক চিন্তার সূত্র খুলে দেয়···যেন মৌলিক অনুভবের সংহত আবেগময় অভিব্যক্তি।"

"কী ভাবে এক জীবন পাল্টে যায় অন্য জীবনে—সংসারের নিয়মে, প্রকৃতির নিয়মে, রক্তের নিয়মে। একদিন বার্ধক্য এসে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে এবং মানুষ তখন 'ভাঙাকুলো' অথবা 'বেবিসিটার'। এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেখক পরিবেশন করেছেন প্রয়োজনীয় মানসিক আয়োজনসমূহ।"

"গ্রন্থটিতে সময় মনে হয় নিজেই একটি চরিত্র।······যৌবনে মানুষ সময়কে ঝড় হিসেবে পেতে চায়। আবার 'পারানির কড়ির প্রার্থনায় অঞ্জলিবদ্ধ অপেক্ষা যখন অনিবার্য"—তখন যুদ্ধ নয়; স্নিগ্ধ মধুর বাতাসের প্রত্যাশা সময়ের কাছে। এমনতরো মহৎ উপলব্ধির শরিক হবেন পাঠক গ্রন্থটিতে···।"

এবং শ্রীসুনীল আচার্য বলেন—

"···তাই বোধহয় লঘুপদ প্রজাপতির মতই কখনও তিনি মুক্তপক্ষ, শুধুমাত্র বৈচিত্রের ব্যঞ্জনায় ঝংকৃত প্রগাঢ় অনুভূতিগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন তখন তার নন্দিত সঞ্চরণ।·········বিষয় নির্বাচনে আকাশই তাঁর সীমানা। ······এক মনকে নিয়েই কত যে তাঁর বক্তব্য যার বর্ণালি পাঠককে আকর্ষণ করে রাখে। অসংখ্য কঠিন কথা তিনি পর্যাপ্ত সহজ করে বলতে পারেন। ···অভিজ্ঞতার উদ্ভাস রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে দ্যুতি ছড়ায়, কিন্তু আলোর সেই ঝলকানিতে পাঠকচিত্ত ধাঁধিয়ে না গিয়ে ঝলমল করে ওঠে।······শানিত কৌতুকের ঔজ্জ্বল্যে স্নিগ্ধ তাঁর বাকভঙ্গিটির বাঁধন কখনও কখনও এমনই সহজ আর সাবলীল যে পাঠকের পক্ষে বিনা আয়াসেই চড়াই উতরাইগুলো পার হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে যায়; তখন তাঁর মনে হতেই পারে যে জীবনের বাঁকে বাঁকে এত যে কথা আছে পর্বে পর্বে এত যে অনুভাবনা আছে, সেগুলি একান্ত আপন হয়েও এমন করে তো ধরা দেয় নি এতদিন!"

'এবং ভূত' প্রসঙ্গে পাণ্ডুলিপির শ্রোতা-পাঠকেরা কি বলেন ?

তুলিকা (৮)ঃ ডিটেকটিভ গল্প সব থেকে ভাল লেগেছে আমার। আমাদের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি গুলো আছে, ঝগড়া আছে, সেগুলো খুব সুন্দর হয়েছে।

পাপাই (১০)ঃ অনেক মজা আছে। হাদান আর বনমালীর জন্যে কষ্ট হয়েছে। চোর ধরার ব্যাপারটা দারুণ ভাল লেগেছে। অন্য ভূতের গল্পে শুধু ভয় থাকে। তোমার গল্পে আমরা জড়িয়ে গেছি—এটা খুব ভাল লেগেছে। আমাদের ঝগড়াগুলো দারুণ জমেছে।

টুকান (১৩)ঃ ভূত, গোয়েন্দাগিরি, মিনি-পুষি এবং হাজুকাকার ভূত, ছিনাথের ভূত—সব একসঙ্গে এসেছে বলে বেশি ভাল লেগেছে। ছোটদের, আমাদের, ঝগড়া-তর্ক—এসব বেশ নোতুন, বেশ ইন্টারেস্টিং হয়েছে। লেখার মধ্যে একটা মজা যেন সর্বক্ষণ নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। বলার কায়দাটা সব সময়েই টেনে ধরে রাখে।

শ্রীজয় (২২, বিজ্ঞান-ছাত্র) ঃ জোর দিয়েই বলতে পারি যে এই গল্প সম্ভারের প্রতিটা গল্পই নিজ নিজ বিষয় সাপেক্ষে এক একটি ব্যতিক্রম। বিশেষ করে ভূত সম্বন্ধীয় গল্পগুলো আমার পড়া অন্যান্য ভূতের গল্প থেকে একেবারেই আলাদা। আমার মত অন্যান্য যুক্তি এবং বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের এই গল্পগুলি ভাল লাগবে।

সানুশ্রী (অধ্যাপিকা)ঃ কিশোর মনের এলোমেলো চলার সেই চিরচেনা পথে 'এবং ভূত' এক নতুন মোড় এনেছে। লেখকের চিন্তার পরিশীলনে এবং প্রকরণনৈপুণ্যে ফেলে আসা সেই ভূত-প্রেত, পুতুল-মিনির পুরোনো জগৎটাই নতুন চোখে দেখার সুযোগ পেলাম।

সমীর (৬২)ঃ 'এবং ভূত' শুধু ছোটদেরই নয়, বড়দেরও অনাবিল আনন্দ দেবে।

সুনীল (৬২)ঃ 'এবং ভূত' গ্রন্থের গল্পগুলিতে এক মোহময় অথচ দৃপ্ত সুরের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য যা টানটান আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে পাঠককে শেষ পর্যন্ত সজাগ রাখবে। হাজুকাকার চরিত্রটি লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি, যিনি অত্যন্ত নাটকীয় রোমাঞ্চ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছোটদের হাজুদাদু হয়ে সারাসরি গল্পের আসরে হাজির হয়ে সকলকে মাতিয়ে যান। এমন কি শ্রীনাথ বহুরূপীও এসে যায় তাঁর আকর্ষণে।

'এবং ভূত' গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নবতম সংযোজনই শুধু নয়, এক অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষাও।

।। ফড়িং আর প্রজাপতি ।।

নাম কে বা কারা দেয় জানা নেই তবে তারা যে বেশ টায় টায় ঠিক নামটাই ঠিক প্রাণীকে দেয় তা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য এই ব্যাপারটা মানুষের বেলায় অন্যরকম ; বেশিরভাগ নামের নামীরাই আখেরে পস্তায়। পদ্মলোচন ভবিষ্যত জীবনে কানা বলে চালু হতে পারে! কিন্তু কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখির বেলায় প্রকৃতি আর স্বভাব যেন একেবারে নামের মধ্যে অমরতা পেয়ে যায়। ফড়িং নামটা যে শিশু মনে জলতরঙ্গ বাজায় তা সেই মনের জন্যে যতটা তার চাইতে অনেক বেশি ঐ পতঙ্গটির চেহারা, বর্ণবিন্যাস, আর আকর্ষণের জন্যে। বয়স্করা যখন যখন ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন তখনও তাঁদের মনে স্নেহের ললিত বীণাটি অন্তঃস্যূত বাজে। প্রজাপতিকে অন্য কোনও নাম দিলে কি তা চলত ? প্রকাশ পেত তার পাখনার বর্ণবৈচিত্র্য আর হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো, ছুটে চলে যাওয়া ! মানতে পারব না।

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। তখনও আমাদের বাড়ির পাশে পাশে ফাঁকা মাঠ আর সবুজ ঘাসের সমারোহ ছিল। তারা রোজ বিকেলে হাতছানিও দিত। ডাঁটো মনের আর্থিক জিজ্ঞাসার সদাই-আঁটা চশমাখানা সবুজের বদলে দৃষ্টিকে সর্বদাই উপসর্গের মতো অন্যত্র, অন্যকোনওখানে ব্যাপৃত রাখতে ব্যস্ত থাকত। তাই সমাজের চাহিদার চাপে ছানিপড়া চোখে সেই সবুজের ডাক ধরা পড়ত না ! এটা সকলেরই। ঘাসের শিষের ডগায় যে শিশিরবিন্দুটি ঘর থেকে দু'পা বাড়ালেই দেখা যায়, তাকে দেখার না থাকে সময় না থাকে মন। আমাদের চোখে সংগ্রামের আগুন-আর-ছাই ; দৃষ্টিতে প্রকৃতির সবুজ লেপনের অবকাশ কোথায় ?

পুত্রটি সবে হাঁটি হাঁটি পা-পা শেষ করেছে। বিকেল ওকে উত্তেজিত করে বাইরের আকাশ ওকে ডাকে আর সবুজের হাতছানি ওর কচি মনকে স্পর্শ করে করে যায়। তাই বাধ্য হয়েই ওকে নিয়ে বিকেলে মাঠে যাই, ঝিলের ধারে হাঁটা শেখাই আর আকাশের ভাসমান মেঘেদের সঙ্গে পরিচয় করাই। ওর যা নেশা আমার তা কর্তব্য ! নিজের শৈশব অনিবার্য হারিয়ে ফেলেছি ; পুত্রের চোখেই সেই শৈশব যেন ফিরে আসে। ঝলকে, ঝলকে। বয়সের দূর ইতিহাসটা

যেন হারিয়ে যেতে চায়। ওর কাছে যেটা স্বতঃস্ফূর্ত আমার কাছে সেটাই টেনে টেনে আনা। ওর বর্তমান, আমার অতীত; ও চঞ্চল হয়ে ওঠে হাতে-পায়ে, চোখে-মনে, আর আমি স্মৃতির আবেশে।

আমার মনের দরিয়ায় ভেসে চলে বাস্তবের আর প্রয়োজনের চিন্তা-সমস্যার খড়কুটো। আর পুত্রের উচ্ছল জীবনে আনাগোনা করে আকাশে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, ভাসমান মেঘের পালতোলা জাহাজ, ঘাসের উপরে চঞ্চল ফড়িং আর প্রজাপতির রমনীয় ওঠা-বসা, ওড়া-ওড়া খেলা। আমি মাঠের ধারে চটির উপর চেপে বসি পুত্রকে দেখাশোনার কর্তব্যে, আর আমার পুত্রটি ছুটতে গিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলে স্বভাবের আনন্দে।

এই করতে গিয়েই একদিন ও আমাকে একটি ফড়িং-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আপন ভাবনার গভীরে, চিন্তার জালে ক্রমশই জড়িয়ে যাচ্ছিলাম আর যা স্বাভাবিক, সমস্যার সমাধানের বদলে বাড়িয়েই ফেলছিলাম মনে মনে, এমন সময়ে নজর পড়ল আমার পুত্র যেন একলব্য হয়ে কিসের পিছনে স্থির লক্ষ্য হয়ে গেছে। ছোট্ট হাঁটুদুটোর উপর শরীরের ভর রেখে বাঁ হাতে আকাশ ধরে সমতা আর ভারসাম্য বজায় রেখে ডান হাতের ছোট ছোট আঙুলগুলোকে চিমটি করে কি যেন ধরতে চেষ্টা করছে। শিকার বোধহয় দু'পা পিছিয়ে যাচ্ছে কারণ তাকে দেখছি আবার উঠে সেই দু'পা মতো জমি পার করে পূর্বাবস্থায় বসে গিয়ে কি যেন ধরতে চাইছে! অনেকক্ষণই এটা দেখছিলাম তাৎপর্যটি নজরে পড়ল অনেক পরে। এক-দু'পা করে করে সন্তর্পণে কাছে, পিছনে, গেলাম। একটা ফড়িং!

একটা নয়, কাছেই আর একটা। আমিও ওর পাশে ঘাসের উপর ওর মতো করেই বসলাম। দুটোই নয়, মাঠের কাছে দূরে অনেক ফড়িং। উড়ছে ছুটছে আর মাঝে মাঝেই ঝিম ধরে আকাশের মধ্যে ঘাসের পাতা ছুঁই ছুঁই উঁচুতে ভাসছে। পড়ন্ত বেলার রোদ ওদের ডানায় পড়ে ঝলমল করে উঠছে। গ্লাইডারের পাখনার মতো দু'জোড়া পাখনা ওদের ছোট্ট দেহের দু'প্রান্তে শিরাবহুল স্বচ্ছতায় সুন্দর ছড়িয়ে আছে। মাঠের দৃপ্তশির গাঢ়-সবুজ ঘাসের তীক্ষ্ন পাতাগুলো যেন ওদের আরও কাছে পাবার আশায় উচ্চকিত! ওদের ওড়ায় আছে স্তব্ধ গতির অচঞ্চল কম্পন, চলার মধ্যে হঠাৎ গতির দ্রুত ছন্দ। সব ভুলে গিয়ে ওদের সেই স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়াটা মন ভরে

দেখছিলাম ! পুত্রের দৃষ্টি একটি উপবিষ্ট ফড়িং-এর দিকে স্থির। তার অনভিজ্ঞ চোখ যে দূরত্ব মেপে ফড়িংটিকে টিপ করেছে সেই দূরত্বে ওর ছোট্ট হাতটি অবশ্যই বসে থাকা সেই বর্ণোজ্জ্বল পতঙ্গের নাগাল পাবে না ! বসলে ফড়িং-এর ডানাগুলো ভাঁজ হয়ে ঊর্ধ্ব-করজোড় প্রার্থণায় স্থির হয়ে যায়। আমি ক্ষণকাল শিকার আর শিকারীকে দেখলাম, দেখছিলাম। হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে শিকারী ভূমিস্যাত হল অচিরেই। উড়ে গেল ফড়িং !

খিল খিল করে হেসে উঠলাম ! পুত্রও তার অসাফল্য বিষয়ে বিন্দুমাত্র কাতর বোধ না করেই আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে হেসে উঠলো। এবং তৎক্ষণাৎ আবার চার-পা এগিয়ে আর একটা ঊর্ধ্ব-পাখনা করজোড় ফড়িংকে টিপ করল। ফড়িং শুনতে না পায় এমন ফিস্ ফিস্ করে বললাম 'আরও কাছে বসতে হবে তোমার হাতের 'সাইজ' বুঝে তো কাজ করবে !' উবু হয়ে বসা নিজের একছিটে শরীরটাকে কণ্টে ঘষ্টিয়ে একটু সামনে নিল। বলা ভাল যে চেষ্টা করল সামনে টেনে নেবার। কারণ দূরত্ব যা ছিল প্রায় তাই থেকে গেল, পুত্র একটু নড়াচড়া করল মাত্র ! বললাম, 'হবে না'। একটা আঙুল মুখের সামনে পেন্সিলের মতো চেপে ধরে আমাকে কথা বলতে মানা করে অবার প্রচেষ্টায় একাগ্র হল। আমি একবার ফড়িংকে দেখি আর একবার শ্বাপদগতি ঐ শিশুটিকে দেখি ! লড়াই চলছে। চেষ্টা চলছে, নাকি, বলব শিকারী-শিকার খেলা চলছে। প্রাণভরে সবুজের পটভূমিতে এই সবুজের খেলা দেখতে লাগলাম।

মাঠের প্রশস্ত চাদরের প্রতিটি বিন্দুতে এবারে মনোনিবেশ করলাম। ছোট ছোট বিন্দু বিন্দু ঘাস-ফুল চারদিকে নজরে পড়ল। হঠাৎই মাঠময় সেই ফুলেদের উচ্চহাসি উপস্থিতি যেন আমাকে মোহিত করে দিল। ওরাও কি এই পুত্র-ফড়িং 'ধরতে পারো ? ধরতে পারো না !'—খেলা দেখার জন্যে নিজ নিজ গৃহকোণ থেকে মাথা বার করে উঁকি দিচ্ছে ? এক লহমায় গোটা মাঠটাই আমার কাছে একটা বর্ণময় ছবি হয়ে গেল। মাঠের ধারে, একেবারে 'ফ্রেমের' কাছে, যেখানে বেশকিছু নানান জাতের গাছ, সেই গাছে ফুলের সমারোহ, সেখানে দেখলাম অনেক প্রজাপতি। উড়ছে ছুটছে বসছে। নানা বর্ণের পাখার নড়াচড়ায় রামধনুর ছন্দ। সেই দিকে পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম 'ঐ দেখ কতো প্রজাপতি'। একবার নির্দেশিত দিকে চোখ

তুলেই আবার নামিয়ে নিল ; এখন তার স্বপনে-জাগরণে সামনের ঐ ফড়িং ছাড়া অন্য কিছুই নেই। কোনও উড়ন্ত ফড়িং-এ ওর মনোযোগ নেই ; ওর দৃষ্টি বসে থাকা ফড়িং-এর দিকে। কোনও ভাবে ও নিশ্চয়ই বুঝে গেছে যদি ধরা যায় তো ঐ স্থির ফড়িংই ধরা যাবে, উড়ন্তকে ধরা ওর সাধ্যের বাইরে।

পুত্রের আমার ক্লান্তি নাই ; সাধ্য সর্বদাই সাধনার সীমায় ধরা যায় এমন একটা মন নিয়েই যেন ওর পশ্চাদ্ধাবনের এই অফুরন্ত অধ্যবসায় ! বললাম, আঙুল দিয়ে না ধরে থাপ্পর দিয়ে মেরে ধর।' 'মরে যাবেনা ? ওদের মারতে নেই !' জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় আমার দৃষ্টিভঙ্গির 'অপারেশন' হয়ে গেল। পুত্রের দৃষ্টিতে ফড়িং দেখার চেষ্টায় ব্রতী হলাম।

বসে আর দাঁড়িয়ে, পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে, গড়িয়ে গিয়ে ফের এগিয়ে গিয়ে আমার পুত্র ফড়িং ধরার তাড়নায় মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলল। অক্লান্ত, নিরবচ্ছিন্ন। পুত্রের সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে, উবু হয়ে বসে আর হাসতে হাসতে মাঠের মধ্যে বসে পড়ে পড়ে আমার দেহের ভার আর মনের বয়স আমাকে ক্লান্ত করে দিল। 'ধরতে পারলে কি করবে ফড়িং দিয়ে ? কোথায় রাখবে ?' আমার প্রশ্ন শুনে পুত্র অবাক তাকিয়ে বলল 'পুষব !' সেই প্রথম জানলাম যে ফড়িং একটা পোষার মতো বিষয় ! আর বেশি এগুলাম না, হয়তো বাড়ি থেকে খাঁচা আনতে বলে বসবে !

সূর্য অস্ত গেছে বেশ কিছুক্ষণ। বিকেলের শেষ আলোয় পুত্রের মুখে ফড়িং-এর চঞ্চলতা আর সবুজের রং মেখে গেছে। দূরের প্রজাপতিদের আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা বোধহয় যার যার ঘরে ফিরে গেছে। ফড়িংদের সংখ্যাও বেশ কম হয়ে এলো। প্রায় দেখা যাচ্ছে না ওদের। 'ওরা রাত্রে কোথায় থাকে ?' অনায়াসেই জানালাম, 'বাড়িতে'—বলেই বললাম, 'চল আমরাও বাড়ি যাই।' ফেরার পথে ওর প্রশ্নের ঝাঁক আমাকে তাড়া করল। সব প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নেই। ফড়িংরা কি খায় ? ওদের কোন বোন আছে কিনা ? ঘরে আলো জ্বলে কিনা ? ওদের ঠাকুমা আছে কিনা ? কোথায় ওদের ঘর ? ইত্যাদি ইত্যাদি। যথাসম্ভব জবাব দিতে দিতে ঘরে ফিরলাম। 'বললাম, কাল ওদের কাছেই জেনে নেবো সব প্রশ্নের উত্তর !'

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই শুরু হল ফড়িং এর গল্প। 'এত্তো ফড়িং দেখেছি মাঠে। ধরতে পারিনি। কাল যাব। ধরব, পুষব।' পুত্র তার মাকে শ্রোতা করে ফড়িং বিষয়ে আরও নানান কথা বলতে লাগল। বাইরের জামাকাপড় ছাড়িয়ে দিতে দিতে মহিলা মাঝে মাঝেই চোখ বড় বড় করে 'তাই নাকি? সত্যি? ওঃ বাবা!'—করে করে তাল দিতে লাগলেন। ঠাকুমাকে সামনে পেয়ে পুত্র ছুটে গেল। 'কাল তুমি একটা খাঁচা বানিয়ে রাখবে, ফড়িং পুষব।' ঠাকুমা বেচারি অনন্যোপায় সায় দিলেন। বললেন 'কালকের কথা কাল হবে। এখন তো তোমার খাবার সময় হল? চল খাবে।' 'ফড়িংরা কখন খাবে?' ঠাকুমা যেন চোখে দেখা মতো করে বললেন, 'এই তো এখুনি বাড়িতে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নেবে'। এই ফড়িং পর্ব কতক্ষণ চলেছিল মা আর ঠাকুমার ভিব্যাহারে তা আমার অজানা। কারণ ততক্ষণে সবুজ মুছে ফেলে বাস্তবের রুক্ষ ঊষর জমিতে আমার বিচরণের সময় হয়ে গেছে।

পরদিন নানান কাজে আর অকাজে কখন অপরাহ্ণ হয়ে গেছে খেয়াল নেই। ভিতরে, শোবার ঘরে, বেশ আলোড়ন টের পাচ্ছি। অনুনয় বিনয় পর্যায় পার হয়ে চোখের জল আর অন্তরের রোদন কণ্ঠের মোহনায় পৌঁছে গেছে। দৈনন্দিন স্বাভাবিক মাতা-সন্তান সংগ্রাম বলে মন দেই নি। আজ হঠাৎ মনে হল মাতা-পুত্র কণ্ঠ-ঝাপটির চাইতে কোথায় যেন নোতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। একটা সরুকণ্ঠ যেন মাঝে মাঝেই বোবা ভাষায় সঙ্গতের মতো ধ্বনিতে সঙ্গ দিচ্ছে। উচ্চকিত-কর্ণ হতেই আমার মেয়ের অংশ-গ্রহণ বুঝতে পারলাম। অচিরেই ওদের খণ্ডযুদ্ধের ক্ষেত্র বদল হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করল। নাকি সুরে মেয়ে ততক্ষণে শ্রাবনের ধারায় আজকের ফড়িং প্রজাপতি অভিযানে সামিল হবার আব্দার জানাচ্ছে। মা'এর কণ্ঠে 'আর পারিনা'-র সুর বেশ তীক্ষ্ন। 'এখন তুমি এদের সামলাও' বলে আমার কাছে সন্তানদ্বয়কে গচ্ছিত রেখে পিঠ টান দিলেন। তাঁর প্রস্থান পথেই ঠাকুমার উঁকি দেওয়া মুখটি ভেসে উঠলো 'নিয়ে যা দু'জনকেই, কাল থেকে শুনে শুনে ওর মনটাও তো ব্যাকুল হয়ে গেছে!' ভাবলাম—ঠিকইতো। বললাম সেজে গুজে নাও। দু'জনকেই নিয়ে যাব।' একজন পড়ি কি মরি করে ছুট দিল, অন্যজন আমারই দিকে দু'হাত উঁচু করে মাতৃ-সান্নিধ্যে বাহিত-গতি হবার অনুনয় জানাল!

একজন চলল জুতো মোজা এঁটে গট্ গট বাবুটি হয়ে, আগে আগে পাশে

পাশে, অন্যজন ঝুঁটিতে রিবন বেঁধে, চোখের কাজল গভীর করে, আমার ট্যাঁকে চড়ে। মাঠের উপর তখনও রোদের চাদরটি সটান পাতা রয়েছে। আগ্রহের আতিশয্যে একটু আগেই এসে পড়েছি। প্রজাপতি আর ফড়িং-দের হাতে অফুরন্ত সময়, তাই ওদের সব সময়টুকুই নিয়ম করে 'পাংচুয়াল'। আমাদের খণ্ড বিভক্ত ঘড়িতে আঁটা সময়। সে গরিব ঘরের হিসেবী খরচায় অভ্যস্ত। অযথা অপব্যয় আমাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণ আমাদের হিসেবে ভুল হতে পারে; অনটনের ঘরেই তো হাহাকার আর অপব্যয় সম্ভব; অফুরন্তের সংসারে হিসেবের প্রয়োজনটুকুই থাকে না। তাই ওরা ওদের সময় না হলে প্রকাশ পাবে না।

আমার পুত্র কন্যাদের তর সয় না। 'আসেনি কেন? কখন আসবে?' পুত্রের জিজ্ঞাসা। কন্যাতো কল্পনার জগতে ফড়িং আর প্রজাপতির অন্বেষণ করছে মাত্র! ওর চোখেও প্রশ্ন, বিস্ময়, অপেক্ষা। ঘাসের উপর দু'জনকেই ছেড়ে দিয়ে বললাম 'ওদের ডাকো যদি একটু আগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।' মাঠের এধার ওধার দু'এক চক্কর মারতেই একেবারে ধারে, একটু ছায়া ছায়া গাছের আড়ালে, একটা দুটো প্রজাপতিকে দেখতে পেলাম। উড়ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, আবার আড়ালে চলে যাচ্ছে। মেয়েটি আমার চোখের তারায় প্রজাপতির নির্দেশ পেয়ে ওদের দেখে ফেলল। হাততালি দিয়ে চিৎকার করে আনন্দের প্রকাশ করল। পুত্র দেখতে পেয়েই দৌড় দিল। ধরতে হাত বাড়িয়ে সটান মাঠের মধ্যে পড়ে গেল। প্রজাপতিদের একটা যেন মজা পেয়ে ছুটে এলো আর পুত্রের মাথার উপর তার পাখনার ঢেউ ছড়িয়ে দিয়ে পাক খেয়ে সরে গেল। বিদায়ী সূর্যের তির্যক কিরণে ঝলমল করা তার পাখনায় রং-এর ঝিলিক। মেয়ে আবার হাততালি দিল। ছেলেটি উঠেই আবার ধরতে হাত বাড়াল। ওদের দু'জনকেই স্বাধীন করে দিয়েছি উন্মুক্ত মাঠের প্রান্তরে। বেশ ক'একটা প্রজাপতিই এখন অঙ্গন ছেড়ে প্রাঙ্গণে নেমে এসেছে। বেশ জমে উঠেছে। কন্যার চোখের গভীরে আর পুত্রের চোখের সামনে, খেলা উপরে নিচে গোত্তা খেয়ে খেয়ে, প্রজাপতিরা সাতভাই চম্পার মতো কানা-মাছি উড়ছে। তন্ময় হয়ে মেয়ে দেখছে তার দাদাকে, দাদা দেখছে উড্ডীন প্রজাপতিদের।

ঘাসের শিষগুলো যেন প্রহরীর মতো সঙ্গিন উঁচিয়ে পাহারায় আছে।

বিকেলের মৃদু হাওয়ায় তাদের শীর্ষদেশ মৃদু কম্পিত। রাণীদের আগমনের সময় সমাসন্ন; ফড়িং রাণী। তাদের সঙ্গে কোথা থেকে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে ফুলের সমাবোহ ঘটে গেল। একটা-দুটো, অনেক-অসংখ্য ফড়িং হঠাৎই মাঠের মধ্যে নৃত্যছন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তার চারপাশটা যেন ওদের শত্রুপুরী! ওদের সেই বৈকালিক আনন্দযজ্ঞের একেবারে মাঝমধ্যিখানে আমি যেন সাক্ষাৎ ছন্দ পতন।

'এই দেখ ওরা সকলেই এসে গেছে'—বলতেই পুত্র ছুটে এলো, কন্যা গড়িয়ে গড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চলে এলো। সেই চিরায়ত ভঙ্গি, সেই উড্ডীয়মান স্থির চঞ্চলতা, সেই ঊর্ধ্বপক্ষ করজোড় উপবেশন। পুত্র চোখে মুখে আনন্দের লহব ছুটিয়ে ফড়িং ধরার কলাকৌশলে আত্মগত; কন্যা বিমোহিত। পুত্রের অনন্ত অধ্যবসায়, ব্যর্থতার অট্টহাস, আর প্রচেষ্টার একাগ্রতা ক্রমশই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠলো। কন্যা কখনও দাদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উল্লসিত, কখনও বোকার মতো আমার সাহায্য প্রার্থনায় ঊর্ধ্বদৃষ্টি। আমি প্রকৃতির সেই আনন্দ-যজ্ঞশালায় একমাত্র গোলাপে-কণ্টক হয়ে অপেক্ষমান।

হঠাৎই আমার মনে হল আমার পুত্রটিও যেন ফড়িং হয়ে গেছে। ছুটছে, বসছে, ঊর্ধ্বে বাহু তুলে নৃত্যের ভঙ্গিতেই ফড়িং ধরার চেষ্টা করছে। আর খিলখিল হাসিতে আমার কন্যা যেন প্রজাপতি। শরীরের মধ্যে আটকা পড়া ওর শিশুমনটা যেন প্রজাপতির মতোই বর্ণবিচ্ছুরণে মাঠের সর্বত্র বর্ণসুষমা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পরিবেশের যাদুস্পর্শে আমার মনটা পিছিয়ে গেল সময়ের সড়ক বেয়ে অনেকগুলো বছর। ফিরে এলো শৈশবের ফেলে আসা সেই মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, সোনালী ধানের ক্ষেত, উড়ন্ত পাখির ঝাঁক আর গৃহাঙ্গনের শালিক-চড়াই-টুনটুনিদের জীবন। মনে হল সেই মুহূর্তে বিশ্ব যেন একত্র হয়ে একাত্মতার বার্তাটি আমার অন্তরের সামনে তুলে ধরেছে, মেলে দিয়েছে। দূরে পশ্চিম আকাশে মেঘের গায়ে রক্তআলিম্পন। ঝিলের বুকে শান্ত ভাসমান গৃহমুখী হাঁসের দল, ওপারে আগত-সন্ধ্যার চাদর-মুড়ি দিয়ে গাছের সারি, মাঝে মাঝে ঊর্ধ্ব-শির একা-একা তন্ময় তালগাছের নিঝুম অপেক্ষা। আর এ-সবের মাঝে, আমার একেবারে সামনে, একটুকরো জমির হৃদয়ে সবুজে-শৈশবে মাখামাখি,

রঙের-রসের-সুষমার একত্রাবস্থান। মনটা যেন কানায় কানায় ভরে গেল। কাছে-দূরে বিনম্র-নৈঃশব্দ্যকে তরঙ্গিত করে শঙ্খধ্বনিতে সন্ধ্যার আবাহন, দু'একটি গৃহে প্রদীপের আলো তুলসীতলাকে ছাড়িয়ে যেন অন্তরের দিকে বিচ্ছুরিত।

আমি আমার ফড়িং-এর হাত ধরে আর প্রজাপতিকে কোলে নিয়ে গৃহমুখী হলাম। মনে মনে ভাবলাম: ওরা পুষবে বলে ভেবেছিল ঃ সে সৌভাগ্য আমার ভাগে পড়ল।

———

।। তুমি ও সময় ।।

তুমি আমাকে আর চিনতে পারবে না ; সময়ের স্রোতে তোমার স্মৃতি অন্য কোথায়ও, অন্য কোনও মোহনায় হারিয়ে গিয়ে থাকবে। আমার স্মরণের অদৃষ্টেও অন্য কোনও ইতিহাস লেখা হবার কথা নয় ; তবুও। সময়ের গতিপথ অবিচ্ছিন্ন বলেই বোধহয় অতীতের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ বর্তমানের গ্রন্থিবন্ধনে ভবিষ্যৎ চমকে-ঝলসে উঠতে পারে। তোমার কোনও বর্তমান, কখনও, আমাদের অতীতকে গ্রন্থন ক'রে তোমার মনের ভবিষ্যতে হাজির করেছে কিনা তা আমার জানা নেই ঃ অন্ততঃ সেরকম করে নাড়া দিলে হয়তো অদৃশ্য-বিস্মৃত আমাকে জানাতে। এটা আমার বিশ্বাস মাত্র। বিশ্বাস না কল্পনা ? না, আকাঙ্ক্ষা ? এমনও তো হতে পারে যে আমাদের সেই প্রথম সাক্ষাৎ দিনটি আমার মধ্যে যে অগ্নুদ্গার ঘটিয়েছিল, যে তাপের প্রবাহ বইয়েছিল আর যে উত্তাল হৃদয়-লাভায় আমার অস্তিত্বকে বিগলিত করে আমারই চারদিকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল তার বিন্দু-বিসর্গও তোমার ক্ষেত্রে ঘটে নি। তাই মনে রাখার কোনও দায়ই তোমার ঘটে নি ; আর স্মরণে ঝংকৃত হবার সকল সম্ভাবনাই আমার মধ্যে সত্য হয়ে ওতপ্রোত ছিল!

আমার তখন ভিসুভিয়াস-সময়, সবে কৈশোর-তারুণ্য পার হয়ে যৌবনের দিগন্ত আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি। আর তুমি হয়তো সবেমাত্র তোমার খেলাঘরের সর্বস্ব ত্যাগ করে শাড়িতে পৌঁছেছো। যাকে ত্যাগ করেছো তার জন্যেও যেমন তোমার বেদনাবোধ ছিল না, যাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিলে তাকেও তেমনি আপন করে নিতে পার নি। এসব আমার তখন মনে হয় নি ; এখন ভাবি। ভাবি আর মনে হয়, যে সময়-বিন্দুটির দুই প্রান্তে তখন আমাদের অবস্থান সেটি ছিল আদিগন্ত ব্যবধানের মহাসমুদ্র!

সেই প্রথম দিনের দেখার পরে তোমার সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হল না। এই দেখা না হওয়াটাই ক্রমশ মহাসিন্ধুর দুস্তর পারাবার হয়ে সময়ের বিভেদ-প্রান্তরটিকে আদিগন্ত করে দিল। এখন, এই এতোদিন পরে হারিয়ে যাওয়া সেই তুমি যখন হঠাৎই আমার স্মরণ-মন্থন বর্তমান হয়ে

আমাকে এই পড়ন্ত বেলায় ঝাঁকুনি দিলে, তখনই আমার মনে হল 'এই তো সেদিন'!

বিস্ময়ের বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগে নি। কারণ তোমার সবটা আমার চোখের সামনে পরিষ্কার না এলেও, তোমার চোখদুটি এবং খোঁপায় জড়ানো গোড়ের মালাটির বেষ্টন জ্বল-জ্বল করে উঠেছিল। তাই প্রায় চল্লিশটি বছরের দুস্তর সময়-মহারণ্য পার হয়েও তুমি সমান সজীব সামনে এলে! আর আশ্চর্য, তোমার বয়সটি যেখানে ছিল সেখানেই কেমন থমকে থেকে গেল! আমি বুড়ো হতে চললাম, চাকরি থেকে অবসর সময় এসে গেল, আর নাতি-নাতনীরা তাদের আপন ঘরের অন্দরমহলের সাথী বলে চিহ্নিত করে ফেলল। অথচ সেই তুমি সেই-তুমিটি হয়েই আমার স্মরণ-বর্তমানটিকে আর একবার, দ্বিতীয়বার, নাড়া দিলে, দোলা দিলে, আলোতে উত্তাপে হৃদ্য করে দিলে!

নারকেলডাঙ্গায়, মতিশীল স্ট্রিটের সেই বাড়িটা এখন আর দেখলে চেনাই যাবে না। সেই বাড়িতে তার পরে আরও অনেক বিবাহোৎসব হয়েছে। আমি কিন্তু আর যাই নি সে সব উৎসবে। তার কারণ কি জান? যদি তোমার সঙ্গে আবার চোখাচোখি হয়ে যায়! যদি আর একবার সেই অঙ্গার অনুভব করি? তাহলে সেই সাক্ষাৎ-এর তাপে আমার বঙ্কিম-রবীন্দ্র-দিয়ে গড়া ব্যক্তি-ভবিষ্যৎ দুর্গটি চৌচির হয়ে চার দিকে ছড়িয়ে যেতে পারে। যদি বল যে আমি অত্যন্ত ভিতু ছিলাম, শক্তির অভাব ছিল আমার ব্যক্তিত্বে, আর সময়ের আকর্ষণ থেকে পলায়নপর ছিলাম তাহলে, এতোদিন পরে, আমার তরফে ওকালতি করার কোনও কারণ নেই। তবুও মনের গভীর থেকে একটা 'কিন্তু' যেন আঁকুপাঁকু করতে থাকে প্রকাশের জন্যে। তোমার কি সময় আছে সেই 'কিন্তু'টির জটিল আবর্তকে নরম সহানুভূতি দিয়ে খোলামেলা দেখে নেবার?

একটু আগে থেকে বলি? পূর্ববঙ্গ, ফরিদপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আমরা সপরিবারে এদেশে চলে এসেছিলাম। শেষপর্যন্ত কপর্দক শূন্য হয়ে। চলছিল সংগ্রাম। অস্তিত্বের সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম কখন যেন যুদ্ধের আকার নিয়ে নিল। বাবা বোধহয় হতাশা আর জীর্ণতার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে ওপারের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। হালছাড়া, পালহীন, শতছিদ্র

সংসারের নৌকো খানা যখন অনভিজ্ঞ উত্তর-কৈশোর আমার গুণ-টানায় ধিকি ধিকি সামনের দিকে একটু একটু করে এগুবার চেষ্টা করছে তখন, সেই ১৯৫০ সালের এক আগস্টদিনে ওপারের সেই শব্দগুলোই আহ্বান হয়ে বাবার কানে পৌঁছল! তিনি আমাদের সকলকে নিঃসাড় করে দিয়ে সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন!

কিন্তু যখন শব্দ শুনেছিলেন তখনই তিনি পুত্রবধূর মুখ দেখার আকাঙ্ক্ষাটিকে সনম্র প্রকাশ করেছিলেন আমার মা এবং দিদির কাছে। দিদির হাতে 'পাত্রী' ছিল, তাই তিনি সেই সম্ভাবনাটি মা-বাবার কাছে ছুঁড়েও দিয়েছিলেন। মায়ের মনে একাধিক 'কিন্তু' ছিল এবং সেসব তিনি প্রকাশও করেছিলেন। বাবার স্বাস্থ্য এবং দিদির আত্যন্তিক আগ্রহ গোপন ছিল না। সে সব ইচ্ছা-প্রস্তাব-কিন্তু-সমূহের সবিস্তার টানাপোড়েন আমার জানা ছিল না; তবে মোদ্দা বিষয়টি আমার একেবারে অগোচরেও ছিল না।

এই সময়ে আমার মধ্যে একদিকে একটি ভবিষ্যতের জ্বালামুখ ভিতরে ভিতরে নিজের অভ্যন্তরে উত্তাপ সঞ্চয় করে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছিল, অন্যদিকে একটু যেন তাড়াতাড়িই যৌবন তার পূর্ণ নিক্কণ ধ্বনিত করে আগমন বার্তাটি ঘোষণা করতে সুরু করেছিল। একদিকে কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব এবং শান্তিনিকেন-এর প্রভাবে ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের আমিটি দানা বেঁধে উঠছিল, অন্যদিকে আমার বর্তমানের যৌবন-সরসী-নীরে তীব্র-তীক্ষ্ন কণ্ঠে পাখির গান ধ্বনিত হচ্ছিল। স্ববিরোধ? conflict? তাই অনেক দূরে নিশ্চয়করা আমার স্থির-দৃষ্টি মাঝে মাঝেই অনেক কাছের আমার নিজের মধ্যেই অস্থিরতা তৈরি করে দিচ্ছিল। দৃপ্ত সিদ্ধান্তে এবং মা-এর সাহায্যে আমি তখন সেই অসহ্য-সময়ের লাভাস্রোত এবং ভূমিধ্বস রোধ করতে বর্তমানকে নয়, ভবিষ্যৎ-কেই বেশি মূল্য দিয়েছিলাম। সংসারের সম্ভাব্য ভরাডুবি এবং নিজের ভবিষ্য-ঔজ্জ্বল্যকে বাঁচাতে মা আমাকে সেদিন অসীম সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। মতিশীল ষ্ট্রিটের সেই বাড়িতে আমার দিদি ছিলেন মেজ-জা। দিদি থাকতেন বেলঘরিয়াতে রেলের কোয়ার্টার্স-এ। তার বড়-জা আমাকে ব্যক্তিগতভাবেই স্নেহ করতেন। 'তিনু ঠাকুরপো!' ডাকটি ছিল বেশ মিষ্টি। তবে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারণের মধ্যে

তিনি যে বহুতর ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তা আমার অনুভবের তন্ত্রীতে অধরা থাকত না। প্রাক্-দুপুরেই আমি সেই বিয়েবাড়িতে উপস্থিত। নানা কাজে নানা ভাবে ব্যস্ত থাকছি। দিদিও সেখানে সপরিবারে উপস্থিত। সকালের হাঁক্ ডাক্ বিকেলের হৈ-হট্টগোলের দিকে এগিয়ে চলেছে। অনেকেই একে একে সেই বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। তাব মধ্যে কখন যে তুমি—তোমরা সপরিবারে তোমাদের উপস্থিত করেছিলে তা আলাদা করে আমার দৃষ্টিতে পড়ে নি। কিন্তু তুমি স্বতন্ত্র করে আমার নজবে পড়লে যখন দিদি আমাকে বলেদিল 'এই মেয়েটির কথাই বাবাকে বলেছিলাম'! কেন বলল? কেন দিদি সেই কথাটি সেই সময়ে বলতে গেল? সে যদি আমার নজর তোমার দিকে তখন না নির্দেশ করত তাহলে তো আর কোনও গোলমালই হত না! বিয়ে বাড়িতে তো কতো মেয়েই আসছিল। এবং তাদের অনেকেই তো তের-চৌদ্দ থেকে অগুনতি যৌবন প্রবাহের মধ্যে ঢেউ হয়ে হয়ে হাজির ছিল। কেউ উচ্ছল, কেউ কলকল্, কেউ বা সমৃদ্ধ, কেউ শান্ত-সমাহিত। কেউ নিজেকে নিয়ে বিব্রত, কেউ লতার মতো বিনম্র-নত। এই সব কতো-কতোর মধ্যে তো কোনও একক ছিল না; সবাই মিলে তো বিয়ে বাড়ির মধ্যে ভিড়ই বাড়াচ্ছিল। আমার সেদিনের সাদামাটা জীবন-ছন্দে তো কোনও তরঙ্গাঘাত হবার কারণ ছিল না! তাহলে? তাহলে দিদি কেন আমার মনের গভীরে অতীতের দাহটাকে নির্দেশ-এককের তপ্ত-বর্তমানে জীবন্ত করে দিল?

আমি তাই দেখতে বাধ্য হলাম। মোহিত হলাম। গুরু-গুরু ধ্বনি ধীর লয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে লাগল, লাভা প্রবাহের স্রোত অননুভূত রইল না আর। তুমি কেন সেই সময়ে আমার দিকে অমন পূর্ণদৃষ্টি ফেলে তাকালে? তুমি আমাকে দেখলে; আমাকে, আমার দৃষ্টিকে অনুভব করলে। এবং মৃদু-নত-শিরে দৃষ্টিকে সলজ্জ করে নম্র করলে, কেন? কেন? সেকি আমার ভুল? তুমি কি আমার দিদিকে দেখলে, আমাকে নয়? তুমিও কি জানতে, কি জানতে না? সেই কএকটি মুহূর্তে আমার আকাশ, আমার বাতাস, আমার জগৎ সব নিরাকারে একাকার হয়ে হারিয়ে গেল কেন? কে যেন এক লহমায় তোমার সেই শান্ত-সলজ্জ-আনত মূর্তিটি আমার চোখে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে কেটে কেটে বসিয়ে দিল। আমার সেই সময়ের বিস্মিত স্তম্ভিত হতবাক অবস্থাটা কতক্ষণ স্থায়ী হত জানি না: 'তিন্ ঠাকুরপো

একবার এদিকে এসো'—বড় বৌদির ডাক শুনে আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। তবে আংশিক। কারণ যেদিকে যাবার কথা সেদিকে না গিয়ে আমি অন্য দিকে চলে গেলাম। দিক্‌নির্ণয় ভুল হয়ে গেল। তোমার দৃষ্টির-নেশা আমায় ততক্ষণে মাতাল করে দিয়েছিল কি ?

একতলাতেই যত ভিড়। যত কাজ, যত বাইরের লোক, সবই একতলাতে। দোতলায় তিনখানা ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে দুখানা, বাঁদিকে একখানা। সামনে বরাবর টানা বারান্দা। ফ্রক, ছাপা-শাড়ি, লালপাড় এবং ক্রমশই বেনারসীর ভিড় বাড়ছে। বাড়ছে বারান্দায়, এবং ঘরেও। ভাল আত্মীয়-আত্মীয়াদের জন্যে ডানদিকের প্রথম ঘরটি। বাম পার্শ্বের ঘরটিতে অপেক্ষাকৃত কমদামের শাড়িদের জন্যে নির্ধারিত। ছাদে বাঁশের খাঁচায় লাল-সাদা-নীল-সবুজের কাপড়ে-বাহার যেন ছড়িয়ে পড়ছে আলোর রোশনাইতে। রেকর্ডে সানাই বেজেই চলেছে। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীত, সেতার। বিকেল থেকেই জমজমাট হয়ে উঠছে আর দেশীবিদেশী perfume-এর গন্ধে এলাকাটা ম' ম' করছে। সব চলা-বলাতে ক্রমশই যেন একটা ছায়া-ছায়া ছন্দ-বন্ধ-ভাব কবিতার মিল-পয়ারে সজীব। চোখের তৃপ্তি যেমন বাড়ছে, ঘ্রানের বৈচিত্র্য যেমন চন্‌মন্‌ করে উঠছে, তেমনি কানের তৃপ্তিও ঘটছে দোতলার ডানদিকের ঘর দু'খানির আশেপাশে এবং অভ্যন্তরে।

আমার অনেক কাজ ; তার ফাঁকে ফাঁকে আমার পা দুটো যেন বার বারই দোতলার ডানদিকের ঘরকে খুঁজে নিতে চাইছে। প্রতিবার ছাদে ওঠানামার সময় কেন যেন আমার কোনও জরুরী কাজের তাড়া পড়ে যাচ্ছে সেই ঘরের সামনে ; কখনও দিদিকে খুঁজতে, কখনও বড়বৌদিকে। উপস্থিত জনেদের মধ্যে একে-তাকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে চাইছি যে-আছে সে ছাড়া অন্যজন আছে কিনা ! আমিই প্রশ্নকর্তা ; উত্তরের জন্যে আমার নেই কোনও আকুলতা। কিন্তু যাকে প্রশ্ন করছি তার দিকে তন্দৃষ্টি না হয়ে যে আমার চোখ অন্য কোনও বিন্দুতে স্পর্শকাতর তা আমার কাছে বারবারই ধরা পড়ে যাচ্ছে। ওরাও কি সেখবর পেয়ে গেছিল। অন্যদের মুখের পেশীসঞ্চালনে সব সময়ে তা বুঝতে পারিনি ; অবশ্য অতটা দেখার মতো সময় এবং মানসিক অবস্থা বোধহয় তখন আমার একেবারেই ছিল না। তুমি ? তুমি কি সে খবর টের পেয়ে গেছিলে ?

আমি ধরা পড়ে গেলাম যখন তোমার বেনারসী মোড়া সৌষ্ঠবে তোমার অন্তরের প্রতিফলন দেখলাম তোমার চোখে। থমকে গেলাম, বাক্‌রুদ্ধ বিস্ময়ে ক্ষণকাল তাকিয়েই ছিলাম। তোমার কাছেই ধরা পড়লাম ? তুমি কি ধরা দিলে আমার কাছে ? মনেব মধ্যে তির-তির ঝির-ঝির অবস্থাতেই ছিটকে গেলাম। ঢেউ-এব উথাল-পাথালের জন্যে অপেক্ষা করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। আমাব ভিতরের আলোড়ন টের পেয়েছিলাম ; মন্থনের জন্যে তোমার সামনে অপেক্ষা করলাম না। দূরে গেলেও তুমি তখন আমার সবটাই জুড়ে রইলে। অনেকক্ষণই, অকারণেই, এখানে ওখানে ছুটোছুটি করলাম, এঘর-ওঘর করে কাজের সন্ধান করলাম। তখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে সে সবই আমার বাহানা। তবুও আচ্ছন্নের মতো কখনও দিদিকে খুঁজলাম, কখনও বড়বৌদিকে। সমস্ত শরীর মনে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ে ঘুর পাক খেতে খেতে কখন যেন আবার সেই তোমার ঘরের সামনেই পেঁাছে গেলাম !

এক লহমায় সব শূন্য হয়ে গেল। ব্যস্ত-সমস্ত সেই ঘবে প্রচুর ভিড় প্রচন্ড সাজ-গোজ চলছে। কিন্তু তুমি ছিলে না। সুতরাং আমার দিদি বড়বৌদিকেও আর অন্বেষণ করা হল না। আমার সবটুকুই যেন একাগ্র হয়ে তুমি কোথায় তুমি কোথায়—বলে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে উপরে যাব না নিচে যাব ভাবছি এমন সময় পিছন থেকে দিদি আমাকে 'বড়-দি' ডাকছেন বলে জানালো। ঘুরে দাঁড়িয়েই থমকে গেলাম ! দিদির পিছনে তুমি ! তোমরা বোধহয় প্রান্তের ঘরে গেছিলে। তোমার সাজ-গোজ যে পূর্ণ হয়ে গেছিল তা বুঝলাম মুহূর্তেই। মেয়েরা এতো সুন্দর হয় ? এতো সমুজ্জ্বল ? আমার দৃষ্টিকে দিদি বোধহয় পড়ে ফেলেছিল, সে যে বুঝেছিল তা অচিরেই জানতে পেরেছিলাম। 'কি, কেমন ? পছন্দ ?'

আমার এখনও মনে আছে। আমার লজ্জা-সঙ্কোচ আর অপর্যাপ্ততার আঘাতে তাড়িত আমিটাকে নিয়ে আমি দ্রুত সরে গেছিলাম। আমার সেই সময়ের চিন্তা অনুভবগুলো তালগোল পাকিয়ে কেমন যেন অসাড় করে দিয়েছিল আমাকে। অবচেতনে যেন একই সুর একই কথা বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল : তুমি আমার, তুমি আমার ; আমি চাইলেই পেয়ে যাব। একবারও মনে হয়নি যে তুমিও তো একটা পক্ষ, একটা ব্যক্তি !

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারদিকে আলো আর আলো। তার মধ্যে সানাই-এর আবহ। ফুলের গন্ধ, সেন্টের সুবাস, তারুণ্যের আর যৌবনের হাট! আচ্ছন্নের মতো কোথা দিয়ে সময় চলে যাচ্ছিল। ধূপের মতো ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চয়তায় আমার মধ্যে একটা আগুন আমার সর্বঅস্তিত্বকে তাপ দিয়ে চলেছিল; আর পাকে-পাকে সদ্য-অনুভূত গন্ধের মতো তোমার উপস্থিতি অনুপস্থিতি আমার সকল সত্তার পরতে পরতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে ঘোষণার মতো সত্য হয়ে উঠছিল। বাইরে যেমন উৎসব চলছিল, তেমনি আমার মধ্যেও একটা উৎসব জাগ্রত-চেতনার মতো আমাকে ঘিরে রেখেছিল।

তার পরে ভিড় যত বাড়তে লাগল তুমি ততই হারিয়ে যেতে লাগলে। আর যত বেশি চোখের বাইরে চলে গেলে তত বেশি আমার চোখের ঠিক মধ্যিখানে দখল নিলে! ছোট বেলায় ভূতে পাওয়া কথাটা শুনেছিলাম। সেই অবস্থাটার মধ্যে একটা ভয় একটা অসুন্দর যেন ওতপ্রোত ছিল। প্রেমে পড়া ব্যাপারটা তখনও বুঝে উঠিনি; ভালবাসা কি তা আদৌ বুঝি না। কিন্তু সেই'সন্ধ্যায় আমাকে যে কোনও-কিছুতে পেয়েছিল, এবং যেন গভীর করেই পেয়েছিল, তা বুঝতে আমার আর বাকি ছিল না। কিন্তু ভয় তো ছিলই না বরং সুন্দর যেন গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা হয়ে আমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠছিল। অতীত থেকে কোনও অভিজ্ঞতা আহরণ করতে পারছি না, ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ বাবুরাও আমার চেতনায় কোনও দিক্ নির্দেশ দিতে পারছিলেন না। শুধু বর্তমান, শুধু একটা বোবা ভাবালুতা, শুধু তাৎক্ষণিক সময়ের স্রোত আর উত্থানপতন নিয়ে আমি চূড়ান্ত অভিভূত ছিলাম।

রাত একটু একটু করে বাড়ছে। ভিড় ক্রমশ নদীস্রোতে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে। উষ্ণ স্রোত, শীতল স্রোত এবং নাতিশীতোষ্ণ স্রোত বয়ে চলেছে পাশাপাশি। তোমারা উচ্ছল উষ্ণ স্রোত তৈরি করে চলেছো, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা শীতল স্রোতের বহমান বর্তমান। আর আছে তোমাদের বড়রা। এরা জীবনের ঢেউ গোনা শেষ করে ফেলেছে প্রায়। এরা জানে সময়ের বুক্ষে শুধু কোকিলই ডাকে না, কাক শালিকেরাও কিচিমিচি করে। তাই এদের বলেছি নাতিশীতোষ্ণ। আমাদের মধ্যে কুঁড়ির অস্ফুট উষ্ণতা রয়েছে, ভবিষ্যতের অনভিজ্ঞতা গুটি বেঁধে ঘনিষ্ঠ অপেক্ষা করছে। কল্পনার পুষ্ট বীজ তাপের কেন্দ্রভূমিটি

হয়ে উন্মুখ জেগে আছে। সেই উৎসবের দ্রুতগতি স্রোতে সময়ের একাবস্থানের মধ্যে ভাসমান চলমান মনটি নিয়ে আমার হল সে এক অসীম যন্ত্রণার অবস্থা। তোমার দেখা পেয়ে পেয়ে আর না পেয়ে পেয়ে আমার রাত বাড়ল অনেক।

ঠিক ছিল রাত্রে খাওয়া সেরে বাড়ি ফিরে যাব। হোল না। অপেক্ষার একাগ্রতাই তা হতে দিল না। টালবাহানা করে বাড়ি ফেরার শেষ সময়টাও পার করে দিলাম! যদি একবার একান্তে দেখা হয়! যদি একটা দুটো কথা বলা যায়! তোমার মনের তো হদিস কিছুই পেলাম না! অথৈ ভাবনার কূলে কূলে আমার নিরুদ্দেশ মন ঘা খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগল। আমার মা তোমাকে পছন্দ করবেন তো? দিদির যখন পছন্দ তখন মাকে নিয়ে ভাবনার বিশেষ কারণ দেখি না। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ বিষয়ে মায়ের যে খুবই উচ্চাশা! সেখানে কি তিনি সামঞ্জস্য করতে রাজি হবেন? আমাদের অতবড় কিন্তু একেবারেই নিঃস্ব সংসারে তোমার দম আটকে আসবে না তো? দিদি বলেছিল যে তোমরাও গরীব, তুমি অনেক কাজের মেয়ে। তোমার সহ্য-ধৈর্য-বুদ্ধি নাকি অনেক অনেকের থেকেও বেশি। অনেক ভাইবোনের মধ্যে তুমি বড়। আরও কতশত প্রশংসার কথা দিদি মাকে বাবাকে বলেছিলেন। সে সবের সব আমি শুনি নি তবে কিছু শোনার সঙ্গে কিছু বুনে নিয়ে তোমাকে দাঁড় করিয়েছি। আমার বর্তমানে তুমি কতোটা আনন্দের হবে; আমার ভবিষ্যৎ? মহাজনদের চিন্তাভাবনার আখরে আখরে যে আমার ভবিষ্যৎ চেতনা সেখানে তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?

বাড়িটি ক্রমশই নিঝুম হয়ে আসছে। যত্র-তত্র বিছানা আর না-বিছানা হয়ে অনেক শিশু-কিশোর ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার কোনও এক ভিড়ের মধ্যে তুমি হারিয়ে গেলে রাতের অন্ধকারে, ঘুমের অন্তরালে। সে আমার আর জানাই হল না। নিচের একটা ভিড়ের মধ্যে আমিও কোনওক্রমে স্থান করে নিয়ে নিদ্রার গভীরে তলিয়ে গেলাম। আমার ভাবনারা কিন্তু আমাকে ছুটি দিল না। সকলই পড়ল-আর-মরল করে ঘুমে ঢলে পড়ল। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর মন নিয়ে সকলেরই তো একই অবস্থা।

ছোট্ট একখানা নৌকোয় করে চলেছি। একেবারে একা। পূর্ববঙ্গের বর্ষাকালে আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে যেতাম অমনি করে। একা আমার নৌকোয়, আধোডোবা হিজল গাছের পাশ দিয়ে সর্‌সর্‌ করে যখন

বেতঝাড়ের ঘষা খেয়ে খেয়ে সামনে যাচ্ছে তখনই যেন মনে হল সামনের গলুই-এর ধারে তুমিই বসে আছ। পরনে বেনারসী, হাতে কাঁচের চুড়ি। একটু যেন আড় হয়ে বসে আছ। শরীরটা ঝুঁকে পড়েছে, বাঁ হাতে জলের সঙ্গে মিতালি করার বাসনায়। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বিশ্বাস হল। হ্যাঁ তুমিই তো!

পাত্র পাত্রী, প্রেক্ষিত পটভূমি, স্থান কাল সব যেন কেমন আমাকে হকচকিয়ে দিল। মনে হল জীবনের সকাল থেকে এই যে তরুণ সূর্য পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি সে কেবল তোমার জন্যেই। সামনেই অনেকখানি ধানক্ষেত। সবুজে সবুজ। বাঁদিকে আমাদের বি' টিমের খেলার মাঠ। এখন মাঠ নয় জলাশয়। তার মধ্যে সাপলা পাতা, কচুরিপানা আর নানা রং-এর ঘাসের শিষ ঊর্ধ্বাকাশে সঙিগনের মতো কাকে যেন শাসন করে চলেছে। ছোট ছোট সাদা সাদা ফুলের পাশে পাশে পল্লবিত কচুরি ফুলের সমারোহ, আর বুটিদার টানটান নক্সা সম্পূর্ণ করতে না'ল ফুলের পদ্মসুলভ অস্তিত্ব। অনেক দূরের সবুজ গ্রামের টানা রেখায় যেন গভীর পাড়ের দ্যোতনা। আমাদের নৌকোর নিচে জলের তরতর শব্দের সঙ্গে জলজ উদ্ভিদের ঘষা লেগে লেগে সুরসর একটা সচল সঙ্গীত যেন আমাদের সব ভাষা শুষে নিচ্ছিল।

অনেকক্ষণই নির্বাক তাকিয়ে ছিলাম তোমার বাঁকানো ঘাড়ের পাশে জাগ্রত পার্শ্বমুখাবয়বটির দিকে। উপরের নীল আকাশ, বিচ্ছুরিত নবীন কিরণ আর সজল সবুজ নিকট দূর যেন কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। আমার একা বেয়ে যাওয়া তরী, আর সেখানে, এতটুকু দূরত্বে তোমার হঠাৎ আবির্ভাব যেন আমার বর্তমানকে, আমার যাত্রাপর্বটিকে, আমার সর্ব অস্তিত্বকেই গানের মূর্ছনায় আর লয় ছন্দের তালে তালে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল বৈঠা ফেলে দিয়ে উঠে গিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াই, তোমার কাছে একটু বসি ; দু'চারটি কথা, দু'একটি সম্ভাষণ, ভাবের কিছু লেনদেন, ভাবনার একটুখানি ছোঁয়া, কিছু বলায় কিছু না বলায় নিজেকে প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে বেশ নাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু কেন যেন মনে হল : না, না, না—এই যে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে প্রকৃতিতে মিলে একটা স্বপ্নময় বর্তমান তৈরি হয়েছে, নৌকোর নিচের জল আর জলের উপরের

ফুল লতা পাতায় মিলে যে মুখর যাত্রাপথটি গান হয়ে হয়ে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট হয়েই হারিয়ে যাচ্ছে, আবার হারিয়ে গিয়েও ফিরে ফিরে আসছে তাকে বাধা দেওয়া কখনই উচিত হবে না ; সুন্দরের অপমৃত্যু-তুল্য হয়ে বর্তমানটাকেই হারিয়ে দেবে। তাই আমার মনের সকল ইচ্ছা, সমস্ত উদ্বেগ আর সমূহ উত্তেজনাকে অনেক কষ্টে শৃঙ্খলিত করে নীরব নির্বাক তোমার দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

তুমিই বা কেন কিছু বলছিলেনা ? যদি এলেই, যদি ঘুমের গভীর থেকে জাগ্রত বর্তমানে একেবারে আমার কাছেই, সামনেই আসতে পারলে, তবে কেন কোনও সম্ভাষণ ছাড়াই প্রকৃতিকে নিয়ে মশগুল হয়ে রইলে ? একি তোমার খেলা ? তুমি কি তখনও জানো নি যে আমার আমি বলে আমার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না ? নাকি সেই সত্য এতো বেশি করেই তুমি জানতে পেরেছিলে যে নিঃশেষিত সেই আমিটিকে তোমার আনত গ্রীবার স্বচ্ছন্দ অবহেলাতেই পিঞ্জরাবদ্ধ জেনে নিশ্চিন্তে জল খেলায় মত্ত হয়েছিলে ?

বিহ্বল আমি নৌকোর দিক্-নিশ্চয়ে অবহেলা করে ফেলেছি। সামনে ঝাঁকড়া একটা হিজল গাছের পুঞ্জপুঞ্জ ডালপালার দিকেই নৌকোটা প্রায় ঢুকে যাচ্ছিল। কি করব স্থির করার আগেই দেখলাম তুমি তোমার আনত গ্রীবাটিকে উচ্চে তুলে আমার দিকে পূর্ণ তাকালে ; তোমার ডান হাতে একটি দীর্ঘবৃন্ত না'ল ফুল। তার দুধে আলতা ভিতরটা যেন আমার সমগ্র দৃষ্টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। তোমার সেই স-ফুল দক্ষিণ হস্তটি আমার দিকে প্রসারিত। নৌকোটাকে বাঁচাতে গিয়ে তার গতিমুখটি বৈঠার এক তীব্র তাড়নায় ঘুরিয়ে দিলাম। নৌকোর আমার-প্রান্তটি একটি হিজল ডালে আহত হল। বৈঠা শুদ্ধ আমি ছিটকে পড়লাম জলে।

ঘুম ভাঙ্গল আমার পাশে শোয়া কানুর ধাক্কায়। 'কি হল ? গোঁ গোঁ করছিস কেন ?' পাশ ফিরে শুয়ে পড়।' সেও পাশ ফিরল। অনেকখানি সময় আমি কোথায়, কেন, এবং কি করছিলাম—এই সব প্রশ্নের সামনাসামনি হয়ে বর্তমানকে হাতড়াতে লাগলাম। ঘুমের আবছা আবছা ভাবটা কেটে যখন বাস্তবের হদিস পেলাম তখন আমার সব থেকে যে কষ্টটা হল তা এই যে ঐ হিজল গাছটাকে কেন পাশ কাটিয়ে যেতে পারলাম না !

বেশ ঢিমে তালে সকাল সুরু হয়েছে। বেশির ভাগ লোকজনেরাই দেরি করে ঘুম থেকে উঠছে। তাড়া নেই সারা বাড়িতেই। একটা হচ্ছে-হবে ভাব যেন মলাট হয়ে মুড়ে রেখেছে। একমাত্র ব্যস্ততা বড়বৌদির। তার হাঁক ডাকের শেষ নেই, শেষ নেই ছুটোছুটির এবং বার বার একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তির ঃ সব অকর্মা, সব অকর্মা। বাইরে বারান্দায় এসে দেখলাম বিরাট উনুনে অনুরূপ কেটলি। সকলের জন্যে প্রাতঃকালীন চা'এর ব্যবস্থা। গতকাল বিকেল-রাত্রির শৃঙখলা নেই, ব্যস্ততা তো নেইই। সকলেরই যেন অফুরন্ত সময় আছে হাতে।

বাইরের এসব দৃশ্য আমার চোখের জন্য সত্য হলেও মনের জন্যে আমার অন্য টান ছিল। তাই চট্‌পট্‌ উপরে, দোতলায় গেলাম। দিদির খোঁজে? যদিও আমার মুখের খোঁজ ছিল দিদি, আমার অন্তরের অন্বেষণ ছিল অন্য কোথায়, অন্য কেউ। তাই সেই ডানদিকের ঘরের সামনে পৌঁছেই আমার একটা সির্‌সির্‌ অনুভব হল। ওদের কেউই তো নেই! তাহলে?

আমি সময়ে উঠতে পারিনি। ওরা বেশ সকালেই চলে গেছে। এতো কাছে এসেও সে দূরে চলে যেতে পারল? এবং অনায়াসেই? বার বার আমার মনে হল সময় মতো উঠতে পারলে হয়তো দেখা হত, হয়তো আমার সময় আমাকে এমন অসহায়ের মতো ফেলে চলে যেতো না। এক পা পিছনে সরে গিয়ে লোহার রেলিং-এ পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যেন কি হারিয়ে গেল, কি যেন আমার সাধ্যের মধ্যেই ছিল কিন্তু হঠাৎই তা সুদূর অসম্ভবের গভীরে সরে গেল। আমার জাগ্রত সময়ের নৌকোখানাও যেন দক্ষিণের ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে গতিমুখটি হারাল। আমি যেন ছিটকে পড়া আরোহীর মতো বর্তমানের ঘূর্ণিতে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম।

সিঁড়িতে ওদের বিষয়েই কথা শুনলাম। দিদির কণ্ঠস্বর টের পেলাম। সঙ্গে কে? বড়বৌদি। ওরা কেন এতো সকাল সকাল চলে গেল? বড়বৌদির প্রশ্নের উত্তরে দিদি যেন কি সব বলছিল। অপেক্ষা না করেই দ্রুত ওদের পাশ দিয়ে নেবে গেলাম নিচে। দিদি একটু ঘুরে আমাকে চলন্ত দেখে নিল। কিছু বলার আগেই আমি সরে পড়েছি। সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম যে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। সকালকে দুপুরের তাপে পৌঁছানোর আগেই আমার ও বাড়ি থেকে ছুটি নিতে হবে। এবং হলও তাই।

সেদিনের সেই সময়টুকু আমার জীবনের ঝিনুকে শিশিরবিন্দু হয়ে জমা হতে পারেনি। সেই মোহময় সময় এবং পরিবেশ ছেড়ে সরে এসেছি কর্মজীবনের মরুভূমিতে, বিচরণ করেছি সংসারের সাংগঠনিক ইতিবৃত্তে আর অবগাহন করেছি মহাজনদের রেখে যাওয়া জ্ঞান সমুদ্রে। পুত্রবধূর মুখ দেখার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে বাবা চলে গেলেন ; মায়ের ইচ্ছে ছিল পঞ্চাশ ; সেই পঞ্চাশ এবং বাকি পঞ্চাশ এখন অব্যক্ত অনির্দেশ্য হয়ে পালহীন হালহীন কএকটি অপরিণত অবোধকে কেন্দ্র করে পাথর হয়ে গেল।

কখন যে সেই সময়টুকুকে আমি কবরের চিরশান্তিতে শয়ান করিয়েছিলাম তা আমার অজ্ঞাত। ছেড়ে আসা বাণী-বন্দনার মন্দিরের দ্বারটুকু পার হয়ে শিক্ষার চত্বরে প্রবেশ করে একটা নব-দিগন্ত আমার জীবনের সামনে খুলে নিয়েছিলাম। সেই টানে আমার অতীত সরে গেল, আমার বর্তমান পরিচালিত হল এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে থাকল। সে অন্য কথা, অন্য ইতিহাস, অন্য সময়।

পুরোনো চাকরি ছেড়েছি, নোতুন চাকরি নিয়েছি। কলকাতা ছেড়েছি। পড়াশুনা শেষ করার আগেই সংসারী হয়েছি। অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছি, ঘটতে দেখেছি, ঘটতে বাধাও দিয়েছি। এই সব করতে করতে জীবনের সব ভাল-মন্দ সময় পার করে দিয়ে এই পড়ন্ত বেলায় এসে ঠেকেছি। আর, সকলেই তো জানে যে সব পড়ন্ত বেলাই একাকিত্বের বেলা। এখন আমার অফুরন্ত একা-সময়, নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজি। এই অন্বেষণ চলে সুদূর অতীতের আমির মধ্যে, অনতি অতীত আমির দিননামচায়, সদ্য অতীতের জাগ্রত-স্মৃতির মধ্যে। অনেক সুন্দর এখন আমার সংগ্রহে, অনেক ব্যথাও। কিন্তু সেই ব্যথাও এখন সুন্দর মনে হয় ; বর্তমানের বেদনার থাকে বিদ্ধ করার ক্ষমতা, তাতে রক্তক্ষরণ ঘটে, তৈরি হয় বিষণ্ণ কষ্টের। অতীতের বেদনার বিদ্ধকারী তীক্ষ্নতা থাকে না, তাতে ইতিহাসের স্মরণ ঘটে, উজ্জীবিত হয় এক নোতুন চেতন-মাত্রার। অতীতের স্মৃতি-সম্ভার ঘাঁটা তো সব সময়েরই কাজ ; সামনে যাদের অপেক্ষাকৃত অনেক কম সময় অবশিষ্ট তাদের বাঁচাটাই তো ক্রমশ অতীতের সুন্দরের মন্থনে, সংগ্রহে আর স্মরণ-অবগাহনে।

সেই মন্থনে অতীতের তুমি উঠে এলে অমৃত হয়ে। তখন তুমি আমার জীবন-ঝিনুকে আপতিত হলে। আমাদের জীবনে একটুকরো মুক্তোর সম্ভবনা

ছিল কি ছিল না তা আর আজ নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। কারণ সে তো বাস্তবের টানাপোড়েনেই তৈরি হতো, রূপ পেতো, বর্ণে-গন্ধে-সত্যে যথার্থ হয়ে উঠতো। কিন্তু আজ যে-তুমি এলে সে তো বাস্তবের আঘাত-সংঘাতে জর্জরিত নয়, সে-তুমি তো আমার মনের কোনও এক নির্জন কোণে দীর্ঘ দিনের অদর্শনেও অপরিবর্তিত বর্তমান। তাই তুমি তখনও সুন্দর এখনও সুন্দর। সময় তোমাকে নিপীড়ন করে নি, কোনও বলিরেখা আঁকতে পারে নি, পারেনি সেই প্রসারিত হস্ত শাপলা-ফুলের দুধে আলতা বর্ণসম্ভারকে এতোটুকু মলিন করে দিতে। তাই তুমি যেমন তোমার সেই-তুমি, তোমার সেই সময়টুকুও তেমনি তোমার সেই-সময়ের সময়টুকু। অমলিন অপরিবর্তিত স্থির কল্পনার জগতে চির-সুন্দর।

।। শালিক ।।

যে ঘরটাতে বসে আমি লিখি তার দক্ষিণ দিকে দেয়াল জোড়া ডবল জানালা আছে। দক্ষিণের জানালাটা আমার বাঁ দিকে পড়ে। জানালার ঠিক বাইরে ফুট আট-নয় দূরে একটা বেশ বড়সর আমগাছ। সেই গাছের গোড়াটা এক তলার এলাকায়। আমার দৃষ্টিতে তার ডালপালার আর সবুজের ভাগ। লিখতে লিখতে মাঝে মাঝেই বাইরে বাঁ দিকে তাকাই। তাকাই আর বাইরের জগৎটা দূর পর্যন্ত আমার চোখে ভাসতে থাকে। দেখি যে কিছু তা বলতে পারিনা। তবে যে সব শব্দ আসি আসি করেও মনে আসে না, যে সব ভাব আমার নিজস্ব হতে চেষ্টা ক'রে জানালার বাইরে সর্বক্ষণ ঘুর ঘুর করে, তাদের প্রবেশের সুযোগ দিতেই বোধহয় আমার এই তাকানো। লেখার ঝোঁকে কখনও সমস্যায় জড়িয়ে গেলেও তাকাই, সম্ভবত সমাধানের পথ খুঁজতে। গৃহের অন্যান্য জনেরা যখন তাদের কথাবার্তায়, টুক টাক কাজেকর্মে আমার মনের ভাবনার দিঘিতে ঢেউ তোলে, তখন তাকে নিস্তরঙ্গ করতে, শান্ত সমাহিত করতে ঐ জানালাটির বাইরে যে ভুবন সেই আমাকে সাহায্য করে।

এমনিই এক নিরুদ্দেশ দৃষ্টির সামনে হঠাৎই একদিন সে ভেসে উঠলো সত্যি হয়ে। শুকনো কুটোকাটা দিয়ে বানানো বাসার মধ্যে আদেহ ডুব দিয়ে বসে আছে সে। একটি শালিক। স্বচ্ছ দু'টি চোখ যেন স্থির হয়ে আছে আমারই দিকে। আমার দু'চোখ জুড়ে সে তার উপস্থিতিটুকু ছড়িয়ে দিল। একটু ভাল করে দেখতে গিয়েই তার পিঠের সমান্তরাল অবস্থানটিও আমার নজরে পড়ল। কবে বানাল এই গৃহ? সংসারী হবার বাসনায়, সন্তানকে আবাহন করার সেই প্রস্তুতির দিনগুলো আমার দৃষ্টিতে পড়ল না কেন? চোখ ত্বরিতে সরিয়ে নিলাম; যদি ভয় পায়?

একটা মাঝারি গোছের ডাল খানিকটা নিচু থেকে আমার জানালার দিক্ ঘেঁষে যেন পূর্বদিকে চলে গেছে। একটু উপরে উঠতে না উঠতেই সেই ডালটি ত্রিধা বিভক্ত হয়ে তিনদিকে গতি পেয়েছে! সেই কোণটিকেই ওরা বেছে নিয়েছে ঘর বানানোর সর্বোত্তম স্থান বলে। অন্য ডালের ক'একটি পত্রগুচ্ছ সেই গৃহস্থালির আবরণ হয়ে আবরু রক্ষা করছে। সেটাও বোধহয় স্থান পছন্দের

মধ্যে ওরা ধরে নিয়েছে। একটা আম্র-পল্লব তো জানালামুখী হয়ে পর্দার কাজ করছে। যেন হাতের পাঁচআঙুল টান্‌টান্‌ করে সামনে বাড়িয়ে বলছে 'দেখনা, আমাকে দৃষ্টি বিদ্ধ কর'না! প্রকৃতিনির্দেশিত মহত্তম কাজটি আমি এইখানেই করছি। মাতৃত্বের সাধনায় মগ্ন আমাকে দৃষ্টিদ্বারা উচ্ছিষ্ট ক'র না!'

চোখ সরিয়ে নিয়েছি, মন পড়ে রইল ওখানেই, ঐ পল্লব-আড়াল গৃহকোণ টুকুর কোলে নিশ্চিন্ত নীরবে সাধনায় আত্মস্থ শালিক মাতার গভীর কালো চোখ দুটির মধ্যে। স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠলো টুকরো টুকবো আবছা আবছা অনেক ঘটনা। অনেক দিনের। ওদের স্বামী-স্ত্রীর বহুবারের আনাগোনা, কিচিরমিচির আলোচনা তর্কবিতর্ক! সবই এখন যেন মনে পড়ছে। স্থান নির্বাচনের সময় ওদের মতদ্বৈধ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় ব্যাপার বিশ্লেষণ। সম্ভাব্য সুরক্ষার ব্যবস্থা, আলোবাতাস ঝড় ঝাপটা থেকে প্রতিরক্ষা, অন্যান্য পাখিদের আক্রমণ সম্ভাবনা, মানব সন্তানদের দৃষ্টির আড়াল এবং আরও নানান বিষয়। আমার ঘরের দক্ষিণের জানালাটার পাশে আমাদের আমগাছটা যে ওদের পছন্দের সে বিষয়ে ওদের কোনও মতদ্বৈধ ছিল না। বুঝলাম এই জন্যে যে সকাল দুপুর বিকেল বহুবারই ওরা এই গাছটারই এডাল-ওডাল করে সিদ্ধান্তকে কোনও নিশ্চিত ডালমুখী করতে সচেষ্ট ছিল। সে যে ওদের গৃহী হবার বাসনায় তা কখনও মনে হয় নি। স্বভাবসিদ্ধ শালিকের কচকচি বলেই মনে হয়েছিল ; মাঝে মাঝেই ওদের তর্ক বিতর্কে বিরক্ত বোধ করেছি। স্বামী-স্ত্রীতে এতো ঝগড়া ? এ-তো একমাত্র মাঝবয়সী মানুষের ক্ষেত্রেই সম্ভব! এখন পিছনে তাকিয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছি ওসব আদৌ ঝগড়া ছিল না ছিল 'প্লট' নির্বাচনের মহড়া।

আমার জানালার এতো ধারে, প্রায় মুখোমুখীই, ওদের স্থান নির্বাচন করা দেখে আমার এখন মনে হচ্ছে যে হয়তো আমার জন্যেই ওরা যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে তা নিতে পেরেছে। আমাকে ওরা ক্ষতিকারক প্রাণী বলে মনে করেনি। উপরন্তু মনে হয় আমার নিবিষ্ট-চিত্ত একাগ্র-কলম কাগজ-মনটিকে ওরা ওদের গার্হস্থ্য জীবন যাপনের জন্যে সহযোগী বলেই মনে করেছে। আমি ঘরে বেশিরভাগ সময়ই একা থাকি অন্য কোনও প্রাণীর অহরহ বিরক্তকারী

উপস্থিতির অভাব ওরা হয়তো নিরীক্ষণ করে থাকবে। মাঝে মধ্যে বাইরের দিকে তাকালেও আমি যে ওদের দেখিনা, কিছুই দেখিনা, একেবারেই শূন্য দৃষ্টিতে আকাশ আর সবুজের ছোঁয়া নিই, তা ওরা অবশ্যই নিশ্চয় বুঝে গেছে। মেয়েরা শুনেছি ছেলেদের দৃষ্টিকে এক্স-রের মতো দেখে-বুঝে নিতে পারে। শালিকরাও কি পারে মানুষের মন পড়ে নিতে ? জানি না। দুটোর কোনটাই জানি না। তবে এটা বুঝি যে প্রকৃতি দুর্বলদের মধ্যে বাঁচার জন্যে বিপদকে আগাম টের পাবার জন্যে অনেক সূক্ষ্ম সব অনুভবতন্ত্রী জন্মসূত্রেই দিয়ে থাকে। কারো দৃষ্টির গভীরে কারো বা শ্রবণের মাধ্যমে। আমি প্রকৃতি বিজ্ঞানী নই, প্রাণীবিদ্যায়ও আমার পাবদর্শিতা নেই। হরিণের উন্নতগ্রীব সভয় পলায়ন দৃশ্য টেলিভিশনের দৌলতে দেখেছি বাদুড়ের 'সুপারসনিক' প্রত্যক্ষের কথা জেনেছি, আর অনুমান করেছি এদের, এই শালিকদেরও, বোধহয় তেমন কোনও দিক্-নির্দেশক অবস্থা-নির্ণায়ক অনুভবতন্ত্রী থেকে থাকবে। ওরা ঘর বেঁধেছে একেবারেই কাছে, কিন্তু পত্র-পল্লবের আড়ালটি নিতে ভোলে নি।

আমার এই ঘরটি মাঝে মধ্যে বেশ গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে। তখন রাজনীতি সমাজতত্ত্ব সংসার-সংগ্রাম এবং সাহিত্য-দর্শন নিয়েই মশগুল থাকি। সে সব সময়ই চা-অন্ত স্হায়ী ; শালিক দৃষ্টিতে ক্ষণস্হায়ী এবং অবশ্যই অহিংস। এখানে মাঝে মধ্যে আমার ভাইঝিরা দলবদ্ধ হাজিরা দেয়। কারো অঙ্কের সমস্যা তো কারো ইংরেজীর। সমাধান পেলেই তারা চলে যায় অন্দর মহলে। ওখানে আছে ওদের প্রাণের স্পর্শ। বৌদি আছেন এবং আছেন ওদের সকল অন্তর জুড়ে। এখন তাঁর আবার একটি মিষ্টি-দুষ্টু ডিং ডং ছেলে হয়েছে। বয়স তার যতটাই ছোট স্বভাবে ব্যবহারে হাসি তামাসায় সে ততটাই দড়। তাই ছোটদের অবস্হান আমার ঘরে নিতান্তই অঙ্ক অন্ত বা শব্দ-বাক্য-অন্ত। শালিক মাতা অবশ্যই সে সব পরিসংখ্যান পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করে 'কমপিউট' করে নিয়ে থাকবে। এবং নিশ্চন্ত বোধে ডিম্ব-লালনে একাগ্র হতে পেরেছে।

এই ভাইঝিদের মধ্যে কনিষ্ঠতমাটির না আছে অঙ্কের সমস্যা না ইংরেজীর জটিলতা। কিন্তু সে সঙ্গে আসে, এটায় হাত দেয়, ওটাকে নাড়াঘাঁটা করে। মুখে তার কথাটি নেই, হাতে-চোখে অনন্ত চঞ্চলতা। সেই ছোটটির চাইনিজ

কাট চুলের আড়ালে অত্যন্ত চকচকে দুটি চোখ হঠাৎই স্থির হয়ে গেল জানালার বাইরে, ওর হাত থেমে গেল। তার অত্যন্ত ভাব মাঝের জনের সঙ্গে, প্রায় একই ওয়েভ লেংথ। ইঙ্গিতে, চোখের তির্যক ইশারায় সে দিদিকে দিক্‌নির্দেশ করল। সেই নির্বাক নাটক আমার চোখে পড়ার কথা নয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে নিষ্কর্মা আমি আকৃষ্ট হলাম। ছোট-মেজর চোখ আর বিস্ময় অনুসরণ করে সেই আমি প্রথম দেখলাম। শালিক। ডিমে তা দিচ্ছে।

আচ্ছা অন্য কারো চোখে পড়ল না কেন? আমার না হয় বয়সের ছানি চোখের তারাকে ঢেকে ফেলেছে; আর যারা স্বর্ণময় তারুণ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জগৎ দেখছে আর সবুজ যৌবনে যারা প্রেমের কাজল কালো চোখে জীবনকে দেখছে? তাদের চোখে এই শালিকের সুন্দর গৃহকোণটুকু এতোদিনে পড়ে নি কেন? আমার ত্রয়োদশী ভাইঝি, অত্যন্ত দুরন্ত এবং অস্থিরমতি, তার কথা বাদ দিলাম। একাদশী দ্বিতীয়া কেন দেখল না? আবিষ্কারের দায় কেন 'অষ্টমী' ছোটর জন্যে তোলা রইল? মনে হয় আমরা যেমন যেমন বড় হতে থাকি আমাদের দৃষ্টিও তেমন দূর থেকে আরও দূরে সরে সরে যায়। যা কাছে তা নজরেই পড়ে না। সে দৃশ্য ঘাসের শীর্ষে একবিন্দু শিশিরই হোক আর অদূরে শান্ত সমাহিত শালিক জননীর সন্তান স্নেহে নিবিষ্ট-চিত্ত ধ্যানমূর্তিই হোক। কবির স্বচ্ছ দৃষ্টি আর শিশুর সত্য-দৃষ্টি বোধহয় খুবই কাছাকাছি।

তুলিকা, আমার ভাইঝি, আমাকে দেখাতে চায় নি। কিন্তু আমার দেখাকে সে পথ দেখিয়েছে। আর সেই থেকে আমার আর দেখার শেষ হতে চায় না। নিজ শরীরের গভীরে ধারণের মানবীয় দীর্ঘ প্রতীক্ষা নেই কিন্তু আছে নিজের শরীরকে অস্বিষ্ট করে উষ্ণতার অবগাহনের দীর্ঘ অপেক্ষা; সন্তান প্রসবের মানবীয় যন্ত্রণা নেই আছে অনাহার ক্লিষ্ট শুষ্ক দেহ লালনের বেদনা। ত্যাগ যে মহত্তের জন্ম দেয় তা যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। আহার নেই, বোধহয় সে বাসনাও অন্তর্হিত; কাক চিল ইত্যাদি ক্রূর শত্রুর আক্রমণে নিরুদ্বেগ, সম্ভবত সে সম্ভাবনাও নেই; ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎপাত মাঝে মধ্যেই ভীষণের তাড়নায় ধেয়ে আসতে পারে, এসেওছে দু'একবার, সে বিষয়ে নিরুত্তাপ ধৈর্য—এই সব মিলে এবং এই সবের মধ্যে ওই যে শালিক

মাতা নীরবে সন্তান লালনে দীর্ঘ দিন-যামিনী একই অবস্থায় একই অবস্থানে সমাসন্ন তা যেন আমাকে মোহিত করে দিল।

সন্তান তপস্যায় আকণ্ঠ নিয়োজিত এই মাতৃরূপের পাশাপাশি আমার আর একটি বিষয় নজরে পড়ল। গ্রীষ্মের এই প্রথমার্ধ সময়ে আমাদের ওই আমগাছে সারা বছরের মতোই কাকের বেশ উপদ্রব থাকে। রুটির টুকরো, অর্ধব্যবহৃত সাবানখণ্ড, মরা ইঁদুর, মাছের ফেলে দেওয়া নাড়ি-ভুঁড়ি, আরো কতো কিই না ওরা এডালে-ওডালে বসে গলাধঃ করে। আর ঝগড়া-বিবাদ, চিৎকার-চেঁচামেচিতে কান পাতা দায় হয়ে ওঠে। আমার এই আমগাছকে ওরা ওদের অবসর সময়ের বিশ্রাম ক্ষেত্র রূপেও ব্যবহার করে থাকে; আবার আশে-পাশের গৃহ-বধূদের অন্যমনস্কতার সুযোগের সন্ধানে ওরা গাছটিকে 'অবজারভেশন পয়েন্ট' করেও ব্যবহার করে। ওরা কারো 'সম্পদ' হরণ করেছে কিনা তা আমার জানা নেই, তবে এ-জানি যে ওদের কর্কশ রব কারোই ভাল লাগে না, আমারও না। তবে ওদের তাড়াতে গেলে যে 'সামাজিক এবং যৌথ' আক্রমণের শিকার হতে হয় সেটা প্রত্যক্ষ জানা। তাই সে রাস্তা আর মাড়াই না; সহ্য করাটাই সর্বোত্তম পন্থা বলে জেনে গেছি।

আমার বক্তব্য কাক-চরিত্র বিশ্লেষণে নয়, প্রকৃতির নিয়ম অনুধাবনে। যবে থেকে ঐ শালিকের তপস্যা দেখেছি, তবে থেকেই আমার মনে হয়েছে কাকেরা আর তো তেমন করে এই আমগাছটাকে ব্যবহার করছে না! এই ভাবনা মনে আসতেই একটু স্মৃতি হাতড়িয়ে অনতি-অতীতে অন্বেষণ চালালাম! হ্যাঁ, ঠিকই তো, অনেক দিন ধরেই আর তেমন কর্কশ 'সোলো' অথবা 'কোরাস' শুনি নি। অভ্যাসের ত্রুটিই তো এখানে; যা দেখা উচিত তা দেখতে দেয়না, আর যা দেখার কথা নয়, অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, সেই তাকেই যেন বার বার দেখা যায়! মনে হল সন্তান লালনের পবিত্রতায় পরিবর্তিত-আমার আমগাছটি তাই কাকেরা এড়িয়ে চলেছে। প্রকৃতি? নিয়ম? তা যদি হয় তাহলে আমরা, মানুষরা নিজেদের নিয়ে এতো গর্ব করার হেতু কোথায় পাই! গৃহে সন্তানসম্ভবা ভাবী জননীদের প্রতি তত্ত্বে-পুস্তকে ডাক্তারে-বদ্যিতে যে নির্দেশ দেয় সেই শান্ত-আনন্দ-নিরুদ্বেগ জীবন যাপনের জন্যে আমরা তাদের কতটা সুযোগ দেই? তিক্ততা সৃষ্টি করা থেকে, যন্ত্রণা

দেওয়া, টেনশন তৈরি করা থেকে মানসিক আঘাত দেওয়া পর্যন্ত সবই তো আমাদের অনেকেই অ-কাতরেই করে থাকেন! এমন কি সেই অবস্থায় পুড়িয়ে মারার ঘটনাও তো কম নেই ; কম দেখা যায় না গর্ভপাতের প্রচেষ্টায় অনিবার্য সংঘাতকে সমূহ করে তুলতে! আর এ'সবই তো চলে আপন লোকেদের মধ্যে, আত্মীয় স্বজনদের সান্নিধ্যে সহায়তায়। প্রকৃতি এখানে কি তাহলে বিকৃত? অপসারিত? অথবা, মানব প্রকৃতি কি সভ্যতার আলোতে সত্যের এলাকাকে অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে? সভ্যতার পথিকদের ধাঁধিয়ে দেবার জন্যে এখানে কোন্ ক্ষণপ্রভা চমকিত হঠাৎ-আলোতে অন্ধকারকে তীব্রতর করে তুলছে?

প্রকৃতির আপন গৃহের অন্দরমহলে তাই হঠাৎ যেন দেখতে পেলাম সমীহ করার নিয়ম, সহযোগিতার বাতাবরণ আর স্বাভাবিকের সুন্দরে রূপান্তরের নির্দেশ। ওদের পিঠ-চাপড়ানোর কেউ নেই, প্রকৃতির সহজাত স্বভাবে নিপীড়নের স্থান নেই, জমি-বাড়িব সীমানা নিয়ে কলহ নেই ; রক্তক্ষয় নেই, আর নেই অধিকার রক্ষার নামে যুদ্ধের, শান্তির জন্যে সংগ্রামের, সহাবস্থানের নামে পরনির্যাতনের নিয়ম। এ-সবই মানুষের সৃষ্টি, মনুষ্য সভ্যতার অনিবার্য অবদান।

ইত্যবসরে তুলিকার আগ্রহে মধ্যমা ভাইঝিটির ঘনঘন অঙ্ক-ইংরেজীতে অনুপপত্তি হতে লাগল! সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই আমার টেবিলে খাতা-বই প্রসারিত করে দিয়ে জানালায় মনোনিবেশ করতে লাগল। ছোটটি তো জানালার গ্রীলে মুখ ঠেসে দিয়ে দেখার যন্ত্রদুটিকে যথাসম্ভব শালিকের কাছাকাছি নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠতো ; মধ্যমাও তারই পিছন পিছন নিজের 'ক্যামেরা-চোখ' নিয়োজিত করে ফেলত। ওদের আগ্রহের কাবণ আমার অজানা হলেও অনুভবের বাইরে নয়। তাই বাধা দেই নি কখনও। তাছাড়া ওই আত্মনিবেদিত শালিকও ওদের যেন নির্ভয় আপনমন্যতায় সটান দেখতে থাকত। উভয় পক্ষেরই যেন দেখা আর শেষ হত না। অপেক্ষমাণ বিদ্যারূপী বই-খাতার তাড়নায় মধ্যমার যদিও বা ধ্যানভঙ্গ হত, কনিষ্ঠা নিরুত্তাপ, নিরুদ্বেগ একাগ্রতায় শালিক-মন, শালিক-দৃষ্টি হয়ে, প্রায় ঐ শালিকের মতোই, নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকত। ওদের এই দ্বৈত মোহ ভঙ্গ করতে আমার মন চাইতো না। অথবা বলা যায়, আমার মধ্যে যদি কোনও

শিশু এখনো বেঁচে থাকে তাহলে সে বোধহয় ঐ কনিষ্ঠার মনের 'নাও' বেয়ে শালিকের ঘরে প্রবেশের পথ খুঁজতো !

নানান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ক'টা দিন আর সময় করে লেখার টেবিলে বসতে পারিনি। টের পেয়েছি ওরা দুজনে বহুবারই যাতায়াত করেছে। ওদের আকর্ষণ একদিকে পশ্চিমপ্রান্তে মিষ্টি-দুষ্টু আমার নাতির, আর ওদের ডিং-ডং-এর প্রতি ; অন্যদিকে শালিক গৃহের ধ্যানগম্ন জীবনের প্রতি। আবার যখন সময় করে একদিন সকালে টেবিলে বসলাম, তখন প্রথমেই শালিক-গৃহের কথা মনে পড়ল। ক'টা দিন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। সটান কাউকে দেখতেই পেলাম না। ঘাড় ঘুরিয়ে আম্রপল্লবের আড়ালে তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিলাম। নেই ! মনে একটা ধাক্কা খেলাম। কখন গেল ? কোন শুভক্ষণে ওর সাধনার সিদ্ধি আর প্রতীক্ষার সমাপ্তি ঘটল ? কেন চলে গেল কিছু না বলে ?

সিঁড়িতে দু'জোড়া পায়ের শব্দ পেলাম। আমি ঘরে নেই ভেবে তুলিকা এবং মধ্যমা দ্রুত ধুপ্‌ধাপ্ করে উঠে আসছে। আমাকে দেখেই থমকে গেল। একপা-দু'পা করে ভিতরে এলো। আমার জানা তথ্য দিয়ে ওদের মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না। নিজেরাই তো এক্ষুণি জানতে পারবে। ওদের গতিকে সহজ করে দিতে আমি কলম খুলে টেবিলের বুকে প্রসারিত কাগজে দৃষ্টি ফেললাম। ফিস্ ফিস্ বেদনার উচ্চারণ আমার কানে আসছিল ; হতাশা। ওদের আশাকে শূন্য করে দিয়ে, আগ্রহকে আমল না দিয়েই যে শালিকটি গৃহত্যাগ করে উড়ে গেছে তা ওরা সম্যক বুঝে উঠতে পারছিল না। ওদের কষ্টের কারণ আমার কাছেও সমান সত্য। হতোদ্যম, ভগ্নহৃদয়, রোদনভরা মন নিয়ে ওরা দু'জনেই আবার একপা-দু'পা করে বাইরে চলে গেল। আমি কলম বন্ধ করে আমগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অন্তরের নীলকে খুঁজতে চেষ্টা করলাম।

আপন মনে কখন যেন চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়েছি। আকাশের নীল নেই, গাছের সবুজ নেই, ঘরের দেয়াল টেবিল কাগজ-কলম সব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কল্পনার দৃষ্টি তে উজ্জ্বল ভেসে আছে এক জোড়া মিনতি ভরা ধূসর চোখ। চিনতে এতোটুকু ভুল হল না ঃ মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় স্থির-নিষ্পলক সেই শালিকটির চোখদুটি। এতোদিন খোলাচোখে গবাক্ষ-নির্ভর 'গবাক্ষ'-দৃষ্টি ছিলাম। সব তো

কখনই চোখে পড়ে না। হঠাৎ মনে হল প্রাণী জগতে প্রাকৃতিক নিয়মেই তো নির্ধারিত সময়ব্যাপী দ্বৈতদায় স্বীকৃত ; তাহলে শ্রীমতীর শ্রীমানকে দেখলাম না কেন ? এতোদিন হল ওকে এতো কাছে থেকে দেখলাম কিন্তু ওর 'তিনি'কে তো একবারের জন্যেও দেখা হল না, পরিচয় হল না তার সঙ্গে ? ওদের কী তরুণী-প্রেম ? ডিমে তা দিতে বসিয়েই দয়িত অন্যত্র গা-ঢাকা দিল ? পালিয়ে গেল ? অন্যতর কোনও বাগানে অন্য কোনও ফুলের সন্ধানে ?

মনের মধ্যে একটা 'না-না'র ধ্বনি যেন প্রবল থেকে প্রবলতর শক্তিতে আমাকে বাধা দিয়ে উঠলো। কক্ষণই না, হতেই পারে না ! সে অবশ্যই ছিল, গাছের এপ্রান্ত ওপ্রান্ত ঘিরে সর্বক্ষণই পাহারায় ছিল। আর সেই জন্যেই অন্য কোনও পাখি, এমনকি কাকেরাও এ-দিক মাড়ায় নি ! তাই কি ? হবেও বা।

মা-শালিককে তো আর নিজের বাচ্চা 'মানুষ' করতে হয় না ; সে স্বভাবজ নিয়মেই শালিক হয়ে গড়ে ওঠে। ওদের শেখাতে হয় না, ওরা শেখে ; ওদের জন্যে স্কুল কলেজের দরকার হয় না, প্রকৃতির পাঠশালায় ওদের হাতে খড়ি, মুখে খাবার আর গৃহ-বয়ন সব শেখা হয়ে যায়।

ক'দিন বাদে, আজ সকালে টেবিলে বসতেই দেখলাম সেই সবই আছে নেই কেবল শালিকের বাসার সেই সৌন্দর্যটুকু। কে যেন তছনছ করে গেছে। বেশ কষ্ট হল। আম্রপল্লবটির পাশ দিয়ে ভাল করে ত্রিকোণ ডালের অন্দরে গৃহটুকুতে ভাল করে নজর করতে গেলাম আর তখনই একটা কর্কশ কা'-রব আকাশের গায়ে আর জানালার গ্রীলে ছুঁড়ে দিয়ে একটা কাক ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসাটার পাশের একটা ডালে। ঘাড় বাঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টিহেনে সে ঠোঁটে করে একগুচ্ছ কুটোকাটা তুলে নিল। আমার দিকে আর একবাব তাকিয়েই চম্পট দিল, নীরবে। এবং আর একটা। সেও যেন আমাকে তাতানোর জন্যেই ডালে বসে দু'তিনবার কণ্ঠ-ঘোষণাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে ছিন্নভিন্ন বাসাটা একবার দেখেনিল। ডালের উপর এপাশ ওপাশ করে ঘুরে নিল। কোন্ দিক থেকে ঠোক্কর দিলে বেশি 'মশলা' পাওয়া যাবে বোধহয় তাই নিরীক্ষণ করে নিল। এবং ছোঁ-মেরে এক-ঠোঁট কুটো নিয়ে হুস্ করে চলে গেল। দু'চার, টুকরো তার পক্ষতাড়নায় নিচে ঝরে পড়ে গেল ! রাগ হল তখনই। যে এই বাসা প্রথম বানিয়েছিল সে তার প্রতিটি ইঁট-কাঠ-চুন

সুরকিকে প্রাণের অধিক প্রিয় করে সংগ্রহ করেছে। প্রয়োজনের অধিক মমতায় সংস্থাপন করেছে আর আশাতীত যত্নে সজ্জিত করেছে। এখন এই কাকেরা সেই কষ্ট-করে করা এবং যত্নে গড়া বাসাটিকে ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে। নিছক চৌর্যবৃত্তি!' পরদ্রব্যে ওদের লোভ স্বাভাবিক, যত্নই অস্বাভাবিক। তাই ফেলে ছড়িয়ে তছ্‌নছ্‌ করতে ওদের প্রাণে বাধে না।

মনে মনে স্থির করলাম এবারে এলে তাড়াব। তস্করবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

———

।। সেই ঘুঁটেওয়ালী ।।

কলেজে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি চলছে। সময় অফুরন্ত। আমি স্বভাবতই একটু কুঁড়ে প্রকৃতির, আয়েস করাটাকে অধিকারের মধ্যে প্রায় সামিল করে এনেছি। এর জন্যে আমার সদাকর্মব্যস্ত স্ত্রীর অবদান অনেকখানি। এমন কি সকাল বিকেল সময় পেলেই তিনি আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তা সংলগ্ন সুপরিসর ফাঁকা জমিটুকুর বুকে খোঁচাখুঁচি করেন, দু-চারটে ফুল গাছ লাগান আর অপেক্ষা করে থাকেন কোনও একদিন বাতাসে আন্দোলিত হয়ে দু'চারটি সুন্দর, চোখের ইশারায় আর গন্ধের টানে, সব প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলবে। ভবিষ্যতের হাতছানিতে তাঁর এই বর্তমানের ত্যাগ স্বীকার, কষ্টকর অনুশীলনে ব্রতী হওয়া আর ঘর্মাক্ত কলেবর হওয়াটাকে যেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম তেমনি মনে মনে একটা অপরাধ-বোধের খোঁচাও খেতাম। তাই একদিন তেড়েফুঁড়ে লেগে গেলাম বাগানের পিছনে। রোজ সকালে দেড়-দু'ঘন্টা, আবার বিকেলে চা পর্ব শেষ করেই নিচে নেমে যেতাম বাগানের পরিচর্যায়। নেশার মতো মনে হত।

এই রকম এক বিকেলেই প্রথম তাকে নজরে পড়ল। নজরে পড়ল বলার চাইতে শ্রবনে পড়ল বলাই উচিত। এক মনে কোদাল চালাচ্ছি, ঘামের ঝরণা সর্বাঙ্গে প্রলেপের মতো জড়িয়ে-ঝরিয়ে কাজের নেশাকে ক্রমশই যেন একাগ্র করে করে তুলছিল। আপন মনে সাত-পাঁচ, আগড়ুম বাগড়ুম চিন্তার আর কল্পনার ছোট-বড় ঢেউগুলো উঠছে পড়ছে। হঠাৎই যেন পাশেই অনুচ্চ কণ্ঠের অনুরোধ ভেসে এলো ঃ 'বাবু একটু ধরে দিবি ?' কণ্ঠস্বরে উচ্চকিত হলাম কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে একঝুড়ি ঘুঁটে মাথায় এক মধ্যবয়সী হিন্দুস্থানী রমণীকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। এদিকে-ওদিকে চোখ চালিয়ে সেই পড়ন্ত বেলার রাস্তায় আর কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমার বিস্ময় কাটছিল না, আবার ঐ কণ্ঠধ্বনি শুনতে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। এমন যার কণ্ঠ-মাধুর্য সে ঘুঁটের ঝুড়ি মাথায় ? ঘুটেওয়ালী ? কেমন করে সম্ভব ? জীবনের যে পর্যায় থেকে এদের জীবন শুরু হয়, যে প্রক্রিয়ায় এদের জীবনসংগ্রাম এদের বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহে মদত যোগায় আর যে পরিবেশে

এরা জন্মায়, বাঁচে আর বড় হয়, সেই সব সার্বিক বিষয় থেকে তো ঐ কণ্ঠ জন্মায় না ; জন্মালেও তো তা দীর্ঘদিন সম্পন্ন থাকার কথা নয়। আমার হাত থেমে গেছে, অবাক বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, একদৃষ্টে ঘুঁটেওয়ালীর দিকে যেন ফাঁকা চোখে তাকিয়েই আছি। 'কেউ নেই বাবু, একটু ধরে দিবি ? ঝুড়িটা ? একটুখানি বসব।' দু'পা এগিয়ে গিয়ে ওর ঝুড়িটা নামিয়ে দিলাম। বেশ ভারি ! হবে না ? পিরামিডের মতো উঁচু করে সাজানো ঘুঁটের পাহাড় সেই ঝুড়ির গর্ভে। মাথা থেকে গামছার-না-কাপড়ের 'বিড়ে'টা নামিয়ে নিল, ঘাসের উপর বাঁহাতের ঠেস্ নিয়ে আয়েস করে বসল আর ধীরে ধীরে বিড়েটা খুলে ডান হাতে এদিক-ওদিক আন্দোলিত করতে লাগল। বোধহয় একটু হাওয়ার লোভে। অথবা, অভ্যাস বশে ; ক্লান্ত দেহের প্রতি অবসন্ন মনের সহানুভূতি।

নিজের কাজে আবার মন দিয়েছি। জমি থেকে জঞ্জালগুলোকে এবারে বেছে সরিয়ে ফেলছি। ছোট হাতকোদালটা দিয়ে বড় বড় মাটির চাঁইগুলোকে ঘা দিয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে মিহি করে ফেলছি। কতোটা সময় চলে গেছে খেয়াল নেই। ঘুঁটেওয়ালীর কথা না ভেবে আর এক কাপ চা হলে কেমন হয় তাই ভেবে ভেবে উপরের বারান্দার দিকে বারে বারেই চোখ চালাচ্ছি। গৃহিনীকে যদি চোখে না পাই, পুত্রকে পেলেও হবে, অথবা মেয়ে। 'সিগন্যালেই' কিস্তিমাত করা যাবে যদি আমার পুত্র-কন্যাদের কাউকে দেখতে পাই। এমন সময়ে দেখলাম সিঁড়ি বেয়ে টি-পট হাতে আগে আগে গৃহিনী এবং তার পিছে পিছে কাপ এবং সসার হাতে তস্য খিদ্‌মতগার আমার পুত্র এবং কন্যা দৃপ্ত পদে বাগানের দিকেই আসছে। সেই দানই শ্রেষ্ঠ যা চাইবার আগেই দেওয়া যায়, সেই পাওয়াতেই আনন্দ যা না চেয়েই পাওয়া যায়। মনে মনে স্থির করলাম ঃ আমি বাগানই করব, বাগানই করব !

নেই। পিছন ফিরে ঘুঁটেওয়ালীর সন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম যে কখন যেন চলে গেছে। এখন রাস্তা দিয়ে দু'চার জন যাতায়াত করছে, দোকান বাজারের সময় হয়ে গেছে। তাদেরই কাউকে ইঙ্গিতে অনুরোধ করে সে তার ঝুড়িটিকে শিরোধার্য করে থাকবে। 'ইঙ্গিতে' বললাম এই জন্যে যে সেই কণ্ঠ যদি ধ্বনিত হত তাহলে অবশ্যই তা কানে প্রবেশ করত। অমন কণ্ঠ একমাত্র সঙ্গীতের মাধ্যম হতে পারে, অত্যন্ত পরিশীলিত ঘোষিকার হতে

পারে আর হতে পারে কোকিলের বা নাইটিংগল্-এর ! একটু যেন অবসন্নবোধ করলাম, একটু হতাশা, কিছু বঞ্চনা। বেশ পুরু এবং পুষ্ট তার ঠোঁট দুটো ভোঁসলে বোনেদের মতো তার কণ্ঠকে বোধহয় সংগীতময় ধ্বনি দিয়ে সার্থক করেছে। কপালে বহু বলিরেখার সহাবস্থান, চোখে সুর্মার প্রলেপ বেশ তীব্র করে টানা। নিটোল বাহুদ্বয় পরিশ্রমের নিত্যছাপে দৃঢ় এবং তার প্রায় সবটাই 'টাটু'-করে ছবি-ছয়লাপ। এসব অন্য কেউ হলে হয়ত নজরেই পড়ত না ; কিন্তু ওর কণ্ঠাকৃষ্ট আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিকভাবেই তৎক্ষণাৎ বেড়ে গেছিল। ঝুড়ি নামাতে নামাতেই সব আমার দৃষ্টিতে পড়ে যায়। কিন্তু আমাকে সে তার ঝুড়ি তুলে দিতে বলল না কেন ? কেন সে অন্যের সাহায্যে চলে গেল ? কৃতজ্ঞতা বোধও নেই ? অবশ্য এক ঘুঁটেওয়ালীর কাছে এ-সব আশা করাই বা কেন ? কিন্তু ওর সেই কণ্ঠ ?

বাগানের পিছনে সময় দিতে গিয়ে সময় দেওয়াটা যেন ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। জমির পরিমাণ এবং ঘাস পাতা উদ্ভিদ সমাজের উন্মূলন ঘটাতে সকালের সময় যেমন বাড়তে থাকল, বিকেলের কাজও তেমনি বাড়ল। স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ের সাহায্য পাই, নৈকট্য পাই। বাগান পরিচর্যায় ওদের আগ্রহও বেশ বাড়তে লাগল। একদিকে ফসলের ক্ষেত করে তুলেছি, অন্য প্রান্তে ফুলের বিছানা। কিচেন গার্ডেনের পরিসর মোটামুটি মন্দ নয়। এই সব কাজ করতে করতে আমাদের ঘুঁটেওয়ালীকে এখন রোজই দেখতে পাই। সকালে রাস্তা দিয়ে ঝুড়ি মাথায় ওকে দেখা যায়। খালি ঝুড়ি নিয়ে বেলায় ফেরে। বিকেলেও ওকে দেখি। কখনও ঝুড়ি-পিরামিড মাথায় কখনও শূন্য ঝুড়ি। যে কোনও অবস্থাতেই ওর গতি বেশ মন্থর ; চলনে বেশ একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি রেখে ও পা ফেলে। কারো সঙ্গে কথা বলতে বা গল্প করতে ওকে কখনও দেখিনি। আমাদের বাগান থেকে বহুদূর পর্যন্ত অনেক বাড়িঘর দেখতে পাই। দু'পাশ ঘেঁষে যে রাস্তা গেছে এবং একটা কোণ থেকে যে গলি পথটি গাঙ্গুলী পাড়ার দিকে সটান চলে গেছে তার সবটাই দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তা দিয়ে সকাল সন্ধ্যায় বহুজনের যাতায়াত। চেনা, অচেনা। পরিচিতজন আর অপরিচিত জনেদের চোখে কৌতূহল দেখি ; আমার বাগান করা নিয়েই হবে বা ! কখনও দেখি, কখনও দেখার মতো অবকাশই পাই না, কাজের মধ্যে ডুবে থাকি।

সেদিন সকালের কাজ করতে করতে একটু বেশি বেলা হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার চা পেয়ে গেছি স-প্রসেশন গৃহিনীর সৌজন্যে। চা-পানান্তে একটু প্রলম্বিত বিশ্রাম নিচ্ছি। ছা-পোনা নিয়ে তিনি চলে গেছেন উপরে। একেবারেই একা একা ক্ষেতের মধ্যে দৃষ্টি রেখে পাশে একটা মোড়া নিয়ে আপন মনেই বসে আছি। হঠাৎই স্বপ্নভঙ্গ হল ঃ 'অত কাজ করিস না বাবু, শরীর খারাপ হবে যে!' চোখ না ঘুরিয়ে আর ঘাড় না ফিরিয়েই বুঝলাম এ সেই ঘুঁটেওয়ালী। একটু যেন চপলতা ছুঁয়ে গেল ওর কণ্ঠে? জমির পশ্চিমদিকের পাঁচিলের উপর খালি ঝুড়িটা রেখে সে একটা ইঁট টেনে নিয়ে দক্ষিণ দিকের পাঁচিলহীন উঁচুজমিতে বেশ আরাম করে বসল। বুঝলাম আজ ওর মন ভাল আছে, ব্যবসা ভাল হয়েছে এবং ঘোরাঘুরিও বোধহয় কম হয়ে থাকবে। ও বোধহয় কথা বলতে চায়। তাই ঠিক। 'বাবু তুই চাকরি করিস না কেন?' প্রশ্ন শুনেই দুষ্টুমির ভূত চাপল মাথায়—'চাকরি পাই না তো। চেনা জানা নেই, তাই চাকরি কি করে হবে?' কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপরে বেশ প্রত্যয়ের আন্তরিকতা মিশিয়ে জানাল ঃ তোর চাকরি হবেই।' আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম—'কি করে বুঝলে?' এবারে তার 'তুই' ছুটি নিল, স্থান হল 'তুমি'র। চটজলদি জবাব দিল ঃ তুমি এতো লেখাপড়া জান, তোমার বৌ ছেলেমেয়ে আছে, তারা এতো ভালোবাসে তোমাকে, আর তুমি এতো কাজের মানুষ তাই তোমার চাকরি হবেই।' এই প্রথম ওকে অনেকখানি কথা এক সঙ্গে বলতে শুনলাম। আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। কণ্ঠ-ঝংকারেই আগে বুঝেছি, এবারে দেখলাম ওর গলার উত্থান পতন কেমন ভাববাহী, অসম্ভব শক্তিশালী ওর কণ্ঠের গতির সঙ্গে ছেদ-যতির ব্যবহার। ও যে গান করে করে কথা বলে; ও যেন কথা বলে না, কথাকে প্রাণদান করে। কোথায় পেল এই অত্যন্ত পরিশীলন-সাপেক্ষ বাক্-বৈদগ্ধ? কি করে বাস্তব হল এমন ঝংকার অনুরণন, গতিশৈলী? অনেক অধ্যাপককে দেখেছি কথা বলতে—কেমন সমান্তরাল, ফ্ল্যাট, একটা কণ্ঠ বার করেন। বেশিরভাগই যান্ত্রিক, একঘেয়ে। আর এই ঘুঁটেওয়ালীকে দেখছি। প্রতিটা শব্দই যেন ও ছুঁড়ে দেয় অর্থবহতা আর আন্তরিকতার ছোঁয়া দিয়ে দিয়ে। শব্দ মাধ্যম করে ও যেন ওর মনের ঐকান্তিকতাটুকু সঞ্চারিত করে দেয় অত্যন্ত অনায়াস ভঙ্গিতে! কেমন করে সম্ভব?

'আমি যে পরিশ্রমী সে না হয় সকাল বিকেল দেখে দেখে জেনেছ, কিন্তু আমি যে অনেক লেখাপড়া জানি তা তুমি কেমন করে জানলে ?' প্রশ্নটি না করেই পারলাম না। ভাবলাম যদি অন্য কারো কাছে আমার বিষয়ে জেনে থাকে তাহলে তো 'চাকরি নেই' এই বাহানা বেশিদূর টেনে না নেওয়াই ঠিক হবে, কারণ মিথ্যাটা ধরা পড়ে যাবে! কিন্তু ওর দেওয়া উত্তরে একদিকে আমার শংকা যেমন কেটে গেল, তেমনি ওর সরলমতি বিশ্বাসের কেন্দ্রটিকেও যেন খুঁজে পেলাম। ও বলল—'কেন ? সে আমি দেখেই বুঝেছি।' যাক, তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে দিলেই হবে যে অত স্কুলকলেজের রাত জাগা পরীক্ষা পর্যালোচনার আর দরকারই নেই। দেখে দেখে 'অনেক লেখাপড়া জানা' মুখগুলোকে এক একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেতে পারে। অবশ্য তাতে যে পরিসংখ্যানগত কোনও হেরফের হবে তা নয় ; তবে উপযুক্ত দর্শক—যাঁরা দেখেই বলে দিতে পারবেন—পাওয়া ভার হবে।

'ভাড়া যা পাও তাতে চলে যায় ?' এবারে ও আমার আর্থিক অনটনের পরিমাপ করতে চাইছে বুঝলাম। 'চার পাঁচ ঘর ভাড়াটে আছে তো তোমার ?' ওর গলায় সহানুভূতি মিশে যেন প্রশ্নগুলোকে বেশ আর্দ্র করে তুলছিল। ব্যক্তিগত এলাকায় আগ্রহের সূচ ফুটছিল বলে মনেই হল না। 'ঐ এক রকম করে চলে যাচ্ছে!' কি যেন একটু ভাবল, তার পরে বলল, 'তোমার মা তো লক্ষ্মী প্রতিমা, শাক পাতা ফুল তুলতে প্রায়ই তো নিচে আসেন। দেখেছি। অমন মা যার তার সংসারে দুঃখ থাকে না।' ভাবলাম আজ ওকে কথায় পেয়েছে। অনেক কথাই ও বলবে, অনেক প্রশ্ন করবে। তাই গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কোথায় থাক ? কে কে আছে তোমার ?' যতখানি ঘনিষ্ঠতা ও দেখিয়েছে তাতে এ প্রশ্ন আমি এখন ওকে করতেই পারি। 'ঐ তো ও পাড়ায়, দুলে পাড়ায়, থাকি। থাকার মধ্যে তো আছে আমার দু'টি মেয়ে, ছেলে নেই আমার।' সাদামাটা বিবরণ। কিন্তু কণ্ঠের মড্যুলেশনে—উত্থানপতনে—সেই বিবরণই যেন বেদনার স্পর্শ পেল। গভীর কোন দুঃখের দ্যোতনা। 'তোমার নামটা আমার জানা নেই' হঠাৎ-করা প্রশ্নের জন্যে নিজেরই কেমন যেন 'কিন্তু' বোধ এলো। ওর নামে আমার দরকার ? কেনই বা জানতে চাইলাম ? 'সবাই আমাকে লছমীর মা বলেই জানে।' যাক্ সহজ

করে দিল। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্যত্র। ওর কপালে সিঁদুর আছে। কিন্তু স্বামীর কথা বলল না তো! তাই অতশত না ভেবেই সহজ প্রশ্নটা করে বসলাম, 'লছমীর বাবা কি কাজ করে?' মুখের উপর বেদনার ছায়া পড়ল, কপালে ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠলো আর দৃষ্টিতে তীব্রতা এনে ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে যেন একাগ্র হল। উত্তর দিল না। বুঝলাম ব্যথায় স্পর্শ করে ফেলেছি। ওর জীবনের কোনও ট্রাজেডিতে খোঁচা দিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হল ওর চোখ বোধহয় ছল ছল করছে এতোক্ষণে। অবস্থা সামাল দিতে বাগানের প্রসঙ্গ তুললাম। 'আচ্ছা বলতো, আমাদের জমির পশ্চিমদিকটায় হলুদ বা আদা চাষ করলে কেমন হয়?' ধীরে ধীরে চোখ আমার দিকে ফিরিয়ে আনল, একদৃষ্টে অনেকটা বেদনা ঝরালো, নিঃশব্দ সময় ভারি হয়ে ঝুলে রইল আমাদের মধ্যে। তারপরে আস্তে আস্তে বিড়েটা মাথায় রেখে উঠে দাঁড়াল। ঝুড়িটা তুলে নিতে নিতে বলল, 'হলুদ খুউব ভাল হবে'। ও চলে গেল!

প্রসেশন করে চা এলো। গিন্নী প্রশ্ন করলেন, 'ঐ ঘুঁটেওয়ালী কি বলছিল?' 'ও কিছু নয়' বলে এক মুহূর্তেই শেষ করে দিলাম। চা'য়ে মন দিয়ে বিষয়ান্তরে স্ত্রীর মনকে পরিচালিত করতে বললাম 'ঐ দিকটায় হলুদ লাগালে কেমন হয়?'

দীর্ঘ ছুটির দীর্ঘতম অংশ পার হয়ে গেছে। বাগানে সবুজের হাতছানি হৃদয়হরণ আর ফুলের আন্দোলন মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। সবে বাগানের বৈকালিক পরিচর্যা পরিদর্শন মানসে হাল্কা মনে পদচারণা করছি সবুজের সান্নিধ্যে আর বর্ণের প্রাচুর্যে, এমন সময় মোহ ভঙ্গ করে সেই সুরেলা কণ্ঠের অভিমান-অভিযোগ কানে এলো, 'বাবু, মিছে কথা বলেছিস কেন?' আবার সেই প্রথম দিনের 'তুই' সম্বোধন, সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের সুললিত ঝংকার! অভিযোগও যেন ওর কণ্ঠে প্রিয়ভাষণের দ্যোতনায় সমৃদ্ধ হয়। আমাদের জমিতে বাঁ-পাখানা ঈষৎ তুলে দিয়ে শূন্য ঝুড়িটি বাঁ হাতের কনুই-এ কোমরে চেপে রেখে রণং দেহি মূর্তিতে লছমীর মা। ডান হাতে তার পাকানো বিড়েটি! আমি কাচুমাচু মুখ করে বললাম, 'কি মিছে বলেছি তোমাকে?'

জমির প্রান্তে থপ্ করে বসে পড়ল। মধ্যবয়সের এই লছমীর মার চোখে মুখে স্বাভাবিক মিষ্টতার সঙ্গে মিশে গেছে একটা দুষ্টুমির ছল-ছলাৎ

আনাগোনা। বুঝলাম অভিযোগ যত মারাত্মকই হোক না কেন আমার মুণ্ড যাবার সম্ভাবনা নেই! আবার প্রশ্ন করলাম, 'বল কি মিছে বলেছি তোমাকে?' লছমীর মা ফোঁস করে উঠলো, 'তুমি বড় চাকরি কর, কলেজে পড়াও, কতটাকা মাইনে পাও, আর আমি বন্ধুর মতো তোমাকে কি সব বলেছি। তুমি কেন আমাকে বল নি?' হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। 'এই মাত্র? আর কিছু নয়। ঘুচে গেল ভয়'। আমার ছন্দোবদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় ওর মনে কি হল জানি না। তবে ও আপন মনেই, অনুযোগের সুর মিশিয়ে, বলতে লাগল, 'এই মাত্র নন্দবাবুদের বাড়িতে ঘুঁটে দিতে গিয়ে অনেক একথা সেকথার মধ্যে আমি তোমার কথা, তোমার কষ্টের কথা, বলেছি কি বলিনি, ওরা হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলল। আমার রাগ হয়েছিল, ভীষণ দুঃখও পেয়েছিলাম। একজনের চাকরি নেই, সংসার কষ্টের মধ্যে চলছে, একথা শুনে কোনও প্রতিবেশী যে অমন করে হাসতে পারে তা ভাবতে পারিনি। তার পরে নন্দগিন্নী আমাকে সব জানাল। তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছো, ভীষণ ধোঁকা দিয়েছো। কেন, কেন?'

ওর চোখের জল ওর মনের পীড়নের বার্তাবহ। আমার খুবই অস্বস্তি হতে লাগল। এই সরলমতি মহিলাকে তার নিজের তৈরি অনুমানের জালে আটকে দিয়ে যে খেলা করেছি তার জন্যে কষ্ট হল। লছমীর মা একা নয়। অধ্যাপকদের যে চাকরি থাকে না তা অনেক অধ্যাপকের বাড়ির নবনিযুক্ত ঝি-চাকরেরা মনে করে। বসে বসে গৃহের অন্ন ধ্বংস করা আর স্ত্রীর পিছনে খুনসুড়ি করা বা ঝগড়া করা ছাড়া ওদের চোখে অন্য কোনও কাজই ধরা পড়ে না যে! কিন্তু লছমীর মা।

ইতি-উতি ঝোপঝাড় না পিটিয়ে সোজাসুজি বললাম, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আর হবে না। জাদুর মতো কাজ হল; লছমীর মা ভেঙিয়ে উঠলো, 'অন্যায় হয়ে গেছে। যেন অন্যায় বললেই সব দোষ শেষ হয়ে যায়?' বুঝলাম বরফ গলছে, গলেছে। 'তোমার এখন গরমের ছুটি চলছে?' জানালাম, 'প্রায় শেষ হয়ে এলো।' সেই বিকেলে ও আমার অনেক প্রশংসা করল, নন্দবাবুরাও নাকি আমার অনেক প্রশংসা করেছেন। 'তুমি কতো বড়, কতো লেখাপড়া জানো, কতো ছেলেমেয়েকে মানুষ করে তোল। আর সেই তুমি আমার মতো এক ঘুঁটেওয়ালীর সঙ্গে কতো আপন করে কথা বলেছো, ঝুড়ি নামিয়ে দিয়েছো' বলতে বলতে লছমীর মা চোখের

জলে বাকি অংশ প্রকাশ করল। নির্বাক অপেক্ষায় ওর মনকে হাল্কা হবার সময় দিলাম। ভাবলাম ওর এই চোখের জল তো স্বাভাবিক ভাবে সর্বথা ব্যাখ্যাত হয় না! ওর হৃদয়তন্ত্রীতে কোথায়ও এমন স্পর্শ লেগেছে যে সেই তন্ত্রী-ঝংকার অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে। অত্যন্ত সাবধানে এবং নম্র করে বললাম, 'লছমীর মা, তোমার জীবনে অনেক কষ্ট জমা হয়ে আছে, অনেক বেদনা, বহু আঘাত। তুমি আমাকে বলতে পার। বলে হালকা হতে পার। তাছাড়া আমি তো একটু আধটু লিখি। যদি তোমার কথা তুমি আমাকে জানাও তাহলে আমি তা লিখব।' একসঙ্গে প্রশ্ন, প্রস্তাব আর ভবিষ্যতের কথা শুনে লছমীর মা বিমূঢ়ের মতো থেমে গেল, চোখ মুছল আলতো করে, তার পরে আমার দিকে সপাটে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে বলব, বলব, সব বলব।'

সেদিন লছমীর মা সম্ভবত ভারি মন নিয়ে আমাদের সবুজ থেকে চলে গেছিল। কিন্তু বাগানের ফুলের টান যে তার পিছু নিয়েছিল তা বোঝা গেল পরদিন বিকেলেই। বিকেলের রোদ একেবারেই নেই, মেঘেরা দলবেঁধে আকাশের আঙিনায় মেলা বসিয়ে দিয়েছে। সমূহ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ছাড়া ছাড়া মেঘেরা কৈশোরের দৃপ্ত গতিভঙ্গিতে খেলায় মত্ত। হাওয়ার সঙ্গে খেলাটা বেশ জমে উঠেছে বলা যায়। সেই আকাশময় উল্লাসের ছোঁয়া লেগে বাগানের ফুলগুলোও ঊর্ধ্বমুখ আন্দোলিত, গাছের সবুজ যেন আনন্দে দিশেহারা, দিক্‌বিদিক্‌ হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে। বাগানের পশ্চিম দিকের কোণটাকেই বেছে নিল লছমীর মা।

পূর্ববঙ্গের বহু বাঙ্গালীদের সঙ্গে একসঙ্গে বালিগঞ্জের কোনও এক বস্তিতে ওর ছোটবেলাটা কেটেছে। পালামৌ এর কোনও এক প্রত্যন্ত বসতি থেকে ওরা কলকাতায় এসেছিল। ওরা মানে ওর মা আর বাবা। ওর বাবা রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ের কাজ করত। পয়সা কম, তাতে আবার রোজ কাজ হত না। তাই ওর মা কাজ জুটিয়ে নিল পাশেরই এক বিরাট রাজকীয় বাড়িতে। সুঠাম দেহ, উজ্জ্বল রং এবং সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিল ওর মা। ছোটবাবুর নজরে পড়ে থালাবাসন মাজার কাজ থেকে উন্নীত হয়ে রান্নার, কাচাকাচির কাজে বহাল হয়েছিল। এ-সব লছমীর মা তার মার কাছে পালামৌতে ফিরে গিয়ে একান্ত জীবনে শুনেছে। ওর জন্ম হয় অনেক

পরে। ওর বাবা তখন সন্ধ্যার সময় একেবারে বেহুঁস হয়ে থাকে। কখনও বস্তিতে ফেরে কখনও ফেরেই না। লছমীর মার যখন জন্ম হয় তখন ওদের সংসারে দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। কি সব ঝামেলা হয়ে ওর মায়ের চাকরিটা চলে যায়। ঘরে বসা স্ত্রীর দায় স্বামী নিতে চায় না; স্ত্রীর অর্জিত ধনে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে স্বামীদের দৃষ্টিভঙ্গিই বোধহয় পাল্টে যায়। তাই প্রথম প্রথম ঝগড়া থেকে হাত-পা চুলের ঝুঁটি হয়ে একদিন ওর বাবা মাকে ত্যাগ করে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এখানে ওখানে কিছুদিন কাজ করে এবং চলতি দুর্নামের ঝটকায় কাজ খুইয়ে খুইয়ে জীবন যখন যন্ত্রণায় কালো হয়ে এলো তখন ওর মা একদিন লছমীর মা'র হাত ধরে পালামৌ চলে গেল।

কলকাতার জীবন ওর শোনা; পালামৌ-এর জীবন ওর জানা। মায়ের আঁচলধরে নেচে-কুঁদে, কাঠ সংগ্রহ করে আর বিক্রি করে যখন ও বেশ বড়টি হয়ে উঠল তখন ওর মা ওকে নিয়ে বিপদ গুনলো। যেমন দেখতে হয়েছে, তেমন ওর চোখের ভাষা, কণ্ঠের কথা যেন গান হয়ে প্রকাশ পেতে চায়। ওর চলনে হরিণের চঞ্চলতা, দেহে সমুদ্রের ঢেউ। তাই কলকাতা থেকে আসা গ্রামের যুবকের সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলল। ছেলেটি ছটফটে, চালাক এক চতুর, জামাকাপড়ের বাহার দেখে বেশ ভাল আয়টায় করে বলে ওর মা'র মনে হয়েছিল। চট্‌জলদি বিয়ে হয়ে গেল। ছেলেটি ওকে নিয়ে কলকাতার পথে পা বাড়াল।

লছমীর মা অনেকক্ষণ চুপ করে আছে দেখে আমি জানতে চাইলাম, 'তখন তো তুমি লছমীর মা ছিলে না। কি নাম ছিল তা কিন্তু একবারও বল নি।' একটা দীর্ঘশ্বাস কণ্ঠে চেপে বলল, 'নাম ছিল মিনু, মিনুয়া। কিন্তু সে নাম আমার মরে গেছে, হারিয়ে গেছে, নিঃশেষে মুছে গেছে।'

ছেলেটির নাম ছিল বাহারী। খুবই ভাল নাম ছিল। জীবনে যে এতো বাহার আছে তা বাহারী না এলে জানতেই পারতাম না। কলকাতায় নয়, কলকাতার কাছেই বালিতে বাহারীর কাজ-কর্ম। ও বেশ ভাল রাজমিস্ত্রী। রোজই কাজ হয়। পয়সার অভাব হয়না। দুজনের সংসার বেশ হাসি আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ও দুপুর বেলাতেও, টিফিনের সময় বাড়িতে চলে আসত। একটা বস্তি মত এলাকা, তার মধ্যে

একটা ভাল ঘর নিয়ে ওরা থাকত। জীবন যে এতো সুন্দর তা মিনুয়া এর আগে কখনই বোঝে নি। ওর মাঝে মাঝে মনে হত ও যেন আকাশে মেঘের ভেলায় বাহারীকে নিয়ে একা একা ভেসে চলেছে। সামনে নেই পিছনে নেই, সময় যেন ওদের দু'জনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। এই ঘন সান্নিধ্যের জীবনে আনন্দের হাটে একে একে ওরা দু'টি কন্যাসন্তান উপহার পেল। মিনুয়ার নিঃসীম আনন্দের জীবনে শেষদিকে ক্রমশ যেন বাহারীর কপালের ভাঁজ ছন্দ পতন ঘটানোর কারণ হয়ে দেখা দিল। কেন? মিনুয়া বোঝে না। বাহারী বলে না। ছেলের জন্যে কি? ও নিজে সেই আগের মতো সুঠাম দেহটি হারিয়ে ফেলেছে বলে? বাহারীর জন্যে সময় ক্রমশই কমে গিয়ে সন্তানের দিকে চলে গেছে বলে? কিছুই মিনুয়া বোঝে না; ভাবনা দুর্ভাবনায় গড়ায় কারণ বাহারীর বিকেল ক্রমশই রাত্রের গভীরে প্রবেশ করে। এবং সেও যেন সুস্থ-স্বাভাবিক পদক্ষেপে নয়। মিনুয়া সব রকম চেষ্টা করে। চেষ্টা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শত চেষ্টাতেও মিনুয়া সেই সব দিনের যন্ত্রণার কথা সহজ গলায় বলতে পারে না। ওর কণ্ঠ বার বার রুদ্ধ হয়ে যায়। অনেকক্ষণই মিনুয়া কোনও কথা বলেনি। আমিও সাড়াশব্দ না দিয়ে মনে মনে সম্ভাব্য মিনুয়া জীবনের ট্রাজেডির গতি-প্রকৃতি নিয়ে ভাবছি। চোখ নিরুদ্দেশ আকাশের গায়ে, মেঘের পাশে পাশে। যেন অনেক গভীর কোনও খাদ থেকে ভেসে এলো মিনুয়ার গলা; 'বাহারী একদিন আর ফিরলই না, পরদিনও না, কোনও দিনও না।' আমি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাবার মতো মন নিয়ে বসে রইলাম। কিছুই ভাবতে পারছিলাম না কিছুক্ষণ। 'কেন গেল?' শুধু হাহাকারের মতো শোনাল মিনুয়ার প্রশ্ন। 'কেন গেল? কেন গেল?'

মিনুয়া যেমন সেদিন বুঝতে পারে নি কেন গেল, আমিও বুঝতে পারলাম না কেন গেল। বাঘ যদি অন্য বাঘিনীর আকর্ষণ পেয়ে থাকে তাহলে? সে অনুমানের কথা আমি মুখ ফুটে ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। কোনও সন্দেহ হয়েছে কখনও? চুপ করেই থেকেছি। ভেবে পাই নি, যে স্ত্রীকে সে এতোখানি ভালবাসতো, যার মাধ্যমে ফুটফুটে দুটি সন্তান সে পেয়েছিল, আনন্দের সেই সংসার, সেই স্ত্রী এবং কন্যাদের ফেলে যে চলে গেল, সে গেল কিসের টানে? কোন বিড়ম্বনায়? কোন্ গভীর নেশায়?

বারে বারেই দেখেছি ভাবাবেগে মথিত হলে মিনুয়া 'তুই' বলে আমাকে সম্বোধন করে। 'জানিস্ বাবু, আমার বাহারী কলকাতায় আছে এখন, ওর খবর অনেকদিন পরে পেয়েছি। এখানে কাজ করতে করতে এক তাজা কামিনের খপ্পরে পড়ে যায়। কলকাতায় ভাগে। কিন্তু শুনতে পাই ভীষণ কষ্টে দিন কাটায় এখন। একবার মেয়েমানুষের ঝোঁকে পেলে তার নাকি রক্ষে থাকে না। ওরও হয়েছিল তাই। মদে আর মেয়েমানুষে বাহারীটা শেষ হয়ে গেছে। সেই কামিনটা তো ওকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে ঘর বাঁধতে যায়। বাহারী কি একটা অসুখে মরমর অবস্থায় কোন্ এক বস্তিতে যেন শেষের দিন গুনছে।'

মিনুয়ার মুখের দিকে তাকাতে পারছিনা। কষ্টের কথা ও যেন অনেক ব্যথার সঙ্গেই বলছে। বাহারীর জন্যে ওর যেমন টান ছিল তেমন যেন এখন একটা বিরাগ মলাটের মতো ছেয়ে রয়েছে; ভিতরে যেন সেই অতীত স্মৃতির বাহারী একেবারে মুছে যায় নি। ওর জীবনের সব থেকে নরম জায়গায় সবথেকে ট্রাজিক কেন্দ্রে ও এখন স্মৃতিচারণ করছে। তাই কোনও রকম ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে আমার ভয় হল। ও যেন নিজের মধ্যেই হারিয়ে গেল।

মিনুয়া জেগে উঠল নিজে নিজেই। একেবারে সদ্যবর্তমানের জীবন যুদ্ধের কথায় এসে গেল। কাজের জন্যে পাগলের মতো খোঁজা খুঁজি করল। দু'চার বাড়িতে ঠিকে কাজ হয়েও গেল। কিন্তু তিনজনের সংসার। চালাবার মতো রসদ সংগ্রহ করতে উদয়-অস্ত সব সময়টুকুই অন্যজনের বাড়িতে বাড়িতে কাটিয়ে দিতে হয়। মেয়েরা একা একা থাকে। মিনুয়ার মন মানে না। মেয়েরা অনুযোগ অভিযোগ করে, মিনুয়ার মন ভারাক্রান্ত হয়েই থাকে। 'গায়ের রক্ত জল করা, বলতে কি বোঝায় তা এখন ও বোঝে 'মরার সময় নেই' কথাটারও মানে ওর কাছে পরিষ্কার। জীবনের অপর নাম যে সংগ্রাম তাও আর গোপন নেই ওর কাছে। ঝি-এর কাজ করার মতো মনটা তৈরি নয় বলে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। একবাড়ি থেকে অন্যবাড়ি যাবার সময় রাখা ওর পক্ষে কণ্টকর হয়ে ওঠে। কাজ শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না। 'লছমীর মা এটা একটু করে যাও, ওটা একটু গুছিয়ে রেখে যাও'-অনেক অনুরোধ উপরোধ রাখতে গিয়ে ওর প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে ওঠে। কোথায়ও অকরুণ মুখ ঝামটা কোথায়ও অকারণ অনুকম্পা, কোথায়ও অসুস্থ মনের হাতছানি—সব মিলিয়ে মিনুয়া স্থির করে বাসনমাজার কাজ ছাড়তেই হবে। ঝঞ্ঝাট ও এড়ানো যাবে

মেয়েদেরও সঙ্গ দেওয়া যাবে এমন কি কাজ হতে পারে ভেবে পায় না। সময় বিক্রি করেই তো পয়সা আসে ; মিনুয়া সময় বাঁচিয়ে পয়সা করতে চায়।

বুধিয়ার সঙ্গে এমন সময়েই দেখা। সে অনেকদিন যাবতই এই এলাকায় ঘুঁটে বিক্রি করে। অনেক লোককেই সে জন্মাতে দেখেছে। বুড়ি হয়ে গেছে, গায়ের জোর পড়ে গেছে। কেউ নেই বুধিয়ার। মিনুয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল বুধিয়ার প্রস্তাবে। ধীরে ধীরে সব খোঁজ খবর নিল এবং বুড়ির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিযে ঘুঁটে বিক্রি করতে লাগল। সেই শুরু। এবং তখন থেকেই ক্রমশ ব্যবসা বুঝে নিয়ে, বাড়ি বাড়ি সদ্ভাব তৈরি করে নিজের খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলল। তিনজনের সংসারের নিত্য প্রয়োজন সবই মিটে যায়। কষ্ট নেই। ভালই আছে মিনুয়া। অনেকেই ওকে ভালবাসে ; ভালবাসে ওর ব্যবহারে ওর কথাবলার ধরণে আর ওর মিষ্টি কণ্ঠের আন্দোলনে। মিনুয়াকে আমি জানলাম, লছমীর মাকে আমি সেদিন সামনে বসে থাকতে দেখলাম। দুঃখহীন, তৃপ্ত। কিন্তু সুদূরের ভয়ে ভীত মনে হল। সে কথা সেদিন চলে যাবার আগে বলেও গেল। মেয়েরা বড় হয়েছে। সে কখনই রাজমিস্ত্রী বা জোগাড়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেনা!

লছমীর মা সেদিন চলে যাবার পরে ওকে নিয়ে বেশি ভাববার সময় পেলাম না। বসে বসে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। চা-এর 'প্রসেশন' বাগানের প্রান্তে মার্চ করে এগিয়ে আসছে। আজ আমার এই উপঢৌকন অর্জিত নয়! স্ত্রী জানতে চাইলেন ঐ ঘুঁটেওয়ালী আমাকে অত কথা কি বলছিল ? বললাম ও কিছু নয়, জীবন সংগ্রামের কথা! যেন একটা ভারি শব্দ দিলেই মুখ বন্ধ করা যাবে! খুঁচিয়ে কথা বলানোর স্বভাব এই ভদ্রমহিলার কোনও দিনই নয় তাই নিশ্চিন্তে চায়ে মন দিলাম, ছেলেমেয়েদের পিছনে লাগলাম। এবং এক সঙ্গেই উপরে চলে এলাম।

ছুটি শেষ। অবার শুরু হয়ে গেল নিত্যদিনের আবর্তে ঘূর্ণায়মান জীবন। তারপরে বদলীর চাকরিতে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হবার ব্যাপার তো আছেই। তবে গৃহ আমি ছেড়েছি কিন্তু লক্ষ্মীকে ছাড়ি নি, সঙ্গে নিয়ে গেছি! ষাটের দশক থেকে, বোধহয় মিনুয়ার ঘটনা ছেষট্টির হবে, দীর্ঘদিন বাইরে কাটিয়েছি। মাঝে মাঝে যে বাড়িতে এসেছি, থেকেছি, তখন লছমীর মা'র সঙ্গে দেখা হয় নি। তাই ওর কথা প্রায় ভুলেই গেছি। এবারে আমার

অবসর নেবার সময় কাছে এসে গেছে। সেই শ্রমশীল দেহ নেই, উজ্জীবিত হবার মতো মনোবলও বোধহয় নেই। তাই বাগানের ব্যবস্থায় আছে মাইনে করা মালি। লছমীর মায়েদের সঙ্গে যোগাযোগের পথগুলো প্রায় সবই বন্ধ। এরই মধ্যে একানব্বই এর জানুয়ারীতে আমার বাড়ি থেকে ছোটভাই এর বাড়িতে যাবার পথে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল লছমীর মা'র সঙ্গে। দূর থেকেই ও আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। আমিও অনেকখানি আন্তরিকতা মিশিয়ে ওর খবরাখবর দিলাম। মাথায় ঝুড়িটা নেই। বিড়েটা হাতে রয়েছে। বললাম 'কেমন আছ? মেয়েরা কেমন আছে গো তোমার?' ইচ্ছে করেই 'গো'টা যোগ করলাম। দীর্ঘদিনের অদেখায় যদি ওকে রুষ্ট করে থাকে তাহলে সেই জট ছাড়ানোর জন্যে একটা নরম শব্দ কাঙ্ক্ষিত। বলল, 'ভাল আছি বাবু, দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে, ভাল আছে, বলেই একটু দম নিল। রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। ওর কথা যে শেষ হয় নি তা বুঝলাম, 'এখন বয়স হয়েছে, শ্বাসকষ্ট হয় বাবু; তাই একসঙ্গে অনেক কথা বলতে পারি না। তা, তুমি কেমন আছ বাবু?' বললাম, 'ভাল আছি, এবারে সত্যি সত্যিই কিন্তু বেকার হয়ে যাবো! বক্তব্যে অবশ্যই দুষ্টুমি ছিল, তা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল লছমীর মা। 'আমি ভীষণ বোকা ছিলাম বাবু। তাই বুঝতে পারিনি তখন।' লছমীর মার কণ্ঠটি অমলিন থেকে গেছে। ওর কথা শুনে ওর বয়সের আন্দাজ করা অসম্ভব, এখনও, এই পড়ন্ত বয়সেও। ওর গলার মধ্য থেকে উঠে আসা একটা নিটোল মিষ্টতা যা সেই প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমাকে মোহিত করেছিল, আজ ও সেই একই রকম করে, সঙ্গীতের মতো বাজালো। লয়ের পরিবর্তন হয়েছে, যতির প্রয়োজন বেড়েছে কিন্তু মাধুর্যটুকুর এতটুকু ব্যত্যয় হয় নি। এ-সব যখন ভাবছি তখন লছমীর মা জানাল, 'তোমার ছেলের বউ খুব ভাল হয়েছে, তোমার মেয়ের চাকরি তোমার মতই হয়েছে, আর ছোট মেয়ের তো অনেক দূরে বিয়ে দিয়েছো শুনেছি।' একটুখানি সময় নিল, হাঁফ ধরা কণ্ঠকে বিশ্রাম দিয়ে দুঃখ জানাল, 'যদি তোমারা দু'জনেই থাকতে কত ভাল হত!' ওর চোখের কোণে যেন জলের আভা দেখলাম। চোখ নিচু করে চটির মধ্যে বুড়ো আঙুলে দিয়ে চটি খুটছিলাম। আবার সেই পুরোনো দিনের মতো নৈঃশব্দ্য দানা বেঁধে দাঁড়াল আমাদের কথার মধ্যে।

'জানিস বাবু, আমার এক মেয়েকেও আমি রাজমিস্ত্রী আর জোগাড়ের সঙ্গে বিয়ে দিই নি। একজন মিলে কাজ করে অন্য জন দোকানে!' বুঝলাম। বললাম, 'বেশ ভাল করেছো'। আমার ভাই আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো। লছমীর মা বলল, 'যাই বাবু?' বললাম, 'আবার দেখা হবে'।

———

।। শিবানী, তড়িৎ এবং আমি ।।

শিবানীর চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, 'মানু, তুই আমাকে বাঁচা।' সমস্ত চিঠিটার মধ্যে শিবানীর আকুতি, কান্না আব যন্ত্রণা যেন কলমের ডগা বেয়ে কাগজের বুকে অশ্রু হয়ে আমাকে ঝাঁকুনি দিল।

বেশ মুশকিলেই পড়েছি বলা যায়। দীর্ঘদিনের 'কমন ফ্রেন্ড' ছিলাম বলেই দু'তরফই আমাকে নিয়ে পড়েছে। আমি যে ওদের অনেক বর্তমানকে জানি। ওরাই জানিয়েছে। একজন কাউকে বোধহয় জানাতেই হয়। ওরা আমাকেই বেছে নিয়েছিল। তাই যখন ওদের বর্তমানগুলো সব একে একে অতীত হয়ে হারিয়ে যেতে বসল, বলা যায় হারিয়েই গেল, তখন ওরা বারে বারেই সেই অতীতের বালুবেলায় বর্তমানের জন্যে ঝিনুক সংগ্রহ করতে চায়! ওদের জীবন এখন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ধারায় বইছে। ওদের মধ্যে মন চলে না, তবুও চিঠি চালাতে চায়। সে ওদের যা ভাল মনে হয় ওরা করুক। সমস্যা বাধে যখন মাঝখানে আমাকে টানে। একে এই মধ্যজীবনে এসে আমার নিজেরই হাজার ঝামেলা, সহস্র অনিশ্চয়তা, শতেক বঞ্চনা প্রতিনিয়ত আমাকে তাড়া করে ফিরছে, তায় এই পুরোনো বন্ধুত্বের জের টানতে একেবারেই হিমশিম অবস্থা। তাই তো ভাবলাম আপনাদের মতটা নিলে কেমন হয়। আমার কোনও দায় আছে কি? কিছু করণীয়? এখন?

শ্রীরামপুর তো আধা শহর। একই পাড়াতে দীর্ঘদিনের বাস ওদের দু'টি পরিবারের। শিবানী আর তড়িতের বাবা-কাকা-রা পাড়ার নানান কাজে, বারোয়ারি পুজোয় এবং নানা প্রয়োজনে একে অন্যকে বেশ ভাল করেই চেনে বলা যায়। মাঝে মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ির যাতায়াতটাও খুব নিকটে না হলেও বছরে দু'চারবার ঘটেই থাকে। এ থেকে সহজেই বুঝতে পারছেন ওদের দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ মেলা-মেশা মাসি-পিসি-দিদিমাদের চক্ষু-স্থির করার মতো কোনও ব্যাপারই ছিল না। প্রথম চলন তাই সহজই ছিল।

শিবানী যখন প্রথম জামা ছেড়ে শাড়ি পরল তড়িৎ তখন বিদ্যালয়ের শেষ ক্লাসে। তুই-তুকারির শিবানী-তড়িৎ কখন যেন তারুণ্যের চঞ্চলতায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে অবচেতনের তাড়নায় চেতনের সলজ্জতা পেয়ে গেল।

এটা ঘটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না, বরং স্বাভাবিকই বলা চলে। যা হবার তাই হল। ওরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসল। এবং শিবানী যখন স্কুল পার হয়ে কলেজে প্রবেশ করল তখন দেখা গেল তড়িৎ স্কুলের গণ্ডিতে বেশ গুছিয়ে বসে গেছে। শিবানী চলল সরস্বতীর টানে এগিয়ে; তড়িৎ পেল লক্ষ্মীর আকর্ষণ।

কিন্তু যত সংক্ষেপে শাড়ি পরার প্রথম দু'টি বছর শেষ করে শিবানীর কলেজ প্রবেশ তুলে ধরলাম ততটা সংক্ষেপে বছর দুটো পার হয় নি। শিবানী আমাকে এবং আমি শিবানীকে আবিষ্কার করলাম কলেজের 'ক্যামপাসে', গাছের তলায় ঝালমুড়ি খেতে খেতে। শিবানী গোপালের ঝালমুড়ির 'কনোসর', আমিও সেই স্বাদে মগ্ন। কাঁচা লঙ্কায় ওর যেমন আকর্ষণ আমারও তেমনি পক্ষপাতিত্ব। প্রায় একই সঙ্গে চোখ দিয়ে জল ফেলে ফেলে আঃ আঃ করে যখন সেই ঝালমুড়ি খাচ্ছিলাম তখন সজল চোখেই আমাদের আন্তরিকতার, পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধনটি একনিমেষেই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। এবং তড়িৎকেও দেখেছিলাম। এই সহশিক্ষা কলেজের মাঠে, গোপালের ঝালমুড়ির দেশে। একঝলকেই বুঝেছিলাম শিবানীর চোখে রঙের ছোঁয়া লেগেছে। এটা এমন কোনও ব্যাপারই ছিল না। আমার চোখটিও তো সেই বয়সের আলোর বন্যার জন্যে কম জাগ্রত নয়। তাই একই 'ওয়েভ-লেংথ' শিবানীর চোখে তড়িৎকে এবং তড়িতের মনে শিবানীকে দেখে নিতে দেরি করে নি।

এর পরেই একদিন পর পর দুটি ক্লাস ফাঁকা গেল। আমার আগ্রহ থাকলেও তা প্রকাশ করি নি। দেখলাম শিবানীর আগ্রহ আমার চাইতেও বেশি, সে প্রায় আমাকে টানতে টানতেই নিয়ে গেল মাঠের প্রান্তে, গাছের তলায়। পথিমধ্যে ঝালমুড়ির দু'টো ঠোঙা অবশ্যই তার মুঠিতে।

সেই প্রথম একজন সমবয়সীর গভীর মনের দুয়ার ধীরে ধীরে আমার তরুণ চোখের রঙিন তারায় ফুটে উঠলো। সেদিন শিবানী শুরু করেছিল অনেক অতীত থেকে। সেই যখন ও সাদা চোখের পারিবারিক আলোয় তড়িৎকে দেখেছিল। তড়িৎ তখন আর পাঁচটা ছেলের মধ্যে একটা। তখন জেনেছিল তড়িৎদের ব্যবসা আছে, জমি-জিরেত আছে আর লক্ষ্মীর-সেবাকে ওরা প্রধান কর্তব্য বলে জানে। এবং এও জেনেছিল যে ধনসম্পদের দেবী

ওদের প্রতি কোনও কার্পণ্য দেখান না। আরও জেনেছিল, অবশ্য ক্রমে ক্রমে, যে তড়িৎ পড়াশুনোয় যতোটা দড় তার চাইতে অনেক বেশি বড় পাড়ার কাজে, অনুষ্ঠানের মাতব্বরিতে আর দল বেঁধে টহল দিতে। ওর এই দাদা-দাদা ভাবটা শিবানীকে বেশ অনেকটাই আকর্ষণ করতো, ওর প্রতি একটা সমীহ একটা শ্রদ্ধা তৈরি করেছিল। নিজে শিবানী বেশ ভীরু, নির্ভরশীল, পরাধীন-চিন্তার মেরুতে বাঁধা। অথচ কৈশোরের রক্তচাপ যে মাঝে মাঝে বোধ করতো না তা তো নয়! কিন্তু স্বাধীন চেতনা, অনুভব আর চাহিদাকে প্রকাশ করতে ভয় পেতো। আর এগুলোই ছিল তড়িতের কাছে জলভাত। অনেক পরে জেনেছে যে সাহা'রা সাধারণত অর্থের, ব্যবসায়ের এবং সম্পদের পূজারীই হয়। তাই তড়িতের ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আড্ডা প্রবণতাকে ও স্বাভাবিকই মনে করেছে।

এদিকে ইলেকট্রিক ইন্‌জিনিয়ার পিতার এবং স্কুলশিক্ষয়িত্রী মাতার কন্যা শিবানীরা ব্রাহ্মণের জীবন, শিক্ষাদীক্ষার পথ এবং কৃষ্টির পরিবেশকেই প্রধান বলে মনে করে। দেবী সরস্বতী ওদের সকলের আরাধ্যা।

প্রথম প্রথম স্কুল যাবার পথে একটা দুটো একথা-সেকথা, কখনও মায়ের সঙ্গে মার্কেটিং-এর সময় মায়ের কাছে কাছে থাকা, চাঁদা তুলতে এসে একটু বেশিক্ষণ থাকা, বাবাকে অনুরোধ উপরোধ করার সময় শিবানীর সাহায্য চাওয়া, এবং ইত্যাদি টুক-টাক কথা-বার্তা আদান-প্রদান হচ্ছিল অত্যন্ত সহজ ভাবেই। এই সব টুকরো-টুকরো ঘটনার ক্ষেত্রে কখন যে ভাল লাগার, অপেক্ষার, বীজটি উপ্ত হয়েছিল তা শিবানীর অজানা। সে প্রথম টের পেল যখন স্কুলে যাবার সময় তড়িৎকে না দেখতে পেলে একটা শূন্যতা বোধ ঢেউ হয়ে ধাক্কা দিতো। অথবা সারাদিন তড়িৎকে দেখা হয় নি এই সত্য যখন তার উপলব্ধিকে উচ্চকিত করে তুলতো। তখনই ও প্রথম বুঝেছে যে সেই উপ্ত-বীজ এখন কিশলয় হয়ে ওর তরুণ মনের আশা-অপেক্ষার বাতাসে দুলে-দুলে উঠছে। ভাবতে গেলেই ওর চোখ-মুখ লাল হয়ে যেতো। ওর যেন দম বন্ধ হয়ে যেতো। তাহলে কি একেই সবাই ভালবাসা বলে, প্রেম বলে? কাকে জিজ্ঞাসা করবে? ওর মনের মধ্যে আগ্নেয়গিরির উচাটন, ওর অস্তিত্বের মধ্যে মাঝে মাঝেই শিহরণ জাগে। ওর বোবা মন প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না। ও কি চায় তাও যেমন বোঝে না, ওর কি করা উচিত তাও ওর কাছে

পরিষ্কার নয়। একটা অন্ধ বোবা অস্তিত্বের বৃত্তে ও অনবরত ঘুর পাক খেতে খেতে যন্ত্রণায়, অস্বস্তিতে আর কান্নায় ধনুকের মতো 'টেন্স্' হয়ে থাকতে লাগল। কিছুই ভাল লাগে না।

এমন সময় তড়িৎ যখন একদিন বলল যে তার কিছু কথা আছে তখন শিবানীর মনে হয়েছিল বোধহয় তারও অনেক কথা বলার আছে। সেই শুরু কথা বলার। গঙ্গার ধার. স্টেশনেব প্লাটফরমের শেষ প্রান্ত, স্কুলপালিয়ে গঙ্গার ওপাবে ধোবিঘাট এবং সিনেমা হল। দুজনের কথাও শেষ হয় না, দেখাও শেষ হয় না। দুজনে দুজনের অনেক কাছে চলে এলো। প্রেমের উর্ণনাভ শুধু কথাব সুতোই ছাড়ছিল না জীবনের জালও বুনে চলেছিল। যতো কথা ততো জালের জটিলতা, যতো পরিকল্পনা ততোই ভবিষ্যতের স্মৃতি। এ-সব ওদের বোঝার কথা নয়। নদীতে ভাসমান বস্তুটির বোঝার কথা নয় সে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় তার পরিণতি। শিবানী আর তড়িৎ তাই অনুভবের নদীতে ভাসতেই লাগল।

তার আগে ওদের আরও কিছু কথা আপনাদের জানা দরকার। তড়িৎ দু'দুবার চেষ্টা করে যখন বিদ্যালয়ের প্রথম গণ্ডিটা পার হয়ে থেমে গেল তখন কিন্তু শিবানী থেমে গেল না। একাধিক 'সার্টিফিকেট' যখন একই পরীক্ষায় অর্জিত হয় তখন মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশের সদর দরজাটিও বর্জিত হয়। তাই একজনের সামনে কলেজের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, অন্য জনের চলার পথ বেশ সচ্ছল হল তার প্রাপ্তির জোরেই। তড়িৎ কম্পার্টমেন্টালে আর শিবানী প্রথম বিভাগে পাশ করল। তড়িৎ যে প্রেমের আগুনে পুড়ে গেল তা জোর করে বলা যায় না, বরং বলা যায় যে সম্পন্নতার বেড়াজালে আর লক্ষ্মীর মসৃণ আরাধনায় তড়িৎ তড়িৎবেগেই জীবনকে উপভোগের দিকে ঝুঁকে গেল। পুরোনো দিনে উপন্যাসের নায়ক ঘোড়া পছন্দ করত; তড়িৎ বেছে নিল মোটর সাইকেল। শব্দ করে হাজির হয়, তড়িৎ-বেগে অদৃশ্য হয়। গতি তড়িৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। শিবানী নেশাগ্রস্তের মতো সেই গতিতে গা ভাসিয়ে দিল। না-গাইলেও 'গানে মোর ইন্দ্রধনু' ওদের দ্বিচক্র-গতির পিছনে পিছনে পিছলে পিছলে সরে যেতো। চলছিল ভালই, যেমন চলে। কখনও কলেজের গেট থেকে কখনও ফিরতি পথে হঠাৎ হঠাৎ শিবানী অদৃশ্য হয়ে যায়। যখন বাড়িতে বিলম্বিত উপস্থিতির কৈফিয়ৎ দেবার সময় আসে

তখন হাতের কাছে লাইব্রেরি, বন্ধুর কাছ থেকে 'নোটস্' সংগ্রহ এবং ইত্যাদির মিথ্যা শিবানীকে সংগ্রহ করতে হয় সেই সব উত্তেজনাময় সময়ের গহ্বর গুলোকে ভরাট করতে।

ওদের জীবন এখন আর শ্রীরামপুরের চৌহদ্দিতে একেবারেই আঁটে না। প্রেমেব গভীরতা বাড়ে, ভাল লাগার তীব্রতা বাড়ে আর সেই সঙ্গে গতির এবং পরিসবের প্রসার ঘটে। দুজনের জন্যে দুজনে; একের জন্যে অন্যের সব,— তুমি-নাই-আমি-নাই, তুমি-আছ-আমি-আছি। সেই ক'টি বছর যেন ক'টি মাত্র দিন হয়ে কেটে গেল। তারপর একদিন শিবানী তার 'অনার্স'-এর রেজাল্ট নিয়ে তড়িৎকে জানাতে গেল।

আর সমস্যা দেখা দিল তখনই। তড়িৎ-এর পা শ্রীরামপুরের চৌহদ্দিতে বাঁধা; শিবানী এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অন্য জগৎ অন্য জীবনকে দেখতে পেল। ওদের দু'জনের পথ অনেক আগেই দু'দিকে বেঁকে গেছে। শুধু ওরা টের পায়নি। টের পায় নি কারণ প্রেমের আফিং ওদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে নেশাব প্রভাব রেখে যাচ্ছিল। শিবানীর মা-বাবা পাত্র দেখছেন। মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে এখন উপযুক্ত পাত্র দেখে পাত্রস্থ করতে পারলে কর্তব্য সমাপন হয়। শিবানীর একটি পা অতীতের প্রেমের গভীরে আর অন্যটি উন্মুক্ত স্বাধীন জীবনবোধের বাস্তবতায়। অস্তিত্বের টানাপোড়েন; সিদ্ধান্তের যন্ত্রণা; ঔচিত্যবোধের চেতনার অস্বস্তি। তড়িৎ, অনেক কাছের তড়িৎ, এখন ক্রমশই লং-শটে শিবানীকে দেখে, হারানোর মানসিকতায় উত্তেজিত, অযোগ্যবোধের তাড়নায় দ্বিধাগ্রস্ত, দূরত্ববোধের নিঃসঙ্গতায় মথিত।

এই দ্বন্দ্ব অনিবার্য। শিবানী নীতিবোধের দায় এড়াতে পারেনা, অতীতের স্মৃতিকে অস্বীকার করতে পারে না। তড়িৎ দূরত্বের ব্যবধানে পীড়িত বোধ করে, হারানোর সম্ভাবনায় অধৈর্য হয়ে পড়ে। ওরা তাই এখন মাঝে মাঝে যখন কাছে আসে তখনও নিকট হতে পারে না। শিবানীর চেতনায় যে ভবিষ্যৎ এখন ছবি আঁকে তার সঙ্গে তড়িতের জীবনের যোগ নেই; তড়িতের চেতনায় যে বর্তমান ঘুর পাক খায় তার সঙ্গে শিবানী একেবারেই মেলে না। সমাজ-সভ্যতা-পরিবারের বিরাট ব্যাপক বৃক্ষের একেবারে নিচুতলায় দাঁড়িয়ে তড়িৎ প্রায় আকাশতুল্য উচ্চতায় শিবানীকে

টেনে নামাতে চায় কাণ্ডের একেবারে কাছাকাছি, শিকড়ের সান্নিধ্যে। শিবানী ক্ষত বিক্ষত হয় অতীতের শরাঘাতে, বাস্তবের কষাঘাতে আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার অস্বস্তিতে। তড়িৎ ওকে সেই অতীতের দড়িতেই বেঁধে রাখতে চায়, ওর চেতনায় সুন্দরকে মুষ্টি-লব্ধ করে ভোগ করতে চায় এবং ওর অপরিশীলিত ভাবনার কাছে কোনও পথকেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্যে অযোগ্য বলে মনে হয় না। তাই শিবানীর মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সঙ্গে ভয়ের সংযোজন ঘটে। ও ভয় পায় এখন তড়িৎকে! প্রেম এখন ওর কাছে প্রাণান্তকর হয়ে দেখা দিয়।

ক্ষতবিক্ষত শিবানী তাই এই রকম মনের অবস্থা নিয়েই আমার কাছে এসেছিল। বিরাট একটা ক্লাস-রুমের শূন্য গহ্বরে আমরা দুজনে এক-একা বসেছিলাম অনেকক্ষণ। শিবানী সবেমাত্র ওর যন্ত্রণা-কাতর মনের বেদনা বোধগুলোকে আমার সামনে তুলে ধরেছে। ওর জন্যে আমি বেশ কাতর বোধ করছি। ঘরে অপরাহ্নের শেষ আলোটুকুও মুছে গেছে। সেই প্রায়ান্ধকার নির্জন কক্ষের থমকে থাকা বাতাসে শিবানীর প্রশ্ন আমাকে কণ্টকাকীর্ণ করেছিল : আমি এখন কি করব বলে দে।

আমি দর্শনের ছাত্রী কিন্তু দর্শন কমই বুঝি। জীবনের অভিজ্ঞতার সম্ভার আমার বেশ পুষ্ট বলেই আমার গর্ব। কিন্তু আমি শিবানীর সমস্যাকে কি বুঝে উঠতে পারব? ওকে আমি কি উপদেশ দিতে পারি? মনোবিজ্ঞান আমার বিশেষ বিষয়। সেখানেও তো দেবার মতো কোনও উত্তর অধীত বিদ্যায় খুঁজে পেলাম না। তাহলে? বন্ধুর কাছে যখন শিবানী সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তখন তাকে ফিরিয়ে দেবো কি করে? তাই সাধারণ অনুভব দিয়েই ওকে পথ দেখাতে সচেষ্ট হলাম।

যা কিছু চকচক করে তাই তো আর সোনা নয়। ভাল করে দেখে নিতে হয় বস্তুটি আসলে সোনা কিনা। তাই প্রথম প্রশ্নই হল ঃ প্রেম কিনা। যে প্রেম ভালবাসা হয়ে দুটি জীবনকে নিকট করে আর যে প্রেম 'বন্ধন' হয়ে রজ্জু মনে হয় তা এক রকমের ব্যাপার নয়। প্রেমের সত্য শুনেছি তার ত্যাগে। প্রেম ত্যাগ করতে পাবে এবং পারায়, ভালবাসার প্রাণ নাকি সহ্য করায় এবং সহ্য করে। সাহিত্যে দেখেছি প্রেমভালবাসা ব্যক্তিকে নম্র করে, বিনীত করে, সুন্দর করে। যদি সাহিত্য উপন্যাস সত্যি হয় তাহলে তড়িতের এই ধরে রাখার

চেষ্টা, বেঁধে ফেলার আগ্রহ এবং পথরোধের হুমকি—এ-সবই তো অপ্রেমের ইঙ্গিত। আর যদি বাস্তব জীবনের কথা বলি তাহলেও তো মনে হয় তোমরা এখন যেমন দুই আছ বিবাহোত্তর জীবনে তার চাইতে বেশি দূরের হয়ে যাবে। মনের মিল হবে না হিসেবের ভুলে। তড়িৎ ব্যবসায়ী, বাস্তব বোধের তাড়নায় মেয়েদের সে অধীনস্ত প্রজাবোধে সম্পদের তালিকায় স্থান দেবে। তোমার দর্শন-কবিতা-ইতিহাস পড়া মনের নাগাল সে কখনই পাবে না। তোমার গানের জগতে সে থাকবে চিরদিনের হরিজন। জীবন তোমাদের দ্বৈত না হয়ে দৈত্য হয়ে গিলে ফেলবে।

এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলে ফেলেছি। শিবানী চুপ করে একমনে শুনেছে। কথাগুলো কি তাহলে ঠিক বলেছি? আমার মধ্যে কি কেউ ভর করেছে? একটু দ্বিধা একটু ভয়; তা কাটিয়ে উঠে আবার বলতে শুরু করলাম।

আমি যতদূর জানি বা বুঝি তাতে প্রেম কখনও ভয় দেখাবে না, কখনও অধৈর্য হবে না। তাছাড়া প্রেম তো সূর্যের মতো আলো দেবে, পথ দেখাবে, নিঃশঙ্ক করবে! যে ভয় দেখায় সে আর যা কিছুই হোক প্রেমিক নয়। এবং যে ভয় পায় সেও প্রেমিকা নয়। এ-সব ক্ষেত্রে যা থাকে তা একটা সুবিধার সহাবস্থান মাত্র। একটা জৈব-আকর্ষণের দীর্ঘ-প্রলম্ব দেহের উপর প্রেম চাদরের ঢাকনা, আবরণ।

বলতে বলতে নিজেই বেশ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলাম সেদিন। আর ভাবছিলাম—আহারে! কেমন জ্ঞান দিচ্ছি, দিতে পারছি। মা-বাবা যদি জানতে পারতেন আমি কেমন বুড়োটে পণ্ডিতি করতে পারি, কতো জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিতে পারি তাহলে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যেতো। তাঁরা তো আমি বড় হয়েছি বলেই মনে করেন না! আর আপনাদের কথা? সেতো পরে শুনবোই। আপনাদের মতামতের জন্যেই তো এতো বিস্তারিত করে সব বলে নিচ্ছি।

তাই আরও কথা আপনা থেকেই যেন এসে গেল। শিবানীকে বললাম: ছোট বেলায় পড়েছিলাম যে অসম মিলন ক্ষীণবলের পক্ষে সর্বদাই দুর্ভাগ্যজনক, কথাটা বেশ মনে পড়ে। তোদের দুজনের মধ্যে একটা অসমতা আছেই। শিক্ষা, সংস্কার, পারিবারিক দৃষ্টি, অনুভব এবং সামাজিক মূল্যায়নে তুই

উচ্চ পর্বের। তাই অসুবিধা তড়িতের। আবার পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে পুরুষ প্রাধান্য অনড় চেপে বসবে বলে তোর জীবন পর্যুদস্ত হবে। এ-মিলনে সুতরাং যোগের কোনও চিহ্নই নেই, থাকবে কেবল বিয়োগের বিয়োগান্ত ফলাফল।

আর যদি নীতি বোধের কথা বলিস তা হলেও সেই একই সিদ্ধান্ত হবে। নীতি বলতে প্রধানত তুই বিবেকের কথাই বলতে চাস। বিবেক কোনও অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবেকটিও তৈরি হয়, পরিবর্তিত হয়। তাই তরুণের চোখে মনের যে ঢেউগুলো তাজা প্রাণময় অমর বলে মনে হয় তারাই যৌবনের জ্বালায় পাল্টে যায়, বার্ধক্যের নামাবলীতে রূপান্তরিত হয়ে প্রায় চেনাই যায় না। আর ইতিহাস? সব ইতিহাসই তো অতীত। ইতিহাসের জমিতেই তো বর্তমানের ফসল ফলে। ইতিহাস তাই মিথ্যা নয়, হারিয়ে যাওয়া বর্তমানগুলোর procession মাত্র। হায় হায় করলে অতীত কখনও বর্তমানে এসে হাজিরা দেয় না, বরং সেই করতে গিয়ে বর্তমানটুকুই মার খায় আর ভবিষ্যৎ অভিসম্পাৎ দেয়।

আমাকে সেদিন বলায় পেয়েছিল। আত্মবিশ্বাস আরও আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছিল। কিন্তু সময় বড়ো নির্দয় প্রহরী। কাউকেই ছেড়ে কথা বলে না। দুজনের একান্তে বসে এই যে দীর্ঘ প্রেম-পর্ব-বিশ্লেষণ তা বাড়িতে গেলে বিলম্বের দায়ে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সেদিন সেখানেই ইতি টেনে ঘর মুখো হতে হল।

সেই একদিনই সব দিন ছিল না। আরও অনেকদিনই সেই দিনটিকে অনুসরণ করেছে। শিবানী প্রশ্ন তুলেছে আমি উত্তর দিয়েছি। অনেক কূট তর্ক, অনেক বিচার-বিশ্লেষণ তার পরেও করতে হয়েছে। কিন্তু এটা বুঝেছিলাম যে শিবানীকে ওষুধে ধরেছে। 'অপারেশন সাক্সেসফুল' দেখে আমার ইগোতে যে কি ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছিল তা আপনাদের আর বলে কি বোঝাবো! তাছাড়া আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম যে শিবানী-তড়িৎ অসম জুড়ি, অন্যায় সিদ্ধান্ত, অনভিপ্রেত সংযোগ। সেখানেই আমার Courage of Conviction ছিল।

এবং যা হবার তাই হল। শিবানী ফিরে এলো। বাবা-মায়ের অতিশয়

বাধ্য হয়ে গেল। এবং সত্বরই এক ফাল্গুনে ওর বিয়ের ফুলটি ফুটল। পাত্র ইন্‌জিনিয়র, ভাল চাকরি করে, সমৃদ্ধ বনেদি পরিবার। পাত্রের পিতা বিজ্ঞাপন দেখেই যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল শিবানীর বাবা আর পার্থর বাবা একই শ্রেণীতে একই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেই বন্ধুত্ব কলেজ হয়ে ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল। ছাড়াছাড়ি হল শিক্ষান্তে, চাকুরি জীবনের শুরুতে। সেই যে ছাড়াছাড়ি তা পুত্র-কন্যার বিবাহসূত্রে, আবার বহুদিন বাদে এক জায়গায় এসে মিলে গেল মেয়ে দেখার সময়ে শিবানীদের বৈঠকখানায়, প্রথম দর্শনে, প্রথম পরিচয়েই। তাই নির্বিঘ্নে তরতর করে ছাঁদনাতলা এগিয়ে এলো, এবং একদিন তড়িৎকে পাড়ার বিদায়ী রাস্তার মোড়ে অনড় দাঁড় করিয়ে রেখে হুস করে, শঙ্খের ধ্বনির আড়ালে আর ফুলের মালার মোড়কে শিবানী ছিটকে বেরিয়ে গেল।

শিবানী চলে গেল। তড়িৎ পিছনে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল। বিয়ের দিন সারা দিন এবং সমস্ত রাত আমি শিবানীর কাছে ছিলাম। পাশে পাশেই ছিলাম। ওর বিয়ের সানাই-এর সুর মাঝে মাঝেই ওকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল। তড়িৎ যদি কোনও বিঘ্ন ঘটায়? যদি কোনও অমঙ্গল ফাটল ধরিয়ে দেয়, ওদের জীবনের মিলন ভিতে? সচকিত শিবানীকে তাই কাছে থেকে, পাশে থেকে, সান্ত্বনা আর শক্তি যুগিয়ে গেছি সেই শুভদিনে, শুভমিলনে।

শিবানী পার্থকে পেয়ে অতীতকে ভুলতে চাইল। অতীতের ছায়াকে সে তার বর্তমানের খেলাঘরে প্রবেশের সুযোগ দিতে চায় না। দৃঢ় করে বর্তমানকে সে অঞ্জলি ভরে নিজের করে নিতে চায়। সে চায় যে তার বর্তমানই ভবিষ্যতের সত্যকে সৃষ্টি করে নিক। তাই শিবানীর চিঠি লেখার সময় নেই কারণ পার্থকে নিয়ে তার হাত জোড়া, সময় কৃপণ, মন আবিষ্ট। অতীতকে ভুলতে গিয়ে সে আমাদেরও অতীত করে দিল। হয়তো বা একটু আধটু কষ্ট পেয়েছি, ভেবে দুঃখ পেয়েছি যে সেই শিবানী আমাকে ভুলে গেল। আবার সান্ত্বনাও দিয়েছি নিজেকে; বোধহয় এমনিই হয়, এমনটিই হবার কথা। পরিবর্তনই তো নিয়ম; হারিয়ে যাওয়াটা আছে বলেই তো নোতুনের পাওয়াটা বেশি জোরালো হয়। তাই ওকে ক্ষমাও করে দিয়েছি।

'হে অতীত কথা কও'—না বললেও অতীত কথা বলতে পারে। কোনও প্রার্থনা, কোনও প্রয়োজন ছাড়াই অতীত তার হাজিরা দিতে পারে। এই পারে বলেই তো আজ আমার সমস্যা। আসলে সমস্যাটা আমারও নয়। শিবানীর সমস্যা। শিবানী আমাকে ধরে টান মারছে। আর আমি আপনাদের সকলের কাছেই হাজির হচ্ছি সমাধানের আশায়। শিবানী যেমন আমার উপর বিশ্বাস করেই আমাকে জানিয়েছে, আমিও আপনাদের উপর বিশ্বাস করেই আপনাদের জানাচ্ছি। আমি জানি আমি বঞ্চিত হব না।

প্রথম প্রথম নাকি তড়িৎ শিবানীকে ভয় দেখিয়েছে। দ্বিরাগমনের সময়ের ঘটনা। ভয় দেখিয়েছে যে পার্থকে সব বলে দেবে, জানিয়ে দেবে, গোপন প্রেম পত্র পাঠিয়ে দেবে। শিবানী মনে মনে ভয় পেয়েছে, অনুরোধ করেছে তড়িৎকে সব ভুলে যেতে। আর ভেবেছে যে তড়িৎ এতোদিন এতো কাছে ছিল, সে কি কখনও তার 'বাণী'র ক্ষতি করতে চাইবে? শিবানী বিশ্বাস করেছে যে তার 'রীত্' কখনও এতো কঠোর, এতো ছোট হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত যাবার আগে বলে গেছে 'রীত্ প্লীজ, নোতুন করে জীবনটাকে খুঁজে নাও। আমাকে ভুল বুঝোনা, প্লীজ!' এই এতো প্লীজ-এর বর্ষণে, শিবানী মনে করেছিল, তড়িৎ শান্ত হবে, ক্ষতি করার বাসনা ত্যাগ করবে। কিন্তু তা হয় নি।

প্রথম যেদিন চিঠি খুলেই তড়িতের গোটাগোটা হস্তাক্ষর দেখতে পেল সেদিন সেই কৃষ্ণনগরে বসে শিবানীর মনের মধ্যে ভূমিকম্প হয়ে গেল। তাহলে তড়িৎ থামবে না! তড়িৎ তার ক্ষতি করবেই। একা ঘরে শিবানী আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে কোনও কূল কিনারা পায় না। এই প্রথম দিনের চিঠিটিই যদি অন্যকারো হাতে পড়তো? হয়তো কেউই খুলে দেখবে না, কিন্তু কার চিঠি, কে দিয়েছে, কি লিখেছে?—এ-সব প্রশ্নতো অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সামনে এসে পড়বে। কি করবে শিবানী, কি বলবে? আর, একবার যখন ঠিকানা সংগ্রহ করে চিঠি দিয়েছেই তখন আরও চিঠি তো সময়ের ব্যাপার মাত্র! শিবানীর কান্না পেতে লাগল। শিবানীর মনে হল যেন ওর দম আটকে যাচ্ছে। সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা ওর সকল জাগ্রত মুহূর্তের মধ্যে একটা অস্বস্তি, একটা ভয়, একটা যন্ত্রণাকে inject করে দিল। অতীত নয়, অতীতের একটা কঙ্কাল যেন ওর চোখের সামনে তার ভয়াবহ ভৌতিক চেহারাটাকে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ওর

দিনের আনন্দ আর রাতের শান্তি কোথায় যেন উবে গেল। শিবানী কি পাগল হয়ে যাবে? শিবানী কি সকলের কাছে ধরা পড়ে যাবে? শিবানীর অবশিষ্ট জীবন কি তড়িৎ-স্পৃষ্ট হয়ে গ্লানিময় অসহায়তার গর্তে ডুবে যাবে?

শিবানী মাত্র ছ'টি মাস পেল অনাবিল আনন্দের অনুভবে। ও ধীরে ধীরে কিন্তু নিপুণ করেই ওদের দ্বৈত জীবনের ধারাটিকে ঘন বুনোটে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। সাফল্য বিষয়ে ও সুনিশ্চিত। পার্থর মতো ছেলে হয় না। পার্থ ছাড়া যে শিবানী কেমন করে এতোগুলো বছর বেঁচে ছিল, এখন এটাই ওর কাছে আশ্চর্যের বলে মনে হয়। পার্থর মনে হয়েছে যে আরও আগে কেন শিবানীর সঙ্গে তার পরিচয় হল না। এই ছ'টি মাসের স্বল্প পরিসরেই ওরা দুজনে দুজনকে ঘিরে আপন মনের মাধুরী দিয়ে পরস্পরকে নোতুন করে সৃজন করে ফেলেছে। সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছিল। কিন্তু ছন্দ-পতন ঘটাল অতীত!

শিবানীর মানসিক ভারসাম্য এখন দোদুল্যমান। এরকম অবস্থায় সে তড়িতের দ্বিতীয় চিঠিটি পেল। পত্র প্রাপ্তি নয়, পত্রাঘাত। শিবানীর দমবন্ধ হয়ে এলো। ওকি পার্থকে বলবে? ওকি বলবে না? ওকি সত্য প্রকাশ করে নিজের যন্ত্রণা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবে? সে কি এখন আর সম্ভব? ওকি সত্যগোপনের দায়ে অভিযুক্ত হবে না? পার্থ কি ওকে ক্ষমা করবে? তড়িৎ কি চায় তা বলে না; কি চায় তড়িৎ? ধ্বংসেই কি তার আনন্দ? এ তড়িতের কি খেলা? একি তাকে ভয় দেখানো? এ মতো হাজার প্রশ্ন করে শিবানী আমার কাছে চিঠি লিখেছে। আমার উত্তরেই তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। শিবানী আগ্নেয়গিরির শীর্ষে বসে আছে। ওর বাঁচার পথ দেখানোর কাতর প্রার্থনা জানিয়ে ও আমার কাছে আকুল কামনা জানিয়েছে।

এখন আপনারাই বলুন আমার কি করণীয়। আমি অবশ্য ইত্যবসরে শিবানীকে একটা চিঠি দিয়েছি। শান্ত থাকতে বলেছি। বিপদে ধৈর্যহীন হওয়াটা যে পরাজয়কে ত্বরান্বিত করা, সর্বনাশকে দ্রুতগতি কাছে ডেকে আনা, সে কথা ওকে বুঝিয়ে লিখেছি। অনেক আশা, অনেক ভরসা দিয়ে আমার পরবর্তী পরামর্শের জন্যে অপেক্ষা করতে বলেছি। বলেছি যতো অসম্ভবই

হোক না কেন স্বাভাবিক থাকতে সর্বপ্রযত্ন করতে। এবং আর একটা কাজও করেছি। তড়িতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। শিবানীকে আমি বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি তার সমস্যা, যন্ত্রণা কষ্টকেও। সে সবের কারণ অনুসন্ধান করে, তার জন্যে কে দায়ী, কতোটা দায়ী, সেই সব তথ্য সংগ্রহে আর তত্ত্ব বিচারে বিন্দুমাত্র উপশম নেই শিবানীর বর্তমানের যন্ত্রণার, বিন্দুমাত্র সুরাহা হবে না তার কল্পনার ভবিষ্যতের আর আকাঙ্ক্ষার সংসারের। কিন্তু বুঝি না তড়িৎকে। বুঝি না তার কারণ তাকে তো বরাবরই দেখেছি শিবানীব চোখে, শিবানীর বর্ণনায় আর উপস্থাপনায়। সেই তড়িতের কতোটা তড়িৎ নিজে আর কতোটা শিবানীর সৃষ্টি সে তথ্যও আমার অজানা। ভাইরাসের প্রকৃতি এবং চরিত্র, কার্যক্রম এবং প্রক্রিয়া না জানলে কোনও চিকিৎসকের পক্ষেই প্রতিবিধান সম্ভব নয়। তাই তড়িৎকে জানাটা আমার প্রাথমিক কর্তব্য নয় কি? এখন সে কি চায়, কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে সে 'পরস্ত্রী'র ঠিকানায় প্রেম-ইতিহাসের মৃত আত্মাকে উপস্থাপিত করছে, এরকম বহু 'কেন'র উত্তর না পেলে শিবানীকে আমি কি বলব? কোন উপদেশ দেবো?

অবশ্য আপনারা বলতে পারেন যে একটি মেয়ে হয়ে এতো বড়ো ঝুঁকি আমার নেওয়া ঠিক হয়নি। তড়িৎ আসলে ভাল ছেলে নয়। তড়িৎ চায় ব্ল্যাকমেল করতে। এর মধ্যে এতো ভাবনার কি আছে? অনুসন্ধানের কি আছে? জলের মতো সহজ কথা। তড়িৎ আমাকেও হেনস্থা করতে পারে যখন জানবে যে আমি শিবানীর ঘনিষ্ঠতমা বান্ধবী।

আমার কিন্তু তেমন মনে হয় নি। কোনও ব্যক্তিই, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, কখনই শুধু খারাপ বা শুধু ভাল হতে পারে না। এই বিশ্বে যেমন কারণ ছাড়া কোনও কার্য সম্ভব নয়, আমার বিশ্বাস, মানুষের অন্তর-বিশ্বেও তেমনি কিছু ভালর উপস্থিতি না থাকলে কিছু মন্দ থাকতে পারে না। শিবানী আমার বন্ধু বলেই তো একথা বলতে পারব না যে সে তড়িতের সঙ্গে যা করেছে তার সবটুকুই ভাল, সবটুকুর জন্যেই তড়িতকেই মূল্য দিতে হবে। প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই যদি ব্যাখ্যা খুঁজতে হয় তাহলে তড়িৎ কেন সেই benefit পাবে না? প্রকৃতি তো আর মেয়েদের ঘরের বা আঁচলের পোষা প্রাণীটি নয়; মেয়েরাও নয় প্রকৃতির রাজ্যের একচ্ছত্র

অধিকারিণী। তাই তড়িতকে না জেনে যেমন তার বিষয়ে ভাবতেও অসুবিধা বোধ করছিলাম, তড়িতের সঙ্গে কথা না বলে তেমনি আমি শিবানীকে দেবার মতো কোনও নির্দেশপত্র তৈরি করতে পারছিলাম না।

এবং সেই জন্যেই আজ সকালেই তড়িতের সঙ্গে ঘণ্টাধিক সময়ের আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। অনেক কথা হল। বেশ ভালই লাগল তড়িতকে। ব্যথা না পেলে নাকি আনন্দের উপলব্ধির সত্যতা, তীব্রতা, এবং সৌন্দর্য ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। তড়িতের বক্তব্যকে আমি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি। ও বলে, শিবানীর জীবনে বেদনা নেই, যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা নেই, ব্যর্থতা কাকে বলে ও জানে না। ওর সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। শিবানী ওকে ছেড়ে যাবার সময়ে তড়িৎ অবশ্যই ব্যথা পেয়েছে। অপূরণীয় ক্ষত তৈরি হয়েছে ওর মনে; সবই ও সময়ে সামলে উঠেছে। বাস্তবতা ওর জীবনের মূল মন্ত্র। তাই শিবানীকে ও বাস্তবতার দৃষ্টিতেই দোষারোপ করেনি। শিবানীর একটাই অভাব ছিল। জীবন যে শুধুমাত্র ফুলের বিছানা নয়, কণ্টকেরও যে স্থান আছে, আনন্দই একমাত্র মানসিক অবস্থা নয় পাশাপাশি দুঃখের জায়গা আছে, সুখের পাশে দুঃখ আছে, উচ্চাশার পাশে আশঙ্কা—এ-সব শিবানীর অজানা। তাই তড়িৎ অনেক ভেবে শিবানীকে 'টিকা' দিতে, ভবিষ্যতেব আঘাতের বিরুদ্ধে বর্তমানের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে বেদনার, ভয়ের আর যন্ত্রণার ইনজেকশন, ভ্যাকসিন, দিতে চেয়েছে।

না, শিবানীকে ব্ল্যাকমেল করার কোনও সুদূরতম বাসনাও তড়িতের নেই। শিবানীকে ও ভালই বেসেছিল। এবং ও জানতো যে নিজে সে এক সময়ে শিবানীর জন্যে অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রেম কল্পনার জগতে অমর হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু বাস্তবের জগতে, কঠোর জীবন গুরুর পাঠশালায়, অসমের মিলনে যতো যন্ত্রণার মন্থন হয় ততো সুখের আবির্ভাব ঘটে না, যতো বিষের যোগান সত্য হয়ে দেখা দেয় ততো মধু আহরিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপান্তে পৌঁছোনো শিবানীকে তড়িৎ আর চিনতে পারছিল না।

ও আরও বলেছিল যদি চিঠি দেওয়া অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে তড়িতের হয়ে আমি যেন শিবানীর ক্ষমা চেয়ে নেই। আর শিবানীকে যেন আমি আশ্বস্ত করি যে তড়িৎ তার কোনও ক্ষতি করবে না। শিবানী যে একদিন,

কিছুদিন, তড়িৎ-কে সত্যিই ভালবেসেছিল সেই ভালবাসার স্মৃতি নিয়ে তড়িৎ তার জীবনের সংসার অনায়াসেই চালিয়ে নিতে পারবে। টাকা-আনা-পয়সার জগতের বাইরে যেটুকু অপ্রয়োজনীয় নৈকট্য শিবানী ওকে দিয়েছিল সেটুকুকে কৃপণের মতো মনের গভীরে সঞ্চয় করেই রাখবে। কোনও অনুশোচনা, ক্ষোভ, বঞ্চনা বোধ ছাড়াই তড়িৎ সংসারের খড়-কুটোর সময় কাটাতে পারবে। শিবানী যেন সুখী হয়।

মনের ভার সম্পূর্ণ কেটে গেল। সন্দেহ নিশ্চিহ্ন। হাল্কামন নিয়ে ফিরে এলাম। এবং ভাবলাম আপনাদের জানিয়ে দেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তড়িৎই সমাধান করে দিয়েছে। এই বলে কলম বন্ধ করে 'সমাপ্ত' বলে যেই শেষ লাইনটি টানতে যাব অমনি মনের কোণে একটা খোঁচা অনুভব করলাম। আচ্ছা, সব তো হল, তড়িতের কোনও যন্ত্রণা, মর্মবেদনা আছে কিনা তা তো ওকে জিজ্ঞাসা করা হল না!

যদি আপনাদের কারো সঙ্গে তড়িতের কখনও দেখা হয় তাহলে আমার হয়ে অন্তত এই কথাটা জেনে নেবেন, প্লীজ।

———

।। শহিদ ।।

মাধব নামটার জন্যে নিশ্চয়ই নয়, ছেলেটি ছোটবেলা থেকেই একটু উড়নচণ্ডী গোছের। ওর বাবাকে চিনি। খুবই ঢ্যাঙা, সরু লিকলিকে চেহারা। আমরা যখন এখানে প্রথম আসি তখন বহু বিরুদ্ধতার মধ্যেই পড়েছিলাম, এপার-ওপার ব্যাপারটা বেশ তীব্রই ছিল তখন। একেবারেই যারা কাছের বাসিন্দা ছিল তাদের তাপটাই বেশি করে গায়ে লাগছে তখন। নোতুন পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগছে। পুরোনো বাড়ি ভেঙ্গে নোতুন করে বিন্যস্ত করছি। নানান জায়গায় কাঁটা ফুটছে, নানান তন্ত্রীতে টান পড়ছে। আমরা দূর-দূর ছড়িয়ে একঘর দু'ঘর এপারের স্থানু সমাজে, সাগরে দ্বীপের মতো টিমটিম করছি। এমন সময়ে দাস মশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হল। পরিচয় স্বার্থের কারণে। তিনিও বাড়ি মেরামত করছেন। আমাদের দক্ষিণ দিকের বেড়াটার জন্যে তাঁর গরুর গাড়ি পার হতে পারছে না। আমাদের বাড়ি পর্যন্ত গরুর গাড়ির পথ ছিল না ; অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই পথ সম্ভব করে এখন আমরা গাড়ি আনছি। সেই সুযোগটা দাসমশাইও পেতে পারেন যদি আমাদের দক্ষিণের বেড়াটা কিছু দিনের জন্যে খুলে দেওয়া যায়। তখন মানবিকতার চাইতে সুহৃদ অর্জনের প্রয়োজন আমাদের কাছে অনেক বেশি দরকারী। কাউকে সাহায্য করলে, উপকার করলে, বিদ্যাসাগরীয় ফলাফল ঘাড়ে চেপে বসার আগে অনেকদিনই, বা অন্ততঃ কিছু দিন, সেই উপকারের কথা স্মরণে থাকার কথা ; তাছাড়া আশেপাশের লোকজন তো সেই সত্য জানবেন। সেটাও তখন এই 'পাণ্ডববর্জিত শত্রুপুরীতে' কম কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই সাহায্য করলাম। এবং ফলস্বরূপ, পার্শ্ববর্তী পাড়ার হলেও, কিছুদিনের জন্যে একটা 'কেমন আছেন, কোথায় যাচ্ছেন, ভাল তো'—গোছের সামাজিক মেলামেশার বাতাবরণ তৈরি হল।

এর পরে, যতদিন তাঁর বাড়ির কাজ চলল, ততদিন, তিনি মিনিটের পর মিনিট আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, 'একদিন সময় করে দেখে আসবেন' বলেছেন, এবং গাড়িটি চলে গেলে 'আবার পরে কথা

হবে' বলে মালবাহী সেই গাড়ির সঙ্গেই চলে গেছেন। আমার লাভ এই যে ওপারের ব্রাত্যজন হয়েও আমি এপারের সম্মানিত জনেদের সঙ্গে মেলামেশার, কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিষয় পেয়েছিলাম কথা বলার মতো; রাস্তাঘাটের উন্নতি, বিভিন্ন গ্রামীন প্রয়োজন বিষয়ে করণীয় ইত্যাদি। সেই সুবাদে দাস মশাই এবং তাঁর সঙ্গীরা আমাদেব বাড়িব জমিতে, গাছেব নিচে দাঁড়িয়ে সময় কাটিয়েছেন, আমিও ওদেব বাড়িব সামনে গেছি, কাজ দেখেছি এবং পরিচিত হয়েছি ওদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে। রাস্তা থেকে শুরু করে দেশ বিভাগ, জীবন সংগ্রাম, রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

দাস মশাই কোনও একটা কারখানায় যন্ত্রঘরে কাজ করেন। স্ত্রী এবং এক পুত্র, মাধব। ওঁর স্ত্রীকে আমি দেখিনি, অনেকদিন পর্যন্তই দেখিনি। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি পর্দানশিন মহিলা হবেন। জায়া, মাতা, গৃহিনী। মাধবকে দেখেছি। পনেরো ষোল বছরের অকারণেই অনেকটা সরু দীর্ঘ দেহ। যেন একটু ঝুঁকে পড়ার দিকেই ঝোঁক আছে দেহের। বেশ চ্যাংড়া প্রকৃতির। ছটফটে। স্কুল তখন প্রায় ছিলই না; যাও ছিল তার প্রতি মাধবের বেশ আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয় নি। রাস্তায়, আড্ডায় আর সকাল-বিকেল দুবার ঝিলের জলের আকর্ষণ ছিল অসীম।

ওপারের আমাদের, বাঙালদের, প্রতি সঞ্চারিত বীতরাগ ছেলে ছোকরাদের মনে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। আমরা বিরক্ত বিব্ধস্ত বোধ করলেও নিঃশব্দ নীরবে সেই সময়ের যন্ত্রণাকে হজম করে চলেছি। বাধ্য হয়েই। মাধব একা নয়; মাধবরা অনেকই ছিল তখন। কলকারখানার জন্যে অপেক্ষারত এই সব ছেলেরা বাল্য-কৈশোর-যৌবন প্রাপ্তির সময়টুকু আহ্নিক-বার্ষিক গতিকে দান করে দিয়ে একদিন কাজে যোগ দিত। আর এই অপেক্ষার সময়টা ভরাট করে ফেলত অন্যের পিছনে লেগে, গাছের ফলসমূহের অকারণ তছনছ করে আর ঝিলের জলকে এবেলা-ওবেলা ঘোলা করে দিয়ে।

এ-সব উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ সালের কথা। প্রায় ইতিহাসের গর্ভে চলে গেছে। স্থান সেই একই আছে, পাল্টে গেছে কাল এবং পাত্র-পাত্রী। স্থানই যে এক আছে তা আর বলা যায় কৈ; ম্যাপে যে স্থান সে হয়তো একই আছে, কিন্তু সামাজিক স্থান, পারিবেশিক স্থান একেবারেই অচেনা মতো পরিবর্তিত হয়ে

গেছে, দশক দশক ধরে। সংখ্যা, শিক্ষা, রাজনৈতিক চেতনা আর অর্থনৈতিক সংস্হানে প্রায় বিস্ফোরক পরিবর্তন সব ঘটে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আগুন, মৃত্যু, গৃহউৎপাটন ; রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর্বেপর্বে দলবদ্ধ দাপাদাপি, কণ্ঠবিদারী চিৎকৃত 'প্রোসেশন,' রক্তচক্ষু আস্ফালন আর মুষ্টিবদ্ধ অনু-ধাবন যেন উন্মুক্ত পাগলাগারদের উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল উন্মাদনায় সমাজ ব্যবস্হার প্রতিটি তন্ত্রীকেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এমনি এক সময়ে রাজনৈতিক দলবাজির শিকার হল মাধব! তাকে তাড়া করে বেড়াল মৃত্যু দীর্ঘক্ষন ; এ-গৃহ থেকে ও-গৃহকোণে, এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির আশ্রয়ে আর অতি পরিচিত অলিগলির কুহকজাল ছিন্ন করে আততায়ীরা ওকে হত্যা করল সেই ঝিলের পাড়েই যে ঝিল ছিল মাধবের উদয়-অস্তের আলিঙ্গন অবগাহন বন্ধু!

মাধব শহিদ হয়ে গেল। মাধবের মৃতদেহ তুলে নিয়ে তাকে কাঁধে করে আনুষ্ঠানিক প্রোসেশন করার মতো লোক ছিল না, লোক যাও বা ছিল তাদের সাহস ছিল না। 'নেতা' বলতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভিজে 'ন্যাতা'-র মতো দূরে কোথায়ও, সকলের অজান্তে, গা ঢাকা দিয়ে 'চাচা, আপন বাঁচা' নীতির বাস্তবায়নে অতিব্যস্ত। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটিই এমনি ; যার যখন দিন আরকি! তখন চলছে প্রতিপক্ষের দিন, তাঁরা দপদপ করে রাস্তা দিয়ে চলেন, বুক চিতিয়ে কথা বলেন আর দুর্বিনীত গ্রীবায় শক্তির তাপ বিচ্ছুরণ করেন। আর এই সেদিন পর্যন্তও যাঁরা দল বেঁধে সারিবদ্ধ প্রোসেশন করে চিৎকৃত স্লোগান ঘোষণা করে শক্তি শব্দ সংখ্যার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তাঁরাই আজ 'কর্পূর' হয়ে উবে গেছেন। মাঝখান থেকে মাধব শহীদ হয়ে গেল।

তখন কিন্তু মাধব অনেক শান্ত, অনেক ধীর আর যেন একটু ভারিক্কি ব্যক্তিত্ব। মিলে চাকরি করে। ঝিলের টানে পাড় পর্যন্ত যায়, জলে ঝাঁপায় না ; সকাল বিকেল আড্ডায় তখন আর মাধব সক্রিয় অংশীদার নয়, ক্কচিৎ কখনোর উপস্হিতি হয়ে থাকে মাত্র। তরুণীদের পিছনে অন্যছেলেরা শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করলে মাধব বেশ বিরক্ত বোধ করে। আর অবশিষ্ট সময় রাজনীতি করে। রাজনীতি করে মানে মিটিং-মিছিল করে।

মাধবের মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঝিলে। তখনও অবশ্য মাধবের মা বলে চিনি না, চিনি না দাস মশাই-এর স্ত্রী বলেও। ঝিলের জলে স্নান

আমাদের নৈমিত্তিক ঘটনা; জলের অভাব। ওদেরও তাই। সকলেরই ঝিল-গত প্রাণ। নান্যপন্থা। একটু উত্তর দিক করে মেয়েরা কাপড় কাচা, স্নান কবা, কলসী ভরা ইত্যাদি কবেন, ছেলেরা একটু দক্ষিণ ঘেঁষে তাঁদের স্নানাদি কাজ সাবেন।

সবে জলে নেমেছি, ঝিল-পাড থেকে ভয় আর শঙ্কা মেশানো কণ্ঠে ভেসে এলো 'সর্বনাশ, আমাব চাবি ? চাবি জলেই পড়ে গেছে বোধহয় !' ভদ্রমহিলার হাহুতাশ। তিনি আবার জলে নেমে পড়লেন এবং পা'এর সাহায্যে চাবি খুঁজতে লাগলেন। 'আমি দেখব খুঁজে ?' প্রশ্ন শুনে এক মুহূর্ত থেমে গেলেন, আমাকে পুরো দৃষ্টি ফেলে দেখলেন। বললেন, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। চাবির গোছাটা আঁচলেই তো বাঁধা ছিল!' কিছু প্রশ্ন কবে, অনুসন্ধানের সম্ভাব্য এলাকা নিশ্চয় কবে কাজে লেগে গেলাম। মিনিট পাঁচেকের চেষ্টায় চাবি ওঁর হাতে তুলে দিতে পারলাম। সেদিন ওঁর চোখে মুখে যে আনন্দ, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেল তা অবিস্মরনীয়। বিকেলের মধ্যেই এই ঘটনা প্রায় সর্বজনবিদিত হয়ে গেল। দু'এক দিনের মধ্যেই বুঝে গেলাম যে স্থানীয় কিশোর তরুণ যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গির বেশ অনুভব যোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে আমার বিষয়ে। গোরুর গাড়ি পার করতে বেড়া সরানোর সম্মতির পিছনে বিষয়-মন কাজ করে ছিল। কিন্তু চাবি অন্বেষণে প্রতিবর্তী ক্রিয়াই প্রধান ছিল। স্বভাবে 'বাঙ্গাল' হলে অবশ্যই আজন্ম জলের হৃদ্যতা ঘটে, আর জল-তলেব কর্দম স্তর মাছ ধরার সুবাদে প্রায় মুখস্ত হয়ে যায়। তাই অনভিজ্ঞের কাছে যা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে বাঙ্গালের কাছে তাই সহজ বলে প্রতীয়মান হয়। এই চাবি প্রসঙ্গ অনেকদিন পরে, যখন মাধবের মায়ের সঙ্গে পরিচয় এবং আলাপ হয তখন বহুজনের কাছে তিনি সগর্বে প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে এবং শব্দে প্রকাশ করেছেন। সে অনেক পরের কথা।

কলকাতা এবং তার আশেপাশে যখন রাজনৈতিক ডামাডোল তুঙ্গে, তখন চলে যেতে হল বাংলাদেশেরই অন্য প্রান্তে, কার্যব্যপদেশে। ডামাডোল বলতে তখন অরাজকতা, নৈরাজ্য আর আত্মহনন চলছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এরা কেউই রাজা উজির নয়; নীতি বলতে এরা হানাহানি আর পরস্পর কামড়াকামড়ি বোঝে। এরা সকলেই মাঠে-অনুপস্থিত নেতাদের অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে উত্তেজিত উদ্বেলিত হাতিয়ার মাত্র হয়েও 'রাজনীতি করছি' বলে আত্মশ্লাঘা বোধ করে।

মাধব সবে মাত্র তার অতীতের চপল-চঞ্চল স্বভাবের খোলস থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনের চিহ্নিত পথে পা রেখেছে। স্রোতের টানে আর দলের প্রভাবে মিটিং মিছিল করছে। সেই সুবাদে প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথাকাটাকাটি, ঝগড়া আর বিরুদ্ধতায় জড়িয়ে গিয়ে থাকবে। এমনি এক অবস্থায় যখন মাধব তার বাড়ির পাশেই দোকান ধারে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজবে জমে আছে তখনই অঘটনের ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ে কোথায়ও সেই ভায়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত মাত্র ছিল না। সবই সেদিন স্বাভাবিক চলছিল। বাইরে থেকে আগত এক দল ছেলে রক্তলোলুপ উত্তেজনা নিয়ে ওদের পাড়ায় ঢুকে পড়ল। হঠাৎই সেই প্রবেশ ঝড়ের রুদ্র মূর্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দোকান পাট ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল। চিৎকারে হট্টগোলে আকাশ বাতাস মথিত হল। যাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্রুত কাজ করল তারা সময় থাকতেই গা ঢাকা দিল। মরণের ডাক যাকে ডাকে সে তো আগুনে ঝাঁপ দেবেই! তাই মাধব 'ব্যাপারটা কি?' জানার কৌতূহলে দু'পা এগিয়েই ফাঁদে পা দিল। ওর কাল হল!

'রক্ত চাই, রাজনৈতিক রক্ত চাই'—বলে যারা ঝড়ের বেগে তেড়ে এলো তারা প্রতিপক্ষহীন ফাঁকা মাঠে তীব্র থেকে তীব্রতর উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিল। হন্তারক হত্যাযোগ্য প্রতিপক্ষ না পেলে অসহ্য যন্ত্রণায় জিঘাংসাকে সীমাহীন করে অনুভব করে। তাই শূন্য ময়দানে মাধবকে সামনে পেয়ে তারা তেড়ে এলো। উত্তোলিত ছোরা নিষ্কোষিত তরবারি আর উদ্যত রিভলভার সামনে দেখে হতচকিত ভয়বিহ্বল মাধব দৌড় দিল। য পলায়তি! কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে!

প্রথম সুযোগেই মাধব গলিতে ঢুকে পড়ল। তারপরেই খিড়কিপথ। সে স্থানীয় ছেলে; 'টেক্সটাইল' শরীরে ওঠার আগে থেকেই সে এলাকার অন্ধি সন্ধি জানে। এবাড়ি ও বাড়ি করে সে একটু লুকোনোর মতো কোণ খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হচ্ছিল। আর বেশি করে অসহায় বোধ করছিল। এ-দিকে আক্রমণকারীরা বাইরের, অপরিচিত এলাকার অলি-গলি বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাই তারা যতটা শব্দ তৈরি করতে আর উত্তেজনা ছড়াতে সক্ষম হল ততটা সফল হতে পারল না। মাধব অনেক সময় পেয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সব পরিচিত বাড়ির সকল লোকেরাই কেমন যেন ভীরু, কেঁচোর মতো ঘোলা চোখ নিয়ে

মাধবকে অন্যত্র সরে যেতে বলল। নিজেদের এবং পরিজনদের প্রাণ ও সুরক্ষার কাছে মাধবের আকুল আবেদন হারিয়ে গেল।

একটা তাড়া খাওয়া ভীত সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো মাধব গৃহ থেকে গৃহান্তরে, রান্নাঘরের আঁচল থেকে বাথরুমের পিছন হয়ে আর ঝোপ ঝাড়ের আড়াল নিয়ে রাজনৈতিক শিকারীদের হাত থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলল। তিন চারটি অস্ত্রধারী আততায়ীর হাত থেকে মাধবকে বাঁচানোর জন্যে প্রায় তিরিশ-চল্লিশটি বাড়ির সমস্ত লোকজন কম পড়ে গেল ? সমাজের মেরুদণ্ড হীনতা ? মাধবের বিধিলিপি ? রাজনীতির অশুভ প্রেতছায়া ? সভ্য সমাজে সন্ধ্যার আবছা আলোয় এই পাশবিক অনু-ধাবন চলেছিল আধ ঘণ্টার উপর। 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন খানে'—শুনে শুনে মাধব তার বধ্য মৃত দেহটাকে বয়ে চলেছিল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। কী দুর্বিসহ আত্মধিক্কার আর আত্মপীড়ন চলেছিল মাধবের তা কল্পনার অতীত। কিন্তু প্রাণটিকে বাঁচানোর সর্বপ্রকারের চেষ্টা না করেই তো আর সেটি ত্যাগ করা যায় না। তাই নিজের জন্মস্থানের মরুতে প্রাণ পিপাসায় আর্ত মাধব ছুটে গেল ঝিলের দিকে। সেখানে আছে প্রকৃতি জল আর জঙ্গল। মাধব হয়তো ভেবেছিল জঙ্গলের গভীরে লুকোনোর মতো একটু ঠাঁই মিলবে; জঙ্গল বোধহয় মানুষের মতো অমানুষ নয়! অথবা, কচুরিপানায় ঢাকা ঝিলের জলে নাক ভাসিয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টাটা অন্ততঃ করা যাবে।

কিছু সময় বাদে মাধবের মনে হয়েছিল যে সে বোধহয় এ-যাত্রা বেঁচে গেল। মানুষের শ্বাপদ ব্যবহারের কোনও ইঙ্গিত সে পাচ্ছিল না; চিৎকার নেই, গর্জন শোনা যাচ্ছিল না, জনপদ মথিত এতক্ষণের পদতাড়নাও অনুপস্থিত। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। নেতাদের কথা, সহকর্মীদের কথা ওর তখন আর মনেই আসছিল না, যদিও তারাই ওকে আজকের এই পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে যাদের নাম ওর স্মরণে আসছিল তাদের মনে করেই মাধব প্রাণ বাঁচানোর প্রার্থনা করে থাকবে। দেবদেবীর প্রতি মাধবের ভক্তি ছিল অনেকটাই চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে; আজ প্রথম তার মনে হল সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে চাঁদা আদায়ের চাইতে পুজোর প্রতি সে বেশি মনোযোগ দেবে। দেবেই দেবে। বুকের ধড়ফরানির সঙ্গে সঙ্গে ওর সময়জ্ঞান এবং দেবতার টান উভয়ই বেড়ে যেতে

থাকল। মশার কামড়, জোঁকের ভয় আর বিছে-সাপের সম্ভাব্য আক্রমণ তখন ওর বোধশক্তির এলাকার অনেক বাইরে।

এদিকে চোখের দৃষ্টিতে আটকে রাখা শিকার ছিটকে গেলে, প্রায় করধৃত খাদ্য ফসকে গেলে যেমন হয় তেমনি তাণ্ডবে লেলিহান ছিল ধাবমান গুণ্ডাদের মন আর মরজি। তাই তারা একে-ওকে ধরে মৃত্যুভয় দিয়ে মাধবের পলায়ন পথ এবং পলায়ন স্থান বিষয়ে জানতে চেষ্টা করছিল। সময় চলে যাচ্ছিল সেই অনুসন্ধানেই। বেশির ভাগ বাড়িতেই পুরুষদের পাওয়া কণ্টকর হয়ে উঠেছিল: 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' করে তারা গা ঢাকা দিয়ে ফেলেছে। ওদের ব্যর্থতা যতই সমূহ হতে লাগল ততই ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল; কণ্ঠে এলো জান্তব নির্ঘোষ, হাতের মুষ্টিতে এলো বজ্রের কাঠিন্য আর চোখের তারায় রক্তের ঝিলিক। ভয় পেয়ে গেল অনেকেই। নিঃশব্দ আঙুল নির্দেশ করল মাধবের পলায়ন পথ। এক প্রান্তে প্রাণ যতই বাঁচতে লাগল অন্য প্রান্তে মাধবের প্রাণ ততই ফাঁসির দড়িতে জড়াতে লাগল! সংগঠনহীন জনগোষ্ঠী তলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল ক'টি মাত্র সংগঠিত গুণ্ডার কাছে!

ওরা যখন অকুস্থলে এসে পৌঁছল তখন মাধব সময় গুণতে শুরু করল! জঙ্গল কোনও গভীর ছিল না। একটু দাপাদাপি করতেই মাধব বেরিয়ে পড়ল! কবিতার লাইন উল্টে গেল: কে আগে প্রাণ দান করার বদলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল নিয়ে নেবার—তিনপ্রকারের অস্ত্র এক সঙ্গেই ব্যবহৃত হল—যার হাতে যা ছিল তাই দিয়েই প্রাণ নেবার প্রতিযোগিতা! এবং নিলও একমুহূর্তে।

মাধব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঝিলের জলে। ঘাতকরা তাদের আনন্দকে নিঃশব্দ করে দৃপ্ত-পদে সেই রাত্রের তরল অন্ধকারে যে যার সরে পড়েছিল। আর মাধবের মৃত দেহটাকে পরের দিন অনেকটা বেলাতে উদ্ধার করা হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে সুহৃদরা কেউই আর বুকে বল সংগ্রহ করে মাধবের দেহ অন্বেষণে ব্রতী হয় নি!

দৃশ্যপটের পরিবর্তন হল; রাজনীতির আখড়ায় রং-বদল হল। গঙ্গায় অনেক পলি জমা হয়ে নাব্যতা হ্রাস পেল। পলাতক রাজনৈতিক কর্মীরা গলা ফুলিয়ে স্টেজের মধ্যমণি হয়ে স্লোগান আর তারস্বরে চিৎকৃত সমাজ-সত্য ঘোষণা করতে ব্যাপৃত হল। যারা জানালায় আর ছাদের অনস্ত্রক্ষেপ

দূরত্বে অবস্থান করে এই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অংশগ্রহণ করে অভ্যস্ত ছিল তারা রাস্তায় নেমে এলো, মিছিলে সামিল হল আর শ্লোগানে গলা মিলিয়ে আকাশ-বাতাস ভারি করে তুলল।

এবং, মাধব, শহিদ বলে ঘোষিত হল। তার নামে এবং তার উদ্দেশে শহিদ বেদী তৈরি হল। তার বাড়িরই কাছে, তেমাথা রাস্তার মোড়ে। এবং তার আত্মোৎসর্গের ভূয়সী প্রশংসা করে ওজস্বিনী ভাষণ দেবার জন্যে নামের তালিকা প্রশস্ত হল! মাধব মৃত্যুর পরেই শুধু বাঁচতে পারল।

আর, মাধবের মা নেতৃত্বে অভিসিক্ত হলেন। শহিদ-প্রসবিনী জননী হাজারে মেলা ভার! স্থানীয় রাজনীতি ঘোষক হিসেবে ব্যবহার করল স্থানীয় নেতাদের আর মাধব হয়ে গেল চিহ্ন, সিম্বল; রাজনীতিতে গতি, শক্তি আর আবেগ বয়ে আনার জন্যে তস্য জননী হলেন, অল্পদিনেই, মহিলা সমিতির প্রাইম-মুভার। যৌবনের জয়গান আর মাতৃত্বের আবাহন রাজনীতির দুধে মিশে গেল; আঁটি হিসেবে দাস মশাই গড়াগড়ি গেলেন লেদ মেসিনের দৈনন্দিন ঘড়ঘড়ানিতে, পুত্রহীন দিনযাপনের গ্লানিতে! প্রতি বছর একটা বিশেষ দিনে শহিদবেদীর মূলে যে জনসমাগম ঘটে তার মধ্যমণি হিসেবে উপস্থিত থাকেন মাধব জননী; বছরের অন্যান্য সময়ে তিনি গৃহকর্মে আর সময় পান না রাজনীতির সচেতনতার বীজ বুনতে, তদারকি করতে; অন্যদিকে বার্ধক্যের নিষ্করুণ দিনগুলো দাস মশাইকে লক্ষ্য করে শনৈঃ শনৈঃ, দারিদ্র্যের ঝুড়িটি মাথায় করে এগিয়ে আসতে থাকে। তাঁর দীর্ঘ দেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়ে আর তার স্ত্রী বিরাট এলাকার দায়-দায়িত্ব বহনে নিজের স্কন্ধটিকে সবল করে তোলেন। গ্রাম সভার সদস্যা, পঞ্চায়েত সদস্যা এবং মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী। অর্জিত নয়, আরোপিত ক্ষমতায় নেশাও যেমন থাকে, ভারও থাকে তেমনি। একদিন সেই নেশার ঘোর কাটতে শুরু করে ঃ ভারটা বড্ডই ভারি বলে মনে হয়। বাইরের জীবনে জনগোষ্ঠীর সান্নিধ্য আর হাততালি মহিলার সব সুপ্ত ক্ষমতাটুকু বাইরে টেনে বার করে ব্যবহার করে। তাই হঠাৎই একদিন নিঃস্বতাকে বড় বেশি নিঃস্ব বলে মনে হয়; ভারটুকুকে যেন অনেক ভারি বলে অনুভূত হয় ঃ

ততদিনে দাস মশাই অশক্ত অকর্মণ্য বার্ধক্যের পীড়নে গৃহ-কোণ-সম্বল; শহিদ-জননীর ঘরে ফেরার সময়। কিন্তু যে গৃহ তাঁর ছিল এবং যে গৃহকে তিনি বার্ধক্যের বারানসী করে তুলতে পারতেন, সেই গৃহ এখন দ্বৈত জীবনে শূন্যতার দৈত্য হয়ে ওঁদের দুজনকেই গিলে খেতে চাইছে! দুজনে দুটি দ্বীপ; নিকটে থেকেও নৈকট্য হারা। সর্বহারার নেত্রী এখন নিজেই সর্বস্বহারা!!

———

॥ পোষা-প্রাণী ॥

বাঘা ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তিরই বোধহয় কোন না কোনও নেশা থাকে। বিশেষ করে ছোটবেলায়। ব্যক্তি না বলে শিশু বা বালক বললেও ভুল হবে না। কারো মা-মা নেশা থাকে। মা ছাড়া জগৎ অন্ধকার। কারো পুতুল, কারো ছবির বই, কারো বা কোনও পোষা প্রাণী। বাঘা ছিল আমার নেশা। বাঘা আমাদের পোষা কুকুর ছিল। কুকুরছানা হিসেবে 'বাঘা' যখন 'কুঁই-কুঁই' করে সারা উঠোন, ঘরের আনাচ-কানাচ দিয়ে সর্বহারার মতো ঘুরে বেড়াতো তখন সে 'বাঘা' তো নয়ই বাঘার ছায়াটাও নয়। অনাদরে যত্র-তত্র বিচরণশীল সেই ছোট্ট প্রাণীটির প্রতি আমার স্বাভাবিক করুণা হয়েছিল। কোথায় যেন মিল দেখেছিলাম। হয়তো আমার মনে হয়েছিল—হায় রে বেচারি! তাই অনেক যত্নে বাঘাকে কোলে করে তুলে এনেছিলাম! গলায় একটা দড়িও বেঁধে দিয়েছিলাম। আর সেই নৈকট্য দেখাতে গিয়েই ব্যাপারটা অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছিল। আমার মা তাঁর সন্তানের স্বভাবচরিত্রে সম্ভাব্য মনুষ্যত্বের অনেক গুণাবলীকে প্রত্যক্ষ করে থাকবেন যা ঐ কুকুর-ছানার জন্যে নষ্ট হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা! পড়াশুনো গোল্লায় যাবে। ঘরে তো এমনিতেই কম থাকে, তার চাইতে কম থাকে পড়ার টেবিলে। এবারে বইপত্রের বদলে একটা জলজ্যান্ত কুকুরছানা পেলে ঘরের আর বাইরের প্রভেদ নাকি একেবারেই ঘুচে যাবে। তাই যখন কয়েক ঘা পিঠে ধারণ করে কুকুরছানাটির নিক্ষেপ-প্রক্রিয়া রোধ করতে আবক্ষ তাকে আশ্রয় দিয়ে চলেছি তখনই খড়মের আওয়াজ কানে এলো। ক্ষীণ একটা আশার আলো চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে গেল। কোলের মধ্যে তখন আমার উষ্ণতায় সেই সারমেয়-শিশু আদরের ঘরঘরানিতে কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যস্ত। 'আহা কর কি কর কি' বলে বাবা যখন মাকে নিরস্ত করলেন তখন আমার দেবদর্শনের ভাগ্য হল। 'দু'একদিন বাদেই ফেলে দেবে, চুকে যাবে।' বাবা মাকে আশ্বস্ত করেছিলেন।

মা সেদিন আশ্বস্ত হয়েছিলেন কিনা জানি না তবে আমি যে সেদিন স্বস্তি পেয়েছিলাম তা সমূহ বুঝেছিলাম। আর আমার কোলের মধ্যে লেপ্টে থাকা সেই সারমেয় সন্তান সম্ভাব্য ঝড়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমার বাহু, গলা এমন কি গালে তার উষ্ণ-জিহ্বা ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে আমাকে আপন করে নিয়েছিল। রাগে গব-গব করে মা বলেছিলেন,—'ঘেন্নাও করেনা!' বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন, সম্ভবত ফেতি কুকুরের প্রতি মানবিক আদরের আধিক্য দেখে। আমি সেটাকে দোল দিতে দিতে তার গৃহ পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

স্বাধীনতা হীন সেই বাল্যেই অত্যন্ত মূল্য দিয়েই পরাধীনতার জ্বালাটি অনুভব করেছিলাম। 'রোটি-কাপড়া-মকান' তো অনেক বড় হয়ে বুঝেছি। কিন্তু সেই প্রথম পিতৃস্নেহ-নিঃসরণের দিনে, সেই সদ্যপ্রাপ্ত এবং সমূহ সুরক্ষিত কুকুর ছানাটির ও তো খাবারের প্রয়োজন ছিল। বিন্দুমাত্র লজ্জা না করেই, অবস্থার বৈপরীত্য অনুধাবন না করেই এবং আমার অপার অসহায়তা বিষয়ে সদ্য-অভিজ্ঞতা সত্বেও সে খাবারের জন্যে চিৎকারের ধুম তুলে দিয়েছিল। সিঁড়ি ঘরের আড়ালে আমার সদ্যার্জিত পোষ্যটির জন্যে স্থানব্যবস্থা করে দিয়ে গুটি গুটি রান্নাঘরের দিকেই যেতে হল। শত্রু-মিত্র ভেদ তখন আর আমার চলে না। একটা তীব্র মুখ-ঝামটা পেলাম কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি বা নারকেলের মালা আনার নির্দেশও পেলাম। মুহূর্তে জুটে গেল—পাত্র এবং খাবার দুইই! ভাবার সময় নেই, খাবার নিয়ে ছুটলাম পোষ্যকে পুষতে। ওর সেই গর গর করে খাবার চেষ্টাটা আমার কাছে বিশ্বগ্রাসের নমুনা বলে মনে হচ্ছিল। ওর সেই ঘাড়ে ঢেউ তুলে তুলে ভাতের খাবলা তুলে নেওয়াটাই একমনে দেখছিলাম আর একটু একটু আদর করার চেষ্টা করছিলাম। সব চেটেপুটে খেয়ে ফেলল যেন কতদিন খায় নি। জল? জল লাগবে তো! উঠে ছুট দিতে গিয়েই থমকে গেলাম। মনে হল যম নারীমূর্তি ধরে আমার পিছনে দাঁড়ানো! পালাবার পথ নেই! হাতে ঘটি থেকে সেই পাত্রে জল ঢেলে দিয়ে নির্দেশ দিয়ে গেলেন ওটার জল খাওয়া হয়ে গেলে যেন পুকুর পাড়ে নিয়ে যাই। ভাল করে স্নান করিয়ে এনে তবে ঘরে তুলতে পারা যাবে! আমি তো চোখে অন্ধকার দেখছিলামই এখন মনে হল সবই স্বপ্ন মায়া মিথ্যা! যা ঘটছে তার কোনওটাই ঘটনা নয়।

যা দেখছি তার কোনওটাই দৃশ্য নয়। পোষ্য থেকে চোখ তুলে যেখানে মা ছিলেন সেখানটায় চোখ গেল। না, নেই। তবে? কি করে এমন হয়?

সুতরাং পোষ্য-পোষক দ্বৈত যাত্রা শুরু হয়ে গেল। মা হঠাৎ কি মনে করে সেই অধম কুকুর ছানাকে তার অকৃপণ স্নেহের ভাগ দিয়েছিলেন তা আমি জানি না, বুঝি নি। বা'র-বা'র-মন তাঁর সন্তান যদি একটা কুকুর ছানাকে কেন্দ্র করে ঘর-মুখো হয়, কর্তব্য পরায়ণ হয়, তাহলে সে তো অনেকখানিই হবে। তাই কি তিনি আমাকে সাহায্য করলেন? রাত্রে শোয়ার সময়ে এ বিষয়ে আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ে তার সব হারিয়ে ফেলেছি। তবে কুকুর পোষা নিয়ে আমার আর কোনও বিরোধিতায় জড়াতে হয় নি। এমন কি খিদমতগারির সিংহভাগটাই একসময়ে মা'র ভাগে চলে গেছিল। আমার ভাগে ছিল সকাল-বিকেল ওটাকে আদর করা, ওটার সঙ্গে খেলা করা, দৌড়ানো আর রাগানো। চলছিল ভালই।

বেশ তাড়াতাড়িই বড় হচ্ছিল। স্বাস্থ্যটি-ও বেশ তাগড়াই দেখাতো। হবে না? দ্বৈত যত্নআত্তি জুটছিল যে। কি নাম দেব কি নাম দেব করে 'বাঘা' টাই মনে এলো। সেই নামেই আমি ওকে ডাকতে সুরু করলাম। অনেকেই ব্যঙ্গ করেছে। বাঘাকেও এবং আমাকেও। গায়ে মাখিনি। বরং বার বার বাঘাকে বুঝিয়েছি বড় হয়ে সমুচিত জবাব দেওয়া চাই। বাঘা তার বড় বড় চোখ দিয়ে আর ঝুলেপড়া কান নেড়ে চেড়ে আমার কথা শুনতো। কতোটা তার সে বুঝতো আর কতোটা বুঝতো না তার কোনও চেতনা আমার ছিল না। দড়ি বাঁধা বাঘা দূর থেকে আমাকে দেখলেই সামনের পা দু'টো ভাঁজ করে ঘাড় নিচু করে কান নেড়ে কাছে ডাকতো মুক্তির আশায়। আমি ওকে বঞ্চিত করতাম না। ও তখন ঘাড় উঁচু করে আমার পিছন পিছন আসতো আর ডান দিকে বাঁ দিকে সীমিত পদক্ষেপে নিজের শৌর্য প্রকাশ করত।

এই বাঘার যেদিন সরুকণ্ঠ শেষ হয়ে ঘেউ-ঘেউ করে পরুষ কণ্ঠ প্রকাশ পেল সেদিন আমি অবাক হয়ে গেলাম। যেন হাঁড়ির মধ্যে শব্দ বা'র হচ্ছে। যারা বাঘাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, আমাকে ব্যঙ্গ করেছে তারা এখন বেশ সমীহ করতে শুরু করল। নিজের চেতনার কাছে আমার বুকের মাপটাও বেশ বড়-সড় বলে মনে হল। আহম্মদ একদিন বাঘাকে দেখে আদরটাদর করে আমাকে বলল যে এটা যে-সে কুকুর নয় বেশ ভাল জাতেরই কুকুর। যত্ন

নিলে দারুণ হবে। আহম্মদকে সেই মুহূর্তেই ভালবেসে ফেললাম।

বাঘা আমার সদা সঙ্গী! যেখানে যাব সেখানেই ওর যাওয়া চাই। খেলার মাঠে, স্কুলে এমন কি মামা বাড়ি গেলেও আমার সঙ্গ নিতে চায়। ওর খাওয়া দাওয়া ভরণপোষণের জন্যে এখন আর আমাকে একেবারেই চিন্তা করতে হয় না। বরং মা'র দুশ্চিন্তা বেড়েছে অনেক। অনেকেই এখন বাঘাকে খেতে দিতে চায়। মা পছন্দ করেন না। নিয়মিত খাবারে ওকে অভ্যস্ত করানো হয়েছে। বাঘার কণ্ঠস্বর পাশের গ্রাম থেকে শোনা যায়। অন্য সব কুকুর গুলো আমাদের বাড়িতে আসেই না। যদিও বা কোনওটা এসে পড়ে তাহলে পিছনের দু'পায়ের মধ্যে ল্যাজটিকে সদাস্থাপন করে হীনতা-দুর্বলতা-সন্ধির বার্তাটি প্রস্তুত রেখেই আসে। এমন কি বাড়ির পাশ দিয়ে যদি কোনও কুকুর চলে যেতে যেতে বাঘার উপস্থিতির বিন্দুমাত্র গন্ধ পায় তাহলেই সন্ধি প্রস্তাবটি পায়ের ফাঁকে নিশ্চয়করে ঘাড় নিচু করে ধীর পায়ে শনৈঃ শনৈঃ নিজের পথে প্রস্থান করতে থাকে।

এই বাঘা যখন আমার গর্ব, আমাদের রাত্রির প্রতিরক্ষার নিশ্চিত কাণ্ডারী, তখন সে এতোদিন পরে দাদার স্নেহ আদর আর ভালোবাসা পেতে লাগল। দাদা আমার পিতৃতুল্য ; তাঁর তৃতীয় সন্তান আমার চাইতে প্রায় এক বছরের বড়। আমার চোখ ফেটে জল আসে কিন্তু কিছুই বলতে পারি না। আমি ছাড়া যার এক পলও চলত না সেই বাঘাও দেখলাম বড় হয়ে যেন কেমন হয়ে গেল। দাদার ন্যাওটা বনে গেল! আমার দুঃখ আর বাঘা বোঝে না, তেমন করে বোঝে না। আমি ডাকলে আসে, আমাকে আদর করে, ভালবাসে। সবই ঠিক, কিন্তু কেমন যেন আর সেই আগের মতো নির্ভরশীল ভালবাসা, একান্ত ভালবাসা হারিয়ে গেল। একটা দীর্ঘ মান অভিমানের পালা চলল। আমার কাছে এসে বাঘা আমাকে আদর করতে গেলে আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেই। কিন্তু বাঘাকে সরিয়ে দেওয়া আমার সাধ্যে কুলোতো না! তাতে আরও রাগ বেড়ে যেতো। ও ছিল আমার কাছে একটা লিলিপুট। এখন ওর পাশে আমাকেই লিলিপুট বলে মনে হয়! আমার অনেক পরে যাত্রা করে বাঘা অনেক বেশি পথ পার হয়ে গেল? আমি যেখানে ছিলাম প্রায় সেখানেই রয়ে গেলাম কিন্তু বাঘা তীব্রগতিতে কতো বড়োটা হয়ে গেল। সেও তো আমার রাগের কারণ।

আমার মনে বাঘাকে নিয়ে অনেক কষ্ট। মা তা জানেন, বোঝেন! বাঘার সঙ্গে আমি আড়ি দেই, ওকে মারি, দূরে সরিয়ে দেই। মা সব দেখেন। একদিন মা আমাকে অনেক করে বুঝিয়েছিলেন। বাঘা বড় হয়ে গেছে, বাঘার জগৎ আলাদা হয়ে যাবে বাঘাকে যেন আর মার-ধর না করি, বাঘা কামড়ে দিতে পারে। আরও কতো কীই মা বলেছিলেন। তার সব আমার মাথায় ঢোকেনি, সব বুঝিও নি। তবে কষ্টের তীব্রতা অনেক কমে গেছিল।

দাদা একদিন একটা লোহার চেন কিনে এনে বাঘার গলায় পরিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম বাঘা অত্যন্ত বেশি আনচান করে। আগে কোনও কুকুরই আমাদের বাড়ির চৌহদ্দিতে আসতো না। এখন দেখি বাঘার চার পাশে আসার জন্যে অনেক গুলোই ঘুর ঘুর করে। দাদা লাঠি নিয়ে তাড়া করেন। বাঘা ভীষণ উত্তেজিত হয়। কেমন যেন পাগলের মতো করতে থাকে। আমার মনে হত চেন্ দিয়ে বেঁধে রেখেছে বলে বাঘা প্রতিবাদ করে। আমার চেনা বাঘা আমার চোখেই ক্রমশ অচেনা ঠেকতে লাগল। মা নিষেধ করে দিলেন এখন যেন বাঘার কাছে ভুলেও না যাই, আদর করতে চেষ্টা না করি। আকাশ পাতাল ভেবে কূল কিনারা পাই না। বাঘার কি হল! দাদার উপর রাগ হত। কেন অত শক্ত লোহার চেন দিয়ে বাঁধলেন বাঘাকে? বাঘাকে আর বাঘ নয়, সিংহ বলে মনে হত! চেহারাটার মধ্যে একটা শক্তি যেন স্থির হয়ে আছে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে।

একদিন শেষ রাতে হুলস্থুল চলছিল। ঘুম ভেঙ্গে গেল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা'র পাশে থেকে সব দেখছিলাম। উঠোন ভর্তি লোক, উত্তেজিত। বাঘার ডাক শুনতে পাচ্ছিনা। মা বললেন বাঘা পালিয়েছে। উঠোনের পাশে একটা রক্তাক্ত কুকুর শুয়ে পড়ে আছে। একজন লোককেও নাকি বাঘা কামড়িয়েছে। সবাই বলা বলি করছে বাঘাকে তাড়াতে হবে। গ্রাম ছাড়া করতে হবে। বাঘা নাকি পাগল হয়ে গেছে। যাকে পাবে তাকেই কামড়াবে।

কিন্তু বাঘা ফিরে এসেছিল। সারাদিন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন গ্রাম থেকে, গ্রামের প্রান্ত থেকে বাঘার হদিসের খবর আসছিল। সবই উড়ো খবর। ভোর বেলায় দেখা গেল বাঘা তার শিকল-খুঁটোর কাছে মাটিতে পেট রেখে গলাটা লম্বা করে দিয়ে ভাবুক ভাবুক চোখ করে অপরাধীর মতো

নিশ্চুপ শুয়ে আছে। একে একে সকলে এসে ওটাকে দেখে যাচ্ছে দূর থেকে। ভিড় হচ্ছে ভিড় পাতলাও হয়ে যাচ্ছে। কেউ ওর কাছে পিঠে যাচ্ছে না, বড়রা ছোটদের কাছে যেতে বারণ করছে। বাঘার কিন্তু চোখদুটো ছাড়া আর কিছুতেই এই এতো ঔৎসুক্য-সন্দেহ কথা-বার্তা-সমালোচনায় কোনও পরিবর্তন নেই। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মাত্র! কখনও মনে হয় কাউকে খুঁজছে। দাদা এলেন একটা লাঠি নিয়ে। এবারে বাঘা নড়ে-চড়ে উঠলো আড়মোড়া ভাঙল এবং ঘাড় নিচু করে কুঁই-কুঁই শব্দ করে দাদার শক্ত উদ্যত লাঠির দিকেই এগিয়ে গেল। পরিষ্কার বোঝা গেল সে ক্ষমা চাইছে, সে অনুতপ্ত। কোথায় গেল বাঘার গলা, তার ঋজুগ্রীব ভঙ্গি? কোথায় সেই দৃপ্ত চলন? সব যেন একদিনে, একরাত্রে বিসর্জন দিয়ে এসেছে বাঘা। দাদা ওকে মারলেন না, মা বাধা দিলেন। মা বললেন ওকে শিকল দিয়ে রাখ। আর পারলে দুটি খেতে দাও।

বাঘা খাবার পেয়ে এবং আবার তার শিকল পেয়ে স্বাভাবিক হয়ে এলো। কিন্তু বাঘা বাড়ির যে পরিবেশ থেকে বেরিয়ে গেছিল সেই পরিবেশে আর ফিরে আসতে পারল না। পাড়ায় বাঘার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। চুপচাপ শুয়ে থাকা বাঘা যেন কেমন হঠাৎ হঠাৎ উগ্রমূর্তি ধারণ করত। তখন ওকে চেনা যেতো না। বাঘার জীবনের ছন্দটিই হারিয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার বাঘা সেই একই কাণ্ড করে বসল। পরের বছর। এবারে বাঘার অদৃষ্টে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া অনিবার্য হয়ে গেল। বাঘাকে বস্তায় পোরা হল, দড়ি দিয়ে বস্তার মুখ বেঁধে নৌকায় করে চালান করে দেওয়া হল। কোথায় কত দূরে তার কোনও হদিস পেলাম না। তবে শুনেছিলাম বাঘাকে অন্ততঃ দশবারো মাইল দূরে কোনও এক প্রান্তরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

বাঘা হারিয়ে গেল। আমার তুলনায় অনেক দ্রুত বড় হয়ে ওঠার জন্যেই বোধহয় ওকে খেসারত দিতে হল! কে জানে? আমার মনে অসীম কষ্ট হল! সেই কবে থেকে বাঘা আমার প্রিয়, হাতে তুলে মানুষ করেছি বাঘাকে। আমার মা'এর যত্নআত্তিতেও তো বাঘা ভাগ বসিয়েছে। বারে বারেই মনে হত কেন বাঘা বড় হল। কেন ওর ভার দাদার হাতে চলে গেল। বহু 'কেন'রা দল বেঁধে আমার মনে দিনের পর দিন ভিড় করে রেখেছিল।

ক্রমশই বাঘার কথা ভুলে যাচ্ছিলাম। ব্যথার কাঁটাগুলো আর তেমন

করে বিশ্ধ করছিল না। বাঘার স্মৃতি ক্রমে ক্রমে হাল্কা হয়ে এলো। আর এক সময়ে আবছা আবছা একটা যেন সুদূর অতীতের ছবি বলে মনে পড়ত। এ-রকমই বোধহয় হয়। আর কাঁচ মনে দাগও যেমন গভীর হয়, মুছে যেতেও তেমনি বোধহয় সময় কম লাগে। নোতুন নোতুন মন-লাগা ভাল-লাগার ক্ষেত্র ঢেউ-এর মত এসে পড়ে। পুরোনোকে মুছে দেয়। নোতুনের দাগ পড়ে। তাই চলে, তাই চলছিল।

আবার এক সকালে উঠোনে ভিড় হল। হৈ-চৈ হল। বাঘা সিঁড়ির শেষ প্রান্তে উঠোনে শরীর রেখে ধাপের উপর নিজের মাথাটা ন্যস্ত করে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। দুটো পা যেন জোড় করা। নড়াচড়া নেই। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তর তর করে নিচে নেমে এলাম। সবাই যেন শোকাহত। বাঘা মারা গেছে। দাদার চোখে যেন জল দেখলাম। অনেকেই ছোট-ছোট করে বাঘার অতীত দিনের নানা রকম গুণের কথা বলাবলি করছিল। আমার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এলো। মা আমার পিছনেই ছিলেন। আস্তে আস্তে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। বাঘা কি শেষ ক্ষমাটুকু চাইতেই এসেছিল ?

মুংলি ঃ

দেশের বাড়িতে আমাদের অনেক গরুবাছুর ছিল। ক্ষেতখামার ছিল বলে বলদ তো আবশ্যিকই ছিল। সেই সঙ্গে দু'একটা গাইগরু সকলেই রাখতেন। আমাদেরও ছিল। যদিও গোয়ালঘর বেশ দূরেই ছিল, বেশ দূরে, তবুও আমার স্বভাব যেহেতু দূরের টানে টলে যেতো বেশি তাই গোয়াল ঘরের আশেপাশে এবং ভিতরেও আমার যাতায়াত ছিল। বলদদের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ ছিল না, সেগুলো বেঢপ কাজের জীবন্ত যন্ত্র বলেই মনে হত। ওগুলোর চোখেমুখেও কোন কিছুই দেখতে পেতাম না যা মনকে টানতে পারে। কিন্তু অন্যরকম ছিল মঙ্গলা বা মুংলি। একটা শান্ত শান্ত ঘরোয়া ঘরোয়া চাউনি দিয়ে মুংলি আমাকে আপন করে নিয়েছিল। তার চাইতে বড় কথা মুংলির সংসার। দুটো বাচ্চা নিয়ে ছিল তার সংসার। কখনও আদর করত, জিভ দিয়ে চেটে চেটে বাচ্চার গায়ের লোমগুলোকে বেশ চিরুনি-টানা করে দিত। খুব মজার ছিল সেইটি দেখা। আবার বাচ্চা যখন

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে লম্বাটে মাথা দিয়ে গুঁতোতো, দুধ খাবার সময়, তখন সে কেমন যেন স্থির অব্যক্ত দাঁড়িয়ে থাকত বোবা হয়ে। ব্যথা পেলে কখনও সখনও একটা পা তুলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করত বাচ্চাটাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য বেশ বিরক্ত হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বাচ্চাটাকে গুঁতো দিতে চাইত। অনেক সময় নষ্ট করে এক মনে এ-সব আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। দেখতাম বাচ্চাটা যখন খুব আনন্দে থাকত তখন মুংলির গলার কাছে নিজের শরীরটাকে লেপটে দিয়ে ঘষা-ঘষি করত। আমার ভাল লাগত দেখতে, তাই দেখতেই থাকতাম।

তবে আমার সব থেকে ভাল লাগত বাচ্চা যখন জন্মের পরেই, কিছুক্ষণ পরেই আঁকা বাঁকা পা ফেলে ফেলে হাঁটার চেষ্টা করত। কিম্ভূত চেহারার সেই ছোট্ট বাচ্চার অসংলগ্ন চঞ্চল পদ-তাড়না যেন মনকে ভরে দিত। তার পরে ক'এক ঘন্টার মধ্যেই কি করে যে ছুন্‌ছুন্‌ করে দৌড়োতে পারত তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। উদ্দেশ্যহীন সেই দৌড়-ঝাঁপ দেখে বাচ্চাব সঙ্গে দৌড়তে ইচ্ছে করত। মাঝে মাঝে চেষ্টাও করতাম। কী দ্রুত দৌড়তে পারত! হঠাৎ হঠাৎ থেমে যেত আর আড় চোখে এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে যেন হাসি-হাসি মুখেই তাকিয়ে থাকত। মনে হত যেন আমাকে আরও জোরে দৌড়তে বলছে। ওর দৌড়ে ছেদ পড়ত না, অথচ আমি হাঁপিয়ে গিয়ে বসে পড়তাম।

আর একটা অবাক কাণ্ড দেখতে ভাল লাগত। মা ঘটি নিয়ে মুংলির দুধ দোয়াতেন। মুংলির পেটের সঙ্গে মা তার কপালটা প্রায় ঠেকিয়ে দিয়ে কেমন এক বিশেষ ধরনে বসে যেতেন। হাঁটু দুটো প্রায় অনুভূমিক বাড়ানো, তার মাঝে ঘটিটি বসিয়ে চেপে রাখা। দু'হাতে চ্যাং-চ্যোং করে বাট থেকে দুধের ছিটকে ছিটকে ঘটিতে পড়া, ঘটির ধারে আছড়ে পড়া দেখতাম। একটু দূরে উবু হয়ে বসে সেই দৃশ্য দেখতে আমার বেশ ভাল লাগত। একটু দূরে থাকতাম কারণ মা'র হাত বেশ লম্বা ছিল! সেই মাপটা আন্দাজ করে দূরত্ব ঠিক করে নিতাম। পড়াশুনোয় অনিচ্ছা আর যতো রাজ্যের অকাজ কুকাজে আত্যন্তিক আগ্রহ ছিল বলে আমার অনেক নাম ছিল, অনেক যোগ্যতার অভিধা সেই ছোটবেলা থেকেই পেয়ে গেছি। আমার নিজেরও কোনও সন্দেহ ছিল না যে গরু-বাছুর, মাঠ-ঘাট, মাছ-জাল খাল-বিল এরাই আমার জীবনের

মোক্ষ ; মেঠো পথ মেঠো জীবন। সেই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে আমার তো কোনও ক্ষোভ ছিল না, কষ্টবোধ ছিল না। যত কষ্ট যত ক্ষোভ জমা হত মা-বাবার মনে। কেন যে ওরা তত অবুঝ কে জানে।

দেশ বিভাগের ওলটপালট, যন্ত্রণা, হতাশা আমাদের যখন সবকিছুকেই তছনছ করে দিল তখন আমি হঠাৎই বড় হয়ে গেলাম। এই বালির বাড়িতেও মা দুধের ব্যবস্থা করার জন্যে গরু পুষলেন। তখন আমি কিশোর বিশ্বকর্মা। শত কাজের মধ্যেও দুচারটি বেশি কাজের জন্যে সময়ের অভাব হত না। ঘর বাড়ি চাকরি ব্যবসা গাছ গাছালি করেও তাই গরুর দেখাশুনোর সময় পেয়ে যেতাম। কিন্তু হঠাৎই আগ্রহ বেড়ে গেল সেই গরুটি যখন একটি বাচ্চা দিল। অতীত উঠে এলো বর্তমানে! সেই বাচ্চা নিয়ে মত্ত হয়ে গেলাম। সেই বাচ্চাকে দেখে এবং আদর করে ঘরে ঢুকতাম, বাইরে যাবার সময় ও তাকে আদর করে বাইরে যেতাম। একটা সুন্দর বকনা। নাম দিলাম মুংলি। এখানেও অতীতকে কাছে পেতে চাইলাম। ধীরে ধীরে সেই বাচ্চা বড় হতে লাগল। আর চেহারা চরিত্রে চলনে বলনে তিলোত্তমা হয়ে উঠতে লাগল।

আমার সেই সতেরো আঠারোর তাজা মনে সবুজের ছোঁয়া বলতে ছিল ঐ মুংলি! অবশিষ্ট বলে যে মনটা ছিল তা আমার বলে কখনই ধার্য হয় নি। সে ছিল সংসারের চাকায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সময় পেলেই ওদের নিয়ে ঝিলের পাড়ে চলে যেতাম। তাজা ঘাস খাওয়াবো বলে! মুংলি আনন্দে লাফাতো আর ঘাস খেতো, মুংলির মা তার অফুরন্ত ক্ষিধে মিটিয়ে নিত। ওদের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতাম। গলার 'কাঁথায়' হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ওদের নরম নরম ভাঁজ ভাঁজ ঝুলেপড়া গলকম্বলে আদর করতাম। কি যে আরাম পেতো কে জানে। গলা লম্বা করে দিয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিত!

কিন্তু প্রকৃতিতে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ হলে কি হবে তার বেড়ে উঠতে যেন অনন্ত সময় লেগে যায়। আর অন্যান্য প্রাণীরা? কেমন ঝট্‌ঝট্ করে বেড়ে ওঠে। মুংলিও দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। আমার কাছে কেমন যেন একটা মহিলা মহিলা মনে হতে লাগল। কাছে গেলে লজ্জায় দূরে সরে যায়। ওর চোখে যেন কিসের ঝিলিক্ দেখতে পাই। এতো ভাব ছিল ; আর ক'দিনেই ভীষণ আড়ি হয়ে গেল। এতো কথা শুনতো, আর এখন অবাধ্যের

শিরোমণি হয়ে উঠেছে। মাকে ব'লে কোনও লাভ হল না। মা বললেন ওরকম হয়। একদিন ভাই-বোনেদের যেমন শাসন করি তেমনি মুংলিকে প্রচণ্ড মারপিট করলাম। ভাইরা কখনও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি, বিদ্রোহ করে নি। কিন্তু মুংলি করে বসল। দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেল। তার ছোট-ছোট সিং দিয়ে আমাকে তেড়েও এলো। সেই ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দিতে আমি দরজার ঠেঙা নিয়ে আসতে গেলাম। মা পথরোধ করে দাঁড়ালেন। অনেক বুঝিয়ে আমাকে সংযত করলেন। কিন্তু মুংলির উপর আমার রাগ রয়েই গেল।

দেখাশোনা কমিয়ে দিলাম। সকালে মাঠে দিয়ে আসি। বিকেলে কোনও দিন মা, কোনও দিন আমি থাকলে আমি, ওদের খুঁটো খুলে নিয়ে আসি। এখানে হাদান নেই, মানদা নেই, নেই সনাতন। তাতে আমার কোনও ক্ষোভ ছিল না। মন ভেঙে গেলে যা হয় তাই হল। অভিমানে মুংলিকে অবহেলা করতে লাগলাম। তাছাড়া ক্রমশ কাজের পরিসর এবং চাপ বাড়ছিল। সেও এক কারণ। ময়দানবের মতো বাড়ি-ঘর তৈরি করছি, দস্যুর মতো পরিশ্রম করছি দোকানটির মালপত্র কেনাকাটা এবং বয়ে আনার জন্যে, রাত জেগে চাকরি চলছে এবং ফেরিওলার কঠিন ধৈর্যে সংসারের আয় বাড়াতে সময় দিচ্ছি হাওড়া ব্রীজের ফুটপাথে আর হাইড-রোডের কারখানায়। যাকে বলে মরার সময় নেই আমার তখন সেই অবস্থা।

এমন সময় একদিন রাত্রে বাড়ি এসে মায়ের চোখে জল দেখলাম। বোন বলে দিল মুংলি মারা গেছে! বজ্রপাত হল। বুঝলাম মুংলিকে ভুলিনি। হঠাৎই কেমন যেন নিজেকে শূন্য মনে হলো। ভিতরের উত্তেজনা, ভয়, অবিশ্বাস এক সঙ্গে দলা পাকিয়ে আমাকে যেন পাথর করে দিল। ছুটে গেলাম গোয়ালঘরে। লম্বা কাত হয়ে মুংলি পড়ে আছে মেঝেতে। চোখদুটো ভীষণ ভাবে খোলা। জলের দাগ গড়িয়ে গড়িয়ে বেশ গভীর চিহ্ন রেখে গেছে। পাশে ওর মা ধুঁকছে। কি করব কি বলব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

পরে মার কাছে সবিস্তার শুনলাম। গোবিন্দর মা খবর দিল। বিষ দিয়েছে। খাবারে বিষ প্রয়োগের দু'একটা ঘটনার কথা এ-পাড়াতে ও-পাড়াতে শোনা গেছে। কিন্তু একেবারে বাড়ির কাছে, ধোপার মাঠে, যে এ-ব্যাপার ঘটতে পারে তা কেউই ভাবে নি। তাই ঘটে গেল। ঘরে আনতে আনতেই

মুংলি শেষ, ওর মা বোধহয় কম খেয়ে থাকবে, বড় ও বটে, তাই এখনও টিঁকে আছে। ভোর রাতে মুংলির মা'ও চলে গেল।

শপথ করলাম আর নয়, কখনই নয়!

মিনি ঃ

মিনির ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। মিনিকে আমি পুষিনি। ওর পুষি-পুষি জীবনটা আমার একেবারেই অজানা। কবে কোথায় কোন বিড়াল মাতার জঠরে ওর জন্ম হয়েছিল, কোথায় ও কিভাবে বড় হয়ে উঠেছে, ওদের ক'টি ভাই-বোন ছিল, এসব কিছুই আমার জানা নেই। ওকে আমাদের বাড়ির কেউই পোষেনি। আমার মা-ও না ভাই-বোনেরাও নয়। এমন কি আমাদের এই বালির বাড়িতে তখন আরও ক'একঘর পরিবার বাস করতেন। ভাড়াটে। মিনি তাদেরও কেউ নয়। কিন্তু তা বলে মিনি কোন যে-সে খানদানেরও নয়, নয় হাঁড়ি-ভাঙ্গা, ঢাকা-উল্টে-খাওয়া দজ্জাল প্রকৃতির মেয়ে। সে কথা আমরা পরে টের পেয়েছি। যখন ওর স্বভাবটা জানা হয়ে গেল তখন মিনি আমাদের পকেটে পুরে ফেলেছে! বলতে গেলে মিনিই প্রথম আমাকে পোষ মানিয়ে ছিল।

তখন আমি ইণ্টারমিডিয়েট পড়ি। টালির দক্ষিণ-প্রান্তের ঘরের দু'খানা ঘরের পুব দিকের ঘরে আমার পড়ার আসর। ভাঙ্গা মেঝে, পুরোনো ঘুণেধরা মতো সস্তা দামের জানালা দরজা। আসবাব পত্র বলতে একটা টেবিল এবং সেই টেবিলের পিছনে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স পাশের দিকে মুখ করে টুলের মতো ব্যবহার করছি। টেবিলের উপরে আমার বইপত্র খাতাকলম সবই। কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় খাতাপত্র ইত্যাদি প্যাকিং বাক্সের মধ্যে অযত্নে রেখে দেওয়া। সকাল-দুপুর-রাত্রি সেই আমার পাঠাভ্যাসের স্থান। যেদিন যেমন সময় পাই। পাশের অন্য কামরাতে চক্রবর্তীরা ভাড়া থাকেন। তাঁদের ছোট্ট সংসার। উপরে বাঁশের খাঁচায় টালির চালা।

মিনির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এই ঘরের মধ্যেই। আমি যে ঘরে আছি সে কথা বোধহয় ও কল্পনাই করেনি। একটা ইঁদুর মুখে সটান সেই ঘরে ঢুকে মিনি হঠাৎই আমাকে দেখে হকচকিয়ে থেমে গেল। যেন বিনা অনুমতিতে আমার একান্ত ঘরে প্রবেশ করে কোনও অন্যায় করে ফেলেছে!

সঙ্কোচ, আর অনুশোচনায় মিনি কিছুক্ষণ ঘাড় উঁচু করে সেই ইঁদুরটিকে নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। মাটিতে রেখে দিয়ে জিভ দিয়ে মুখটা একটু পরিষ্কার করে বোধহয় বলতে চাইল 'সত্যিই দুঃখিত, ক্ষমা করে দিও'। একটা মাত্র 'মিউ' করেই মিনি আবার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের তাড়নায় অত্যন্ত তৎপরতায় ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু পলায়ন-প্রচেষ্ট সেই শিকারটিকে এক লাফে ধরে ফেলল। মিনির চোখ দেখে আমার খুবই ভাল লাগল। এবং কাজটিও তো নিঃসন্দেহে ভালই করছে। 'রং ট্রেসপাস্' ক্ষমা করে দিয়ে সাদরে বললাম, 'মিনি তুই আমার ঘরে বসে ওটাকে খেয়ে নিতে পারিস্', সেই প্রথম ওটাকে মিনি বলে সম্বোধন করলাম। আর সেই থেকেই ও আমার 'মিনি'।

আমার কথায়, ব্যবহারে আর কণ্ঠে মিনি কি পড়ে নিল কে জানে। অনেকক্ষণ আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তার পরে ঘরের একপ্রান্তে একান্তে বসে তার সদ্য আহরিত তপ্ত খাদ্যটিকে ধীরে ধীরে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিল। অনেকটাই সময় নিল। মাঝে মাঝেই আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। তাই ওর সময়ও বেশি লাগছিল। বিভিন্ন সময়ের ওর 'মিউ' গুলো আমার বেশ ভাল লাগছিল। কণ্ঠস্বর, কণ্ঠের উত্থানপতন, শব্দের দীর্ঘায়ন হ্রস্বায়ন তীক্ষ্নতা-নম্রতা সব যেন আলাদা আলাদা অর্থের দ্যোতনায় অর্থবহ হয়ে উঠছিল। জিভের রুমালটি দিয়ে মুখের সব ভক্ষণ-চিহ্ন যখন বেশ পরিপাটি করে মুছে নিয়ে বলল 'মিউ' তখন ওকে জানালাম যে যখন খুশি তখন সে আসতে পারে আমার ঘরে। আমার একাকিত্ব কমবে ওর স্থানাভাবের সমস্যা মিটবে। মিনি বেশ তৃপ্তির প্রকাশেই একটা মিউ দিল। বললাম বিশ্রাম করলে আপত্তি নেই আমার। আর একটা মিউ বলে ঘরের অপর কোণে গিয়ে আড়মোড়া ভেঙে বসে পড়ল। এবং আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যেই বোধহয় থেকে গেল আমার পড়ার ঘরে। ড্যাবড্যাব করে আমার মুখের উপর ওর চোখ দুটি রেখে নিশ্চিন্ত বিশ্রামে মগ্ন হল। মিনি আমাকে বশ করে ফেলল। মিনিকে ভালবেসে ফেললাম। কি রকম মিষ্টি মিষ্টি দেখতে চেহারাটা। চোখদুটো ভাল করে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। একেবারে কিশোরীর চোখের মতো গভীরের উপরে চলমান চঞ্চলতা। ওকে আমার পড়ার সময় থাকতে অনুরোধ করলাম। বললাম 'তুমি থাকবে মিনি, আমার ঘরে, আমার পড়ার সময়?' আর 'তুই-তুকারি' করে অবজ্ঞা দেখাতে মন চাইল না।

একেবারেই তুমি হয়ে গেল মিনি। মিনি তার অনুভবের দীর্ঘ গোঁফগুলোতে একটা হিল্লোল তুলে মুখব্যাদন করে যে ভাবে সম্মতি জানাল তা আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিনি।

না, আমি সেরকম কোনও নেশাই করি না। আফিং তো নয়ই। কমলাকান্তের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকলেও তার ঘরে থাকা নৈয়ায়িক মার্জারের প্রতি আমার কোনও দুর্বলতা তো ছিলোই না বরং ঐ গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপতাই ছিল। কারণ ছোটবেলা থেকেই জানি যে বিড়াল থেকেই ডিপথেরিয়ার মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। তাই 'শতহস্তেন' নীতিই স্বীকৃত ছিল। ষষ্ঠীর দিনে আটা ময়দা চালের গুঁড়োর সঙ্গে নানান রকম রং-মিশিয়ে যে কালো-ধলো বিড়াল তৈরি হতো তার বাইরে আমার মারও কোনও প্রীতি ছিল না বিড়ালের প্রতি। এবং বাবা নিজেই ন্যায়দর্শনে পড়াশুনা করেছিলেন বলে কোন মার্জার-নৈয়ায়িকের প্রতি কোনও দুর্বলতা পোষণ করতেন না। সুতরাং না পারিবারিক টান না কোনও ব্যক্তিগত দুর্বলতা, কোনওটাই ছিল না। তা সত্ত্বেও এই মিনি যে 'ভিনি-ভিডি-ভিসি' ঘোষণা করে বসল সে তার নিজের গুণেই। বিদ্যুতের মতো এলো কিশোরীর মতো তাকাল আর আমার মন জয় করে নিল।

তবেই দেখুন আমি নই, মিনিই আমাকে তার চোখের আঁচলে কেমন অবলীলায় বেঁধে ফেলল। সকালে মিনিকে দেখেছি ঘরের কোণে শুয়ে আছে। 'মিউ' করে গুড্ মর্নিং বলেছে। মাঝে মাঝে আমাকে আদর করে ডেকেছে। কখনও শুনেছি কখনও শুনি নি। প্রায়ই ওকে বাইরে চলে যেতে দেখেছি। ইঁদুর-মুখে ঘরের কোণে এসে যথাকর্তব্য সমাপন করেছে। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। শুয়ে-বসে-আড়মোড়া ভেঙে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। টানটান হয়ে আলস্য-ত্যাগ করেছে। অনুমতি নিয়ে মিষ্টি করে বলে গেছে 'আবার আসব'! আমি যেমন ওকে বুঝতে পারতাম মিনিও বোধহয় আমাকে তেমনি বুঝতে পারতো।

মিনি যে আমাকে ভালবেসেছে তা বুঝতে পারলাম যেদিন দেখলাম মিনি টেবিলের উপর গোল হয়ে শুয়ে আছে। আমাদের ভালবাসার খেলা যতদিন চলছিল মিনি ততদিন দূরে দূরে থেকে চোখের কটাক্ষে আর মুখের আভাসে, 'মিউ'তে আর গমনের ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করেছে। এবারে ও কাছে এসে

গেল। ওকে টেবিলে দেখেই আমার কি রকম একটা আনন্দ বোধ ঝংকার তুলে গেল। আলতো করে ওর গায়ে হাত দিতেই ও গর্‌র-গর্‌র করে আদর গ্রহণ করল। একটু যেন সলজ্জ নড়ে-চড়ে উঠে একটা 'মিউ'। অসুবিধা করতে চায় না তাই টেবিলের প্রান্তে গিয়ে নিচে লাফ্‌ দিল। একটু ঘুরে এসে আমার বসা হলে প্যাকিং বাক্সের পাশটিতে পিঠ লাগিয়ে বসে পড়ল। বললাম তুমি থাক এখানে, যেও না। মিনি রাজি হয়ে গেল 'ম্যাঁও'।

মিনি এবং আমি এখন থেকে দু'জনে দুজনের জন্যে। আমাদের পরস্পরের চেনা-জানা হয়ে গেল। আমার একাকিত্ব ঘুচল, মিনি পেল তার স্নেহের ক্ষেত্রটি।

মিনি রান্নাঘরের প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করত না। ভাতে তো নয়ই মাছের কাঁটা বা মাছের টুকরোর দিকেও ওর কোনও লোভ ছিল না। আমাদের বাড়িতে যে সুবিস্তৃত ইঁদুর নিবাসের ব্যবস্থা ছিল তা মিনির কর্মযজ্ঞের পক্ষেও যেমন বিশাল ছিল ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যেও ছিল তেমনি প্রশস্ত। আব ইঁদুবকুলে পঞ্চ-জন্ম বিধি থাকায় সংখ্যার ঘাটতিতে মিনিকে মাছের দিকে নজর দিতে হয় নি। মিনি নিশ্চয়ই পরিমিত আহার পছন্দ করত। তাছাড়া স্লীম থাকতে গেলে, শরীরে সৌন্দর্যের সাবলীল ঢেউটিকে সতেজ রাখতে গেলে তো পরিমিত আহারই বিধেয়। সব মিলে মিনি চন্দ্রকলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে না হলেও ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গসুন্দরটিই হয়ে উঠলো। আমার সঙ্গে পড়াশুনোয় পাঠ নেয়, আমার পড়ার ঘরে বিশ্রাম করে, আমার অনুমতিতে সেই ঘরেই ওর ডাইনিং এবং স্লিপিং এর পাকা ব্যবস্থা। একমাত্র শিকার ছাড়া ওকে বাইরে যেতে হত সকালে মাত্র একবার। আর যদি কখনও একাধিকবার গিয়েও থাকে তবে তা আমার জানার মধ্যে নেই।

সকালের খাবার আমার পড়ার ঘরেই চলে আসতো। দুপুরে আমি সকলের সঙ্গে দালানে এসে খেতাম। তখন মিনি অবশ্যই আমার পাশে থাকত। খেত না কিছুই। শুধু সঙ্গ দিতেই তার এই খাবার জায়গায় আসা। ভাই বোনেরা কিছু খেতে দিলেও মিনি তা খেতো না। আমি বাঁহাতে ওকে আদর করলে সে সেই আদর গর্‌র-গর্‌র করে গ্রহণ করত। আমি উঠে গেলে আমার সঙ্গেই উঠে পড়তো।

ক্রমশ দেখতে পেতাম মিনির চলাফেরার মধ্যে একটা গৃহিনী-গৃহিনী ভাব

একটা মর্যাদা-বোধ যেন ওর চলার মধ্যে, দাঁড়ানো, তাকানো, সব কিছুর মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। বাড়িতে এবং বাড়ির আশেপাশে দু'চারটে কুকুর যাতায়াত করত। তাদের যাতায়াতে পরিবর্তন এলো। মিনিকে ওরা ভয় পেতে লাগল। কুকুরের ঝগড়া তো সর্বজন নিন্দিত। সেই ঝগড়াও বাড়ির মধ্যে কমে গেল। বাইরে রাস্তায়ই হত, গড়িয়ে গড়িয়ে আমাদের উঠোনে পৌঁছোতে পারতো না। মিনির চোখেই বোধহয় কিছু ছিল। নাকি ওর মুখের 'ফ্যাঁস্ 'ফ্যাঁস্' হাঁকে? চেহারায় মিনিসুলভ সৌকুমার্যটি ফুটিয়ে তুলে কি করে স্বভাবে বাঘিনীর অনায়াস দৃঢ়তা ধরে রাখতো তা আমার বোধগম্য হত না। মিনি শুধু আমাদের ঘর পাহারাই দিতনা, এলাকাটাও সুরক্ষিত রাখত। সাপ দেখলে মিনি তাকে চোখে বিঁধে দিত। সাপের প্রতি আমার একটা হননেচ্ছু প্রবৃত্তি ছিল। সকলেই জানে। বহু সাপ নিজেই মেরেছি, দেখলে বা শুনলে সেই সাপের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে ধরে নেওয়া হত। মিনি কি করে আমার এই স্বভাবটির কথা টের পেযে গেল কে জানে! সাপ দেখলে ও তাকে আটকে রাখত। আমি মেরে ফেলেছি। কখনও নরম-সরম হলে মিনি একাই তাকে থাবায় থাবায় নির্জীব করে ফেলত। মিনি-সাপে এই বিরোধিতা এই যুদ্ধ না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। আমরা অনেকেই দেখেছি। ঘাড়ের সব চুল খাড়া, চোখে অনড় প্রতিজ্ঞা, গোঁফের ঝলকে তীরের ঋজুতা আর ফ্যাঁস-ফ্যাঁসানিতে বাঘিনীর রোষ! মিনিকে চেনাই যেতো না!

আমাতে-মিনিতে এই যুগল চলন চলেছিল অনেক দিন। কলকাতা থেকে ফিরলে মিনিকে পেয়েছি গেটের কাছে! পায়ে পায়ে এসে ঘরে ঢুকেছে। বাইরে যাবার সময়ও মিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত যেতো। মাতা-কন্যা প্রিয়া-বান্ধবী সব রূপেই মিনি ছিল আমার একান্ত।

সেই সময় আমাদের এলাকায় অনেক মেটে বাড়ি ছিল। পুরোনো বাড়ি। আমাদের ঘরছাড়া যে বিরাট এলাকা তাও ছিল বেশ উঁচুনিচু ঢিবিঢাবায় ভর্তি। বাঁশঝাড়, পুকুর, আদাড়, বাগান। সব মিলে সাপখোপের উপযুক্ত আশ্রয় বাসস্থান। ছিলও দু'দশটা। মৃত্যুও ঘটেছে অতীতে সাপের কামড়ে এখানে ওখানে। সন্ধ্যার পরে বড় একটা কেউ অন্ধকারে বাইরে বার হতে চাইতো না। বিশেষ করে গরম কালে। আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল একটা বাঁশ ঝাড়। সেটা এখন নেই। দিনের বেলাতেই অন্ধকার অন্ধকার মতো

হয়ে থাকতো সেই সব এলাকা! ভয় ভয় করতো। লোকজনও ছিল না তেমন। গা ছম ছম একটা ভাব সন্ধ্যে হতেই ঘিরে ধরতো সেই সব এলাকা! মিনির যাতায়াত ছিল এরকম অনেক অ-জায়গায় কু-জায়গায়। মা বলতেন বিড়াল আবার সাপ মারে নাকি? ওটার মরণ আছে ঐ সাপের কামড়েই। আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম। মিনিতো আর সাপুড়ে নয়, সাপ ধরা বা মারা তো আর ওর জীবন-স্বভাব নয়, প্রাপ্ত প্রকৃতি। তাই ও অকারণ সাপের সংগে যুঝতে যাবে কেন?

ক'দিনের জন্যে বড়দি (আমার একমাত্র দিদি, তাই দিদিই যথেষ্ট, কিন্তু আমার ছোট ভাইদের কাছে বড়দি এবং ছোড়দি ছিল) স্বপনকে নিয়ে বালিতে এসেছে। স্বপন দিদির একমাত্র সন্তান। সবে একপা দু'পা হাঁটতে শিখেছে। সেই স্বপন একদিন বিকেল থেকে কান্না জুড়ে দিল। তার মা, দিদিমা মিলে কান্না থামাতে পারছে না। চলছিল বেশ বিরক্তিকর পর্যায়েই। তবে আমি ছিলাম আমার পড়ার ঘরে, দূরে। তাই আমার কানেব পোকা নড়াচড়া করলেও নিষ্কোষিত হচ্ছিল না। কিন্তু দিদির কণ্ঠস্বর ক্রমশ উচ্চে উঠতে লাগল এবং 'ডাকবো মামাকে, ডাকবো?' চেতাবাণীতে ধমকের মতো বার বার ঘোষিত হতেই আমি একবার উঠে আসব মনে করছিলাম। এমন সময় মা বললেন একবার দেখতো কেন এতো কাঁদছে? উঠে এলাম। রাগে গা রি রি করছিল। অতটুকু বাচ্চা কেন অত জোরে কাঁদবে? আমার তো শাসন বলতে শারীরিক শক্তির বা গলার শক্তির প্রয়োগ ছাড়া তখনো অন্য কোনও পদ্ধতি অধিগত ছিল না। কিন্তু আদুরে ভাগ্নেকে মারা যাবে না। তাই ভয় দেখানোই স্থির করলাম। যাবার সময় বললাম 'চলোতো মিনি দেখে আসি!'

এই ভয় দেখাতে দেখাতে ওর কান্নাও থামলো না আমার জেদ মাঝখান থেকে বেড়ে গেল। ঘর থেকে বাইরে। উঠোন থেকে বাগানে। অন্ধকার হব হব করছে। কান্না থামছে না। 'বাঁশ বাগানে রেখে আসব!' কোনও কাজ হল না। দুটো বাহু দু হাতে নিয়ে স্বপনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাস্তা এবং রাস্তা থেকে বাঁশ ঝাড়ের নিচে নিয়ে গেলাম। রাগে আমার কপালের শিরা দপ্‌দপ্‌ করছিল, দাঁত কিড়্‌মিড়্‌। ইতি-উতি দেখার মনও ছিল না অবস্থাও ছিল না। এতটুকু ছেলের এত্তো জেদ?

হঠাৎ আমার বোধ-বুদ্ধি-চেতনা এক ঝলক মৃত্যুকে একেবারে সামনে

দেখেই আমাকে নিথর নির্বাক করে দিল। নড়াচড়া করার মতো অবস্থাও নেই তখন আমার। বিরাট ফণা সোজা-সামনে একমাত্র স্বপন সেই ফণা এবং আমার মধ্যে, আমার হাতের মধ্যে ধরা, ঝুলন্ত! কি করব? কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। এক ঝটকায় স্বপনকে নিয়ে অনেকখানি, যতখানি সম্ভব ততখানি দূরে সরে এলাম। ফেরার সময় মিনিকে দেখতে পেলাম সাপটার একেবারে সামনে। ল্যাজ টান্ টান্ অনড় দাঁড়িয়ে। সাপের ফোঁস-ফোঁসানি আর মিনির ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দে মিলে সেই সন্ধ্যায় সেই নিঝুম বাঁশ বাগানে যে ভূমিকম্প ঘটছিল তা আর দাঁড়িয়ে দেখার সময় বা ধৈর্য ছিল না। আমার শরীরের মধ্যে একটা শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। আমি বোবা হয়ে গেছিলাম। স্বপনের কান্না থেমে গেছে, আমি তাকে তার মায়ের কাছে দিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। আমার শরীর কাঁপছিল। মা আমার গায়ে মাথার হাত দিয়ে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নিরুত্তর পড়েছিলাম সেই বিছানায় মুখ গোঁজা অবস্থায়। কতক্ষণ জানি না। ভয়, একটা মৃত্যুভয় যেন আমার প্রাণটাকে ভিতর থেকে হাতুড়ির ঘা দিয়ে দিয়ে বাইরে বার করে আনতে চাইছিল। অল্পসময়ের মধ্যেই জ্বর জ্বর বোধ হতে লাগল। মা বললেন, হ্যাঁ গা'তো বেশ গরমই। কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল জানি না। খেলাম না, একটা তেতো তেতো ভাব মুখের মধ্যে, একটা পেট-পাকানো গোছের অনুভব আমার ভিতরটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে কি যেন কি করে চলেছিল।

সকালে যখন ঘুম ভেঙে উঠলাম তখন অনেকটাই চাপ সরে গেছে। চোখ নাকি জবা ফুলের মতো তখনও লাল ছিল। সারা রাত মা পাশে ছিলেন। আমি নাকি এ-পাশ ও-পাশ করেছি আর গোঙানির শব্দ মুখ দিয়ে বার করেছি।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে রাত হল। একটু একটু করে সুস্থ বোধ করছি। ঘোর-ঘোর ভাবটা তখনও যায় নি একেবারে। মিনির কথা মনে পড়ল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম মিনি কোথায়? মিনিকে নাকি সারা দিনই কেউ দেখেনি! আমার মনটা হু হু করে কেঁপে উঠলো, মিনি? মিনির কি কিছু হয়ে গেল? খোঁজা খুঁজি চলল যতটা সম্ভব। না, কোথায়ও মিনি নেই, তাহলে? আমার চোখ ফেটে জল এলো। মাকে সব খুলে বললাম।

আমার সন্দেহের কথা বললাম। মা বললেন, যা হবার তা তো হবেই। ভেবে কি হবে। বুক ভরা কষ্ট নিয়ে আর একটা রাত কাটল। কিভাবে কাটল তা বলে বোঝানো যায় না। একটা অবসন্নতা যেন সারা শরীরকে নির্জীব করে রেখে দিল।

সকাল থেকে শুরু হল আমার মিনি অন্বেষণ। অনেক চোখের জলে আর বুকের কষ্টে ভারি ভারি মন নিয়ে এখানে-ওখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ালাম, 'মিনি-মিনি' করে পাগলের মতো এবাড়ি ওবাড়ি চষে বেড়ালাম। মিনিকে কোথায়ও পেলাম না। রাস্তা ঘাট বাঁশ ঝাড় সবই দেখে এলাম। না কোথায়ও নেই।

ভাঙামন নিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকলাম। প্যাকিং বাক্সের উপর চোখরেখে বসতে যাবো একঝলক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়-বোধ ঝাঁপিয়ে পড়ল। কি ওটা? ঝুঁকে দেখতে গিয়ে বসে পড়লাম—মিনি! পা টানটান, শক্ত শরীর, ঘাড় লম্বা, মাথাটা বাক্সের পিছন দেয়ালে ঠেকে আছে। দেখেই বুঝেছি, হাত দিতেই নিশ্চিত হলাম, কাঠের মতো শক্ত হয়ে পড়ে আছে। "মা মিনি!" বলে কেঁদে ফেললাম। ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। এলেন। আমাকে কাছে নিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি মায়ের কোলে মুখ গুঁজে অনেক জল ঝরালাম। অনেক অনেক।

মিনি স্মৃতি হয়ে গেল।

॥ সেই ছেলেটি ॥

সেই ছেলেটি আবার এসেছিল। বহুবারই এসেছে এর আগে। সব সময়ই যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তা নয়। তবুও আসে, হাজির হয়। একমাত্র আমিই ওকে জানি। আমাদেব পরিবারের আর কেউ ওকে জানে না, চেনে না। আর আমিও যে জানি সেই জানাটা চেনা বা পরিচয়ের পর্যায়ে পড়ে না। তবুও ওর মাঝে মধ্যে আমার এখানে এসে পড়ার কারণ হয়তো কিছুটা অনুমান করতে পারি। মুখ ফুটে কখনও কিছু বলে না। সভয় নম্র পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে, এদিক-ওদিক দেখে। চোখাচোখি না হলে আমার ঘরে ঢোকে না, ভয়-ভয় চলনে আমার মা-এর কাছে চলে যেতে চায়। মা-ওকে চিনতেন না। আমিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলান—চক্রবর্তী বাড়ির পানু, শ্রীনাথ চক্রবর্তীর ছেলে।

আমার মা দেশের কথা অমৃত-সমান শুনতেন। বলতেও তার সমান আগ্রহ। তাই পবিচয়কারী সেতুটি দেখতে দেখতেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল। পানু, ওরফে, ভ্যাবলা এক লহমায়ই মায়ের কাছে পেঁ'ছে গেছিল! পাশের ঘরে আমি মনে মনে ভেবেছিলাম ভ্যাবলা কি ভাগ্যবান!

বেশিক্ষণ আমার ভাবনা স্হায়ী হয় নি। কারণ বিস্ময় সেই জায়গা দখল করে নিয়েছিল। লুচির সঙ্গে বৈকালিক জলখাবার আলুর দম! আমাদের আর্থিক সঙ্গতিতে এই বন্দোবস্ত আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে পড়ে যে! কিন্তু যিনি আমাদের সংসারের অর্থমন্ত্রী এবং সামাজিক দপ্তরের দায়িত্বে আছেন সেই আমার স্ত্রী আমার মায়ের হার্দ্য-অভ্যর্থনা আর আন্তরিক অতীত মন্থনের একমন্যতা দেখে পানুকে একজন বিশেষ ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন। তাই সবিশেষ ব্যবস্হা। মায়ের এবং আমাদের পরিবারের মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবস্হা করাটাকে তিনি সেদিন তাঁর গৃহিনীর দায় বলে মেনে নিয়েছিলেন।

অত্যন্ত হ্রস্ব চেহারা, একেবারে বেঁটের পর্যায়েই পড়ে, ক্ষীণ দেহ কোটরাগত চোখ। অপুষ্টির ছাপ পানুর সর্বঅস্তিত্বেই সিলমোহরের মতো এঁটে বসে আছে। দারিদ্রের অনুপুঙ্খ লিখন তার জামাকাপড়ে এবং সঙ্গের চটের থলেতেও জাজ্বল্য। ওর সেই কোটরাগত চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টিতে বেশ কিছু

তফাৎ একেবারে প্রকট ; পানু ট্যারা। ছোটবেলায় গ্রামের পরিবেশে ওকে অত্যন্ত বেমানান বে-মিশুক একা-একা দেখেছি। পাঠশালার গুরুমশাই-এর বেত ওকে বেশিদিন সহ্য করতে হয় নি কারণ সে পথে বেশিদূর ও অগ্রসর হয় নি।' বিদ্যালয় ওর কাছে বড়দের খেলার মাঠের মতোই থেকে গেছে। দু' জায়গার কোথায়ও ওর স্থান ছিল না ; প্রথমটি পাঠশালা অতিক্রম করেনি বলে আর দ্বিতীয়টি ওর যোগ্যতা ছিল না বলে। পানু যে একটা কোনও সম্ভাবনা তা ও নিজেও কোনদিন মনে করেছে বলে মনে হয় নি। দু'চারটে গরু-বাছুর মাঠে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর যা ও করেছে তা কিছু অনিপুণ মাছ ধরা পর্যন্ত বিস্তৃত মাত্র।

তাই দেশে থাকার সময়ে পানু যেমন আমাদের মধ্যে ছিল না, দেশ ছেড়ে এসে এতোদিন পরেও সে আমাদের মনের মধ্যে কোথায়ও ছিল না। অথচ সেই পানু যখন হঠাৎ এসে প্রথমদিনেই মায়ের নৈকট্য পেল, গৃহিনীর সংবর্ধনা পেল, তখন আমাকে ভাবতেই হল : কেমন করে হয় ?

স্বজন-পরিজন ও দীর্ঘপরিচিত সমাজ ছেড়ে আমরা অনেকদিনই এখানে এই পাণ্ডববর্জিত স্থানে এসে একা-একঘর-ভট্টাচার্য হয়ে বাস করছিলাম। বাবা গত হয়েছেন। আমরা তাই আরও একা-একা হয়ে গেছি। আমি তো জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বহুজনের ভিড়ে আর দু'চার জনের নৈকট্যে আপন মনের শূন্যতাকে উপলব্ধি করার মতো সময়ই আর পাই না। কিন্তু আমার মা ? তিনি ভিতরেও একা বাইরেও একা। তাঁর শূন্যতাকে আমরা স্পর্শ করতে পারিনা, সময় নেই। তিনি নিজে আশেপাশের পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে যে যোগাযোগ করবেন তা দু'টি পাতা ছাড়তেই শুকিয়ে যায়। আমরা যে 'বাঙ্গাল' ! তাই ঘটি-মহাসমুদ্রে আমরা, বিশেষ করে আমার মা নিজের চার ধারের অসীম শূন্যতাকে সেই পরিচিত হবার প্রচেষ্টায় ঘনকৃষ্ণবর্ণের হয়ে উঠতে দেখেছেন। মায়ের এই চাতক-চাতক মনের কাছে একফোঁটা জলের মতোই পানুর আবির্ভাব। পানুকে কেন্দ্র করে আমার মা উর্ণনাভের মতো তাঁর অতীত থেকে জীবনের সূত্র সংগ্রহ করে করে শূন্যতার মধ্যে ভর-ভরাট বর্তমানের চাদর বুনে চলেছিলেন। পানু হয়তো কিছুই বোঝে নি কেন সেই অপরিচিতা মহিলা এতো আপন হয়ে উঠেছিলেন, আমার স্ত্রী হয়তো অন্য কোনও অনুমান করে থাকবেন : পানু বোধহয় আমাদের কোন খুবই আপনজন।'

পানু কোনও চাকরি-বাকরি করে না ; সে যোগ্যতাও তার নেই। পানুদের পরিবার দারিদ্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই-এ ব্যাপৃত। বেলঘরিয়ার কোথায়, কোনও এক বাস্তুত্যাগী বস্তিতে পানু থাকে। ওর মা আছেন পানুরই সঙ্গে। পানুর দাদা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ; কিন্তু ওর বৌদি মনে করে যে বাড়তি কোনও মুখে অন্ন যোগানোর ক্ষমতা তাদের নেই তাই অনাদরের অন্নগ্রহণে আপত্তি করে ওর মা চলে এসেছেন পানুর সঙ্গে খিদে ভাগ করে নিতে! পানু ট্রেনে লজেন্স বিক্রি করে। সেই সময়ে শত শত ভাগ্যতাড়িত পূর্ববঙ্গের যুবকদের জন্যে ট্রেনের কামরাই ছিল একমাত্র ভরসা। ভাড়া লাগে না, যাতায়াতের কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, খরিদ্দাররা বসে দাঁড়িয়ে সদা-সর্বদাই মজুদ। গলা বাজাও আর ট্রেনের কামরার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ একদল বিচ্ছিন্ন-নির্বাসিত জনগোষ্ঠীর কাছে নানান রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য তুলে ধর। তাদের সকলেরই কমবেশি সময়ের অভাব তো আছেই। ডেলিপ্যাসেঞ্জার যে! তাই, যা সব বাইরে থেকে কিনে আনার সময় হয়ে ওঠে নি তার প্রায় সবই কামরায় এর-তার-ওর হাতে ফেরি হতে হতে বিক্রি হয়ে যায়। আজব বাজার এই ট্রেনের কামরা গুলো!

এখানেও কিন্তু সেই যোগ্যতার ব্যাপার সমানভাবে জড়িয়ে আছে। আর্থিক যোগ্যতা, বিচার-বিবেচনা করে দ্রব্য-নির্বাচন যোগ্যতা, কণ্ঠ-যোগ্যতা সময়-নিয়োগের যোগ্যতা। আরও কতো! লজেন্স-যোগ্যতাই সব থেকে কম দাবি করে ঃ একটা ঝোলা ব্যাগ, একটা বয়েম আর ক'এক টুকরো কাটা কাগজ হলেই শুরু করা যায়। পানু তাই বোধহয় লজেন্সেই ঝুলে পড়েছিল।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ট্রেনে যাও, ট্রেনে ফেরো। কখনও শিয়ালদহে কখনও হাওড়ায় কখনও ডানকুনি লাইনে। প্রথম দিকে এলাকা চিহ্নিতকরণের কোনও ট্রেড-ইউনিয়ন ঝামেলা ছিল না। কিন্তু চাহিদা-যোগান-বাজার ইত্যাদির অনিবার্য টানাপোড়েনে এলাকার বিলিব্যবস্থাও পরে আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। তা, সেই প্রথম যুগের স্বর্ণ-দিনে পানু যখন যে লাইনে যেতো কাজ করতে তখন সেই লাইনের আত্মীয়-স্বজন-চেনা-জানা জনেদের বাড়িতে দেখাশুনো করতে যেতো। মাঝে মাঝেই যেতো। পরিচয়কে একটু ঝালাই করে রাখা, একটু গাঢ় করে তোলা। কখনও বা একটু ছাদের নিচে

বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা আর পারিবারিক নৈকট্যের লোভ। আবার হয়তো সময়ে সময়ে গৃহের অন্নব্যঞ্জনের প্রতি মৃদু আকর্ষণ। এবং, হয়তো বা, কিছু অর্থের সাশ্রয় !

আর এই করতে গিয়ে ওর থলেতে লজেন্স ছাড়াও যা অফুরন্ত জমা হত তা টক-মিষ্টি-ঝাল নানান রকমের খবর। বিভিন্ন জনের, বিভিন্ন পরিবারের খবর। ও নিজে না চাইলেও খবর-হরকরার কাজটি ওর মাধ্যমে ঘটে যেতো। তাই অনেকে ওকে পছন্দ করত, অনেকে পছন্দ করত না। ওকে না পছন্দ করার আরও অনেক কারণ ছিল। যারা একটু সমৃদ্ধ, মোজায়েক-মেঝের মালিক তারা হঠাৎ হঠাৎ ওর আবির্ভাবে বিব্রত বোধ করত। ও সেখানে আর যেতে পছন্দ করত না। অনেকেই পানুকে প্রার্থী বলে এড়িয়ে যেতো। ওর অত্যন্ত গ্রাম্য চলন-বলন, ট্যারা চাউনি, অসংস্কৃত পোশাক-আশাক আর নিম্নবর্গীয় জীবন-রসদ-সংগ্রহ প্রক্রিয়া অনেকের কাছেই অবহেলা আর অবজ্ঞার হেতু বলে প্রতীয়মান হত। এ-সব অবশ্য পানু আমাকে অনেক পরে বলেছে।

পানুকে আমার তখন ভাল লেগেছে। নিজের বিষয়ে ওর একটা সহজ-সরল মূল্যায়ন ছিল। নিজের সম্পর্কে ওর কোনও ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। ও যে কোন কেউ-কেটা হবার জন্যে জন্মায় নি, ওর যে অত্যন্ত সাধারণ থেকেও সাধারণ জীবন তা ও পরিষ্কার ক'রে একরকম জেনেই গেছিল। তাই যাঁদের ও আপন বলে মনে করত, বাড়িতে যেতো, তাঁদের অনেকের কাছেই আপ্যায়নহীন নিষ্ক্রিয় ভাবলেশহীন ব্যবহার পেত। তার জন্যে তাঁদের বিরুদ্ধে কখনই ও কোনও অভিযোগ করে নি। এমন কি যাদের সঙ্গে ওর ছেলেবেলার অনেকগুলো অনাবিল সকাল সন্ধ্যা কেটেছে তারাও এখন যেন কেমন হীন বলে মনে করে। ও যে ফেরিওলা তা নিয়ে ওর নিজের কোনও হীনমন্যতাবোধ নেই ; অথচ ওর সঙ্গে মেলামেশা ছিল কিন্তু এখন এড়িয়ে চলে এমন অনেকের মনেই তা আছে। ও কেমন যেন একটা শূন্য-দৃষ্টি নিয়ে এ-সব কথা আমাকে বলেছে। জ্বালা নেই ; যেন ঘটনার বিবরণ মাত্র। বিরক্তি নেই কারো প্রতি, যেন সব নৈর্ব্যক্তিক। অভিযোগ নেই, নেই অভিমান। আর সেই জন্যেই আমার ওকে ভাল লেগেছিল।

পানু শুধু আমার মাকেই আপন করে নিয়েছিল তা নয়, ও অনায়াসেই কখন যেন আমার স্ত্রীরও অনেক স্নেহের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। এখন আমি বাড়িতে আছি কি নেই সেটা আর কোনও ব্যাপারই নয়। ও আসে সহজভাবে, আপনভাবে যেন নিজের লোকের কাছেই ও আসছে, যাচ্ছে। এখন ওর অবস্থান আর মিনিটের মাপে সীমাবদ্ধ নেই ; ঘণ্টার হিসেবে ওর উপস্থিতি। অপরাহ্ণে এসে ও অনায়াসেই রাত্রের খাবার খেয়ে নিজের তল্পি-তল্পা গুছিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে এমন ঘটনা এখন প্রায়ই ঘটে। সকলেরই তো কাজ থাকে ; মা সেলাই-পত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না-হয় চাল বাছা খই বাছা এবং এই সব কাজের মধ্যে মধ্যে এবং বাইরেও একান্তভাবে নাতি-নাতনীদের সঙ্গ দেওয়া, দেখাশুনো করা। কতো কাজ। চুপচাপ বসে থাকার মতো মহিলাই নন আমার মা। তার মধ্যে পানু সময়ের ভাগ বসাতেও কুণ্ঠা করে না ; মা'ও বিরক্তি প্রকাশ করেন না। আমার স্ত্রী ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পন্ন করার পক্ষপাতী ; কোথায়ও কোনও কাজেই ফাঁকি দেওয়া তাঁর স্বভাবে নেই। তার মধ্যে উল আর উল-কাঁটা, কুরুশ অথবা কোনও রিফুর কাজ তাঁর দিনান্ত-নির্ঘণ্টের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে মায়ের পাশে বসে চাল-বাছা, খই বাছায় সামিল হওয়া তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে পড়ে। যেন মা সঙ্গ পান, একাকী মনে না করেন। আলমারি গোছান, ট্রাঙ্ক নোতুন করে সাজান, আসবাবপত্র পরিচ্ছন্ন করে করে গুছিয়ে রাখা। এবং, এখানেও, সেই ছেলেমেয়ের খিদমত খাটা, আদর-আপ্যায়ন করা, ঝগড়া বিবাদ মেটানো, এ সবও তো চব্বিশ ঘণ্টার নির্ঘণ্টের মধ্যে পড়ে। এই সদা মুখর কর্মস্রোতের মধ্যে পানু একটি মানসিক স্তূপ হয়ে ঠায় বসে বসে থাকত আর কখনও অন্যের কথা শুনতো। মাঝে মাঝে আমার মনে হত ও যেন বেশ অনধিকার প্রবেশ করে ফেলছে। একান্ত করে পারিবারিক নৈকট্য পেতে দেরি হয়ে যেতো, ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে পড়াশুনো খেলা-ধুলো করাতে হত। তাই সেই বিরক্তি প্রকাশ করতে কখনও স্ত্রীকে ডেকে এনে যখন কিছু বলতে গেছি তখন তিনি বাধা দিয়ে বলেছেন ঃ আহা অমন করে ব'ল না! অনেক কষ্ট করছে ছেলেটি, কোথায়ও তো দু' দণ্ড বসে ঘরের শীতল আরাম পায় না, একমাত্র এখানেই যা একটু বেশিক্ষণ

থাকে। আর আসেও তো রোজ রোজ নয়, দু'মাস তিন-মাসে একদিন। তুমি কিছু বল না। বেচারি!

অবাক হয়ে ভাবি। ভাবি পানু এদের কোন তন্ত্রীতে ঝংকার তুলেছে? তুলতে পেরেছে? স্নেহ নিম্নগামী জানতাম। তাই আর কথা বাড়াতাম না। এই তো সেদিন পর্যন্তও এক অচেনা-অজানা, একেবারেই অপরিচিত একটি ছেলে ছিল ওদের কাছে। আর এখন একেবারে বেচারা?

আমার মাকে ও বলত ঠাকুমা আর স্ত্রীকে কাকিমা। বয়সের হিসেবে বৌদি বলার কথা। কিন্তু আমার দৈর্ঘ্য এবং স্ত্রীর প্রস্থ-সহ গাম্ভীর্য সম্ভবতঃ পানুর নিজ দেহের ক্ষীণতার মাত্রায় 'বৌদি' সম্বোধনে বাধার সৃষ্টি করে থাকবে! তাই কাকিমা বলত। অথবা গ্রামের কোনও অতীত পারিবারিক সম্পর্কে যা ওর মনে রাখার দায় ছিল নাআর ওর মা হয়তো তা ওকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকবেন। তা সত্বেও আমার স্ত্রীর এতখানি স্নেহ ও অপত্য আমার কাছে দীর্ঘ দিন অপরিষ্কার ছিল। মায়ের স্নেহের কারণ বেশ সহজ করেই বুঝে নিয়েছিলাম। অতীতের স্মৃতিচারণ সব সময়ই একজন শ্রোতা খোঁজে। মাধ্যম না হলে অতীত-অবগাহন একঘেয়ে বর্ণহীন হয়ে পড়ে। আর বৃদ্ধ বয়সে অতীতটাই তো প্রধান হয়ে ওঠে; বর্তমান যখন আর কিছুই দেয় না জীবনকে, তখন ছোট-বেলার মাঠ-ঘাট জল-জঙ্গল, স্বজন-পরিজন অনেক বেশি আপন হয়ে ফিরে ফিরে আসতে চায়। আমার এই অনুমান যে সঠিক তা অনায়াসেই প্রমাণ হয়ে যেতো যখন দেখতাম যে মা এমন এমন লোকের ছোটবেলার কথা পানুকে বলতো, এমন এমন ঘটনার বিবরণ দিতো যা পানুর নয়, পানুর মা-মাসি, বাবা-কাকাদের জানার কথা। পানু হা করে সব শুনতো, যেন গোগ্রাসে গিলতো। মা নিজে নিজেই কখনও সচেতন হয়ে উঠতেন : তুমি জানবে কি করে? তখন তো তুমি জন্মাও নি; অথবা, তখন তো তুমি একেবারেই শিশু, ইত্যাদি। কিন্তু অতীততর্পণে তাতে কোনও বাধা পড়তো না; আবার মা হারিয়ে যেতেন সেই তাঁর গ্রামের পরিবেশে।

কিন্তু আমার স্ত্রী? ভারত বিভাগের যাবতীয় যন্ত্রণা আকণ্ঠ পান করেছেন তিনি। উন্মূলিত পরিবার, নিঃস্ব রিক্ত উদ্বাস্তু অস্তিত্ব, আষ্টে-পৃষ্ঠে লেপ্টে-থাকা দারিদ্র্য, স্বজন হারানোর ব্যথা, অভুক্ত-অর্ধভুক্ত জঠরের

যন্ত্রণা—সবই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে। তার পাশাপাশি তিনি দেখেছেন অন্নসংগ্রহের চেষ্টায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনান্ত জীবনান্ত পরিশ্রমের চেহারা। চাকরি নেই, বাসস্থান নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, একটু সহানুভূতি নেই—এই নেই-নেই এর বিবর্ণ মিছিলে ওষ্ঠাগত প্রাণ বহু যুবককে, বহু পরিবারকে তিনি অত্যন্ত সামনে থেকে দেখেছেন, কাছে থেকে অনুভব করেছেন তাদের অন্তর্জ্বালা। তাই পানুকে তিনি এ-রকম একজন জীবন সংগ্রামী হিসেবেই দেখেছেন। মনের সজল সমতলভূমিতে পানুর নম্রনত সন্ত্রস্ত আনাগোনাকে তাই তিনি প্রথম থেকেই সহানুভূতির বারিসেচনে সরস করে পেয়েছিলেন।

এবং ক'দিনের পরিচয়েই এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পানুর নিজের মুখে বলা বিবরণ। দমদমে আমাদের আত্মীয়দের কাছে পানু আমার বিষয়ে অনেক কথা শুনেছে, শুনেছে শেওড়াফুলীতে অন্য আত্মীয়দের কাছে। আমার জীবনের সংগ্রাম-সংঘর্ষ প্রস্তুতি-উত্থান ওকে মোহিত করেছে, প্রভাবিত করেছে। পানুর মতোই আমি যে অত্যন্ত ছোট-অস্বীকৃত-দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবন যাত্রা থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে প্রস্তুতি আর প্রাপ্তির সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে এসেছি তা হয়তো ও অনেক বাড়িয়ে অনেক ফাঁপিয়ে বলা বৃত্তান্ত থেকে জেনেছে। তাই আমার প্রতি পানুর একটা সভয় শ্রদ্ধা, একটা সমীহ-সম্মান তৈরি হয়ে গেছে। সেজন্য আমার সামনে ও কেমন যেন স্বাভাবিক হতে পারে না, গুটিয়ে যায়, সঙ্কোচিত বোধ করে। এ-সব ওর কাকিমা ওর কাছ থেকে জেনেছে। জেনেছে যে পানুর মনেও আকাঙ্ক্ষা আছে, বড় হবার চেতনা আছে, সুখ এবং সম্পন্নতার প্রতি আগ্রহ আছে। বিশেষ করে পানু তার মাকে একটু শান্তি দিতে চায়, একটু সচ্ছলতা দিতে চায়। তাই ও সেই সকাল থেকে শুরু করে রাত গভীর পর্যন্ত কাজ করে যায়। কিন্তু এতো ফেরিওলা হয়ে গেছে এখন ট্রেনে ট্রেনে যে প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর আঘাতে ওর পক্ষে বেশি বিক্রি এবং সুতরাং বেশি উপার্জনের সম্ভবনাই আর নেই। দিশাহীন দৈনন্দিনতার বেড়াজালে ওর ভিতরের বাসনাগুলো মার খায়; ওর সামনে অন্য কোন পথও তেমন ধরা পড়ে না যে পথে ও নিজের সার্থকতাকে খুঁজে নিতে পারে। ওর নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা-অভিজ্ঞতা ওর জীবনের যুদ্ধে জয়ী হবার মতো অফুরন্ত তো নেইই, প্রয়োজনেরও কম আছে বলে ওর মনে হয়েছে। বুদ্ধি

দেবার মতো কোনও বন্ধু নেই, আর্থিক সহায়তা দেবার মতো কোনও উৎস নেই, এগিয়ে যাবার মতো কোনও দিক্-নির্দেশ নেই। তাই ও নিজের কাছেই এখন প্রতিনিয়ত মার খেতে খেতে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। ও যে এখানে আসে সে একটু শান্তি পাবার আশায়, একটু উৎসাহ যা ওকে আবার সতেজ করে তুলতে পারবে, একটু সহানুভূতি যা ওর মরু-প্রায় যৌবনকে সরস করে তুলবে। এ-সব কথা ও নিজে বলেনি ; ওর মনের গভীরে যে দাহ, যে যন্ত্রণা, যে নিরাশা ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছে আমার স্ত্রী তাকে আপন মনের চেতনা দিয়ে উদ্ধার করে নিয়েছেন। তাই সে পানুর উপর বিরক্ত হতে পারে না ; পানুকে অবহেলাও করে না। সময় দেয়, দু'চারটে সহানুভূতিব কথা বলে, সামনে যথাসম্ভব খাবার এগিয়ে দেয়। অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে আলোর আকাঙ্ক্ষায় এই যে পানু আঁকু-পাঁকু ক'রে হাত বাড়িয়ে ফিরছে সেই পানুকে আমার স্ত্রী দেখতে পেয়েছেন।

পানুর সঙ্গে আমি যেটুকু কথা বলেছি তাতে মনে হয়েছে যে সে অত্যন্ত ভীরু, অজ্ঞাত-অপরিচিত পথে পা ফেলতে ভয় পায়। পানুর কল্পনা খুবই দরিদ্র, সীমিত, ক্ষুণ্ণ। তাই ভবিষ্যৎকে নিয়ে কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ওর পক্ষে অসম্ভব। পানুর মধ্যে জেদ নেই, অহংকার নেই, নেই তেজের আগুন। তাই ও জোর করে কোনও কিছুর পিছনে উঠে-পড়ে লাগতে পারে না। যুদ্ধকে ও ভয় পায়, সংঘর্ষকেও এড়িয়ে যেতে চায়।

কিন্তু ওর মধ্যে আছে বিনয়, আছে মান্যতা আছে নির্দেশপালনের মতো নিষ্ঠা। পানু পরিশ্রমী, অক্লান্ত কাজ করার মানসিকতাসম্পন্ন, সৎ। এসব গুণ ওকে ওর আশা পূরণে সাহায্য করতে পারত যদি ওর নিজের জীবন নৌকোয় একজন সক্ষম হাল-ধরার মতো কেউ থাকত। ওর দুর্ভাগ্য তেমন কেউ ওর নেই। ওর মা আছেন। তিনি অবশ্যই স্নেহ-ভালবাসা দানে যতটাই সক্ষম ততটাই নির্দেশ দানে অক্ষম। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া প্রায় স্বাভাবিকভাবেই হয় নি, বাইরের জগতের সঙ্গে মোকাবিলার সুযোগ কখনই আসে নি। পুরুষ নির্ভর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হঠাৎই কর্কশতার সামনাসামনি হয়ে পড়েছেন, একেবারেই যখন একা, স্বামীহীনা। আর ছিল পানুর দাদা। সে চাকরি করে, জীবনে মোটামুটি রকমের প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেই সংসারে মা এবং ছেলের স্থান হয় নি ; বোঝা বলে মনে হয়েছে

এদের। ওরা তাই একবার দেশ থেকে বিতাড়িত, একবার স্বজন দ্বারা অস্বীকৃত। জীবনের প্রতি আস্থা রাখা এমন অবস্থায় কষ্টসাধ্য। স্বাভাবিক, অবধারিতই ঘটেছে। বিদ্রোহী হতে পারে নি; অদৃষ্ট মেনে নিয়ে সমর্পণ করেছে নিজেদের।

এই সব কথা যখন ভেবেছি তখন বার বার আমার নিজের মায়ের কথা মনে এসেছে। একজন মহিলামাত্র নন, নন একজন স্ত্রী, আমি আমার মাকে দেখেছি যোদ্ধার স্বরূপে, সৈনিকের মনোবলে। যখন সব গেছে বলে চারদিকে আর্তনাদ উঠেছে, যখন অতীত হারিয়ে গেল আর ভবিষ্যৎ অন্ধকারের আবরণে নিঃসীম ঢাকা পড়ে আছে, তখনও আমার মা ভেঙে পড়েননি। নোতুন করে অ-দৃষ্ট ভবিষ্যতকে গড়ে তোলার জন্যে যেন কোমর বেঁধে, বুক চিতিয়ে, মনকে এক-দৃষ্টি করে সৈনিকের মতো সদা সতর্ক থেকেছেন। সে ইতিহাস আমার জানা, যে যুদ্ধে আমিই ছিলাম মায়ের প্রধান সিপাহী। আমাকে তিনি ব্যবহাব কবেন নি, ক্রমশ তৈরি করে দিয়েছেন। সেই আমার ভয়ংকর আঠারো বছরের দিনগুলোকে এই মহিলা ভট্টাচার্য্য যেন অন্য এক কবির মতোই দেখতে পেয়েছিলেন।

পানুর দুর্ভাগ্য হেমলতা তার মা নন।

* * *

আজ প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল পানু আর আসে না। কেন আসে না তা আমার অজানা। ইত্যবসরে আমার মা চলে গেছেন, স্ত্রীও অপেক্ষা করে থাকেন নি। একজন ছিয়াশির জানুআরিতে, অন্যজন সাতাশির। জীবনের যুদ্ধ, ঝড়-ঝঞ্ঝা সব এখন ইতিহাস। ক্ষান্তবর্ষণ রুদ্র-প্রকৃতির গ্রীষ্ম-অপরাহ্নের ঠাণ্ডাশীতল আবহাওয়ায় আমি এখন স্মৃতি নিয়েই বেশি সময় কাটাই। তাতেই বুঝি যে বার্ধক্য আমার এই ষাঠ-ঊর্ধ্ব জীবনকে স্পর্শ করে ফেলেছে। পানুর কথা মনে হয়। হয়তো সংসার পেতেছে তাই সময় পায় নি; হয়তো মাতৃহীন জীবনে নোঙরহীন দিক্‌শূন্য ঘূরপাক্ খেয়ে চলেছে। এমনও হতে পারে পানু তার আশা-পূরণের শান্ত প্রাপ্তিতে দিনান্ত-প্রায় জীবনের অবশিষ্ট সুখটুকুকে একান্তেই উপভোগ করছে। পানুর কথা মনে পড়তে কেমন যেন স্বাভাবিক ভাবেই আমার একটি ছোট্ট সংসারের কথা মনে হল।

ছোট্ট ঘর। একটু দাওয়া। পিছনে একটুকরো জমির-ফালি। সেই জমিতে লাউ-কুমড়োর মাচায় সতেজ সবুজ গাছে তাজা-চিকন ক-একটি ফল। লাউ-এর ডগাগুলো টালির চালায় ঊর্ধ্বমুখ বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলেছে। যেন ওরাই পানুর প্রতিভূ হয়ে ভবিষ্যৎকে জয় করতে এগিয়ে চলেছে। চ্যালা করা বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরের সামনের তুলসী গাছটি বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। ইঁটের বেদীতে মাটির প্রলেপে যেন যত্নের পরিচ্ছন্ন আভা! কোণের দিকে দু'টি গোলাপ গাছে বেশ ক'টি গোলাপ ফুটে রয়েছে। অন্য প্রান্তে থোকা গাঁদার অনেকগুলি গাছ আর তাতে অফুরন্ত ফুল আর কুঁড়ি। ভাবতে আমার বেশ ভাল লাগছিল। দাওয়ায় মাদুর পেতে একটি ছেলে একমনে বই পড়ছে, অথবা অঙ্ক কষছে। পাশে পানু বসা। পড়ন্ত-শরীরে দিনান্তের ছাপ। আর এসবের মধ্যে যিনি সদাজাগ্রত সদাই উপস্থিত সেই পানু গৃহিনীকে কোথায়ও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু জানা যাচ্ছে পাশের রান্না ঘরের কড়াই থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসা ব্যস্ততার শব্দে!

এমনই যেন হয়।

———

।। মহিলা কামরা ।।

হন্ত-দন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। দেরি হয়ে গেছে। প্লাটফর্মের শেষ ক'টি ধাপ প্রায় লাফিয়ে লাফিয়েই পার করেছি। ট্রেনের প্রবেশ-রত মুণ্ডটা অনেক দূর থেকেই দেখেছিলাম। তাই পদদ্বয়ের চঞ্চলতা আনুপাতিক বাড়াতেই হয়েছিল। আকাশে ঘনকালো মেঘ। এই-নামে-তো সেই-নামে করে ঝুলে গেছে অনেকক্ষণ ; দু' একটা ফোঁটার চাবুক এর মধ্যেই কষিয়ে দিয়েছে। ছাতা-বার করার অবকাশ নেই ; তখন আর 'সেকেন্ড' মাত্র নষ্ট করার মতো কোনও সেকেন্ড ট্রেন নেই। ট্রেন ক্রমশই মন্থর হয়ে হয়ে যেন আমার গতিকে দ্বিগুণিত করতে উত্তেজিত করছিল। প্রথম দিকের দরজাগুলোতে কোনও সম্ভাবনামাত্রও অবশিষ্ট নেই। অপেক্ষমানেরা সম্ভাব্য সমস্ত স্থানকেই বুকে পিঠে লেপ্টে নিয়েছে। জুতোয় ঢাকা বুড়োআঙুল। তাই বলতেই হয় যে জুতোর ডগাটি স্পর্শ করানোর মতো 'জুত্যাগ্র' মেদিনীও চোখে পড়ল না। পরিচিত ব্যক্তিদের কাউকেই দরজায় দরাজ-দিল দেখলাম না যে আদর করে কোমরে হাত দিয়ে ঝুলিয়ে নেবে। বাধ্য হয়েই পদদ্বয়ের গতিকে বাড়িয়ে দিলাম। যথাসম্ভব। ট্রেন ছেড়ে দিল ; ধীর গতি গড়ানে ট্রেন। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ততক্ষণে আমার অবস্থা দেখেই বোধহয় খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুৎ-চমক এবং সঙ্গে সঙ্গেই হৃষ্ট-পুষ্ট বৃষ্টি ফোঁটার হাততালি। এবং ? একি স্বপ্ন না মায়া ? প্রশস্ত দরজা, প্রশস্ততর মেঝে। এবং উচ্চকিত লম্ফমান তির্যক বৃষ্টি ফোঁটার আহবান। চোখে পড়া মাত্রই হাতের কাজ হাত করল, পায়ের কাজ পা। হ্যান্ড গেল হ্যান্ডেলের আকর্ষণে আর একটি পা অপরটিকে টেনে তুলল ট্রেনের মধ্যে। এক ঝটকায় আমি ট্রেনের ভিতরে ! চোখের সামনে, এতো কাছে রামধনু কি করে এলো ? স্বপ্ন ভঙ্গ হতে দেরি হল না ; চুলের জমা জল ঝাড়তে গিয়ে সামনে ডাইনে এবং বামে দৃষ্টি পড়ল। চক্ষুস্থির হয়ে গেল ! লেডিস্ ! এখন উপায় ? কল্পনায় চোখের সামনে বামাদের বাম-দৃষ্টি দেখতে পেলাম, দেখতে পেলাম হাওড়া স্টেশনের দরজার সামনে লাঠি হাতে খাকি উর্দি আর কালো

কোট। তার পরেই ভেসে উঠলো নির্জন কক্ষ আর শালপাতার সঙ্গে মাটির ভাঁড় !

এই কাননের দৃষ্ট স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল সহসাই। চোখের সামনে এবারে ভেসে উঠল তীক্ষ্ণ-চক্ষু কুঞ্চিত-ভ্রূ সহযাত্রিনীদের ছবি। সকলেই যেন একই সঙ্গে আমাকে জরিপ করে চলেছে—মেট্রিক সিস্টেমে এবং মানসিক পরিমাপে। আমি যেন ওদের সন্দেহ, ধিক্কার, টিকা-টিপ্পনি সবই দেখতে আর শুনতে পাচ্ছিলাম। পায়ের তলায় ধরিত্রী নেই আছে স্টিলের মোড়কে আঁটা ট্রেনের মেঝে। দ্বিধা হও বললেই সে হবে না। তাছাড়া আমি কোনও 'ড্যামসেল্ ইন্ ডিস্‌ট্রেস্' নই। একেবারেই এক ঈশ্বর বিস্মৃত, সরকার অস্বীকৃত, রেল ধিকৃত নিত্যযাত্রী মাত্র। মাতৃরূপী মহির চাইতে মাতৃভগিনীরূপী মহীয়সী মহিলা পুলিশের অনেক বেশি আপন হবার যোগ্য ! তাই প্রার্থনার পথ আমার নয়। নীরব, নতচক্ষু জল্পনার শিকার হয়ে স্থাণুর মতো দণ্ডায়মান থাকা ছাড়া নান্যপন্থা ঃ

জড়ত্বের কারাগারে বন্ধ হয়ে তাই মনকে স্বাধীনতা দিলাম ঃ বলা ভাল মন জোর করে স্বাধীন ভাবনায় ডুব দিল। মেয়েদের মনই যে চঞ্চল তাই নয়, পুরুষের অচঞ্চল অবস্থানে তাদের চঞ্চলতা বেশই হয়। কেউ যদি আমাকে মার্জনার বদলে সম্মার্জনার ব্যবহার করতে উদ্যত হ'ন তাহলে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ ঃ স্থিরোভব।

সেই প্রমীলারাজ্যে বা কামরায় দেরাদুনচালের ভাতের মধ্যে কাঁকরের মতো নিজেই যেন নিজের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছিলাম। সেই ভরভরাট অফিস-সকালে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, অফিসের ছোট-মেজ-বড় দরের আর কদরের সব কর্মী এবং স্কুলের-কলেজের শিক্ষয়িত্রীরাই আগু-পিছু করে কামরাটিকে বর্ণে-গন্ধে-সুষমায় ফুরফুরে করে রেখেছিল। কনিষ্ঠদের দণ্ডায়মান কলহাস্যমুখর যাত্রায় আমি যেন এক 'অযাত্রা'র মতো ছন্দ পতন ঘটিয়ে ফেলেছি। জানলার ধারে গম্ভীর-মুখ বয়স্কা মহিলা তাঁর মোটা বই-থেকে মুখ তুলে যখন ভারি কাঁচের চশমা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন, আমার অন্তরাত্মা তখন তার ত্রি-ডবল চোখকে সামলাতে না পেরে অন্যদিকে সরে গেল। 'পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে' ! উন্নত-নাসা, বয়-কাট চুলে শ্যাম্পুর উল্লাস ছড়িয়ে যে তরুণীর ঘাড়ে আমার দৃষ্টি ছিট্‌কে

পড়ল তাকে খাপ্-খোলা-তলোয়ার বলে সরে আসতে হল ! বাঁচার তাগিদে পাশে বসা নিরীহ দেখতে, মাতৃত্বের দ্যুতি-বিচ্ছুরিত এক ভদ্র মহিলাকে টিপ করলাম। নিজের চোখ যে একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে তা এর আগে কখনও বুঝিনি ; ওকে রাখি কোথায় ? তৎক্ষণাৎ ভিতর থেকে নির্দেশ এলো ঃ কেন বাইরে বিশ্বপ্রকৃতি নেই ? গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর, ট্রেনের সান্‌টিং ? নেই আকাশের ঘন কালো মেঘ ? ত্বরিৎ গতি পাখির পলায়ন ? আসলে একটা 'ম্যাগনেটিক্ ফিল্ডে'র মধ্যে তুমি নিজে একখণ্ড কাঁচা-লোহা বনে গেছ !

নিজেকে কেমন যেন দুর্বল মনে হল। ভিতর থেকে ধিকি ধিকি একটা ছি ছি যেন ক্রমশই চাকার আওয়াজের ছন্দে দুলে দুলে উপরের মনে উঠে আসছিল। সচেতন মনকে যতই ঘাড় ধরে বোঝাতে চাই যে অন্যায়টা তুমিই করেছো, ঐ সব বৃষ্টির তাড়া, হঠাৎ হ্যান্ডেলের হাতছানি, এই ট্রেনটি না ধরলেই নয়—এ সবই তোমার নিজেকে ধোঁকা দেবার কলা কৌশল, ততই সে যেন বিনম্র ব্যাখ্যায় আর নাকি-সুরের বাহানায় নরম হতে থাকে। সে নাকি বুঝতেই পারে নি যে ওটা একটা মহিলা কামরা।

"আপনি অত ধারে দাঁড়িয়ে তো একেবারেই ভিজে যাবেন, একটু ভিতরে এসে এই পাশে দাঁড়ান !" একটু হক্‌চকিয়ে গেলাম, সত্যিই কি কেউ আমাকে একথা বলল ? না-কি এটা আমার মনের মধ্যে বসে আমারই অন্তর বলে উঠলো ! সম্পূর্ণ ইচ্ছে একটু সরে গিয়ে বৃষ্টির তীক্ষ্ন বল্লম গুলোকে এড়িয়ে যাই ; পারছি না। আমার পায়ে কি প্যারালিসিস্ হয়ে গেল ? একেবারেই অসাড়-অবশ-অনড় হয়ে যেন ট্রেনের মেঝেতে একহাঁটু পুঁতে বসে গেছে ! "হাওয়ার দাপটে আর ট্রেনের ঝাঁকুনিতে তো ছিটকে নিচে পড়ে যেতেও পারেন !" এবারে যেন নির্দেশবাণীর উৎসটি খুঁজে পেলাম। উপস্থিত যাত্রিনীদের মধ্যে কেউ বললে ভাল হত কিন্তু বলেনি বলে আমার অবচেতন ধ্বনি তুলছে ! সামনের ঢেউ ঢেউ তরঙ্গ-ভঙ্গ ক'টি তরুণীর দিকে অভয়দৃষ্টির আশায় তাকালাম, কষ্টে উৎপাটিত একটি পা সামনে বাড়ালাম এবং দ্বিতীয়টিকেও সন্তর্পণে অনুসরণে বাধ্য করলাম। এই একপা-দুপা-তে তো কোনও বাধা এলো না। যেন প্রাণ আসল ধড়ে ! ত্রিপদী হয়ে একেবারে ধারে একটু আড়াল পেলাম। ছোটবেলায় দেখা আমাদের খড়ো ঘরের ছাঁচের

ধারে একটা গুটি-শুটি মিনি-বাচ্চাকে যেন দাওয়ায় উঠতে দেখলাম—সেও সেই বৃষ্টির হাত থেকে তার দেহকে বাঁচানোর আকৃতিতে অত্যন্ত বেশি বিনম্র-নত ছিল। তফাৎ অনেক—পদসংখ্যায় এবং প্রেক্ষিতে। মনের তো কোনও 'লজিক' লাগে না ; কল্পনা তো পাখা নির্ভর নয়!

ওদের কাছে কোনও অভয় বাণীই পেলাম না ; তবে ওদের তরুণ-চোখের গভীরে যেন সহানুভূতির সজল-ঝিলিক দেখেছিলাম। আমার দেখার ভুল ? হতেই পারে। সারাজীবনই তো যা দেখলাম বলে মনে করে এসেছি, পরে জেনেছি, তা সত্যিই দেখিনি। কোনকিছুকে অন্যকিছু দেখে দেখেই তো কাটিয়ে দিলাম। মনে হল যেন ওরা পরিষ্কার উৎসাহিত করল আমাকে আশ্রয়ে সরে যেতে, নিরাশ্রয় বৃষ্টি-বিদ্ধ অবস্থান থেকে। ওদের চোখে যেন ওদের কণ্ঠ শুনতেও পেলাম, "আহা! সরে আসুন না, এই এদিকে। ভিজবেন না!

"যতসব সুযোগ-সন্ধানী, অসৎ আর ধান্দাবাজের জন্যে জীবনটাই যেন তছনছ হয়ে যেতে বসেছে"—কানের পিছনে যেন বোমা ফাটার শব্দ পেলাম। আবার দু'পা পিছিয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই টার্গেট হয়েছি কোনও সংগ্রামী মহিলার। এবারে আর অন্তরুত্থিত শব্দ নয় কর্ণ-পটাহ-বিদ্ধ কণ্ঠ! জন্মজ কবজ কুণ্ডল নেই, বর্ম-আবৃত দেহ নয়, মনে আঘাত লাগলে মর্মে বিদ্ধ হয়, অস্তিত্ব কর্পূর করে দেবার মতো কোনও দৈবলব্ধ 'বর' কখনও পাই নি, দীর্ঘ কোনও সাধনদ্বারা ঋষিতুল্য অন্তর্ধান প্রক্রিয়া আয়ত্তে নেই। এই বি-সম উপস্থিতিতে বিষময় বাণী হজম করার মতো হজমি নেই সঙ্গে। কি করি উপায় ? দেব লাফ্ ? একেবারে বাইরে, ধাবমান ট্রেন থেকে গতিহীন স্থির দেশ-মাতৃকার কোলে ?

"দেশবাসীকে যদি নেতাশূন্য করে ফেলা যেতো তাহলে যদি বা শান্তির দেখা পাওয়া যেতো"—সেই কণ্ঠ! যাক, তাহলে টার্গেট সেই সর্বজনস্বীকৃত রাজনীতির 'রেঞ্জেই' সীমাবদ্ধ আছে! 'নহি আমি, নহি আমি'। অন্তর থেকে স্বস্তির বাণী ভেসে এলো ; মনের অস্থিরমতি চিন্তা ভাবনাগুলো যেন 'পাবলিক' হয়ে হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সবাই দেখছে সবাই জেনে যাচ্ছে! সামনের সেই তারুণ্যের ঝাঁক নিজেদের কস্তুরীমন প্রাণপ্রাচুর্যকে যেন ঝরনার মতো পাকে পাকে ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে উপভোগ

করে চলেছে। ওদের প্রাণশক্তির বিপরীতে ট্রেনের গতিশক্তি শ্লথ হতে হতে একেবারেই থেমে গিয়ে স্থিতি শক্তিতে রূপান্তরিত হল। ভয় হল, নেমে যেতে বলবে না তো?

পাশের প্রথম বেঞ্চে বসা কোণের দিকে দুই মহিলা ঘরোয়া বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলেন। চেহারা দেখে মনে হল তাই হবে এবং যেন শুনতেই পেলাম। সন্তানদের লেখাপড়া, চাকরি, ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা হচ্ছিল নিশ্চয়ই কর্তার কথা কি প্রকাশ্যে আলোচনা হতে পারে? মনে হল বাধা কোথায়? সমর্থন এবং অংশগ্রহণের অভাবের কারণে রজনীতির তত্ত্ববিষয়টি মরুপথে, মহিলা কামরায়, দিক হারাল। পুরুষের কামরায় হলে কি হত তা একবার ভাবতে গেলাম; ভাবনা এগুতে পারল না, কলেজের ক্লাস আর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লন' কানে ভেসে এলো। প্রথমটিতে সকলেরই অনাকর্ষণ আর দ্বিতীয়টিতে সার্বিক আগ্রহের বিষয় বেশ হাসিঠাট্টার টক্-ঝাল মিশিয়ে পরিবেশিত হচ্ছিল। "জি. এম. পল-সাইন্সের ক্লাস নিতে সারাক্ষণ বিনতাকেই একমাত্র উপস্থিত ছাত্রী বলে মনে করেন! সালোয়ার-পাঞ্জাবির ভিতর থেকে সেতারের ঝালায় হেসে উঠলো মেয়েটি! "তবে কি তুইই একমাত্র ছাত্রী হলে খুশি হতিস্?" ঝাল ঝরে পড়ল হালকা কণ্ঠে, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে।

"আর, এস. পি. তো ক্লাসরুমের পিছনের দেওয়ালে ব্রহ্ম খুঁজে বেড়ান! তার দৃষ্টিতে সুদূরের অন্বেষণ, কাছের আমরা যে বাস্তব তার প্রতি কোনও ধ্যান নেই একেবারেই।" "মেয়েদের দিকে তাকাতে ভয় পান, যদি ধ্যানভঙ্গ হয়!" খিল্‌খিল্ হাসির এক ঝলক ফোয়ারা ছিটকে গেল! "মনে করার 'নেমানিক' তালগোল পাকিয়ে গেলেই একঘর ছাত্রীর মধ্যে কি অবস্থা হবে সেটা ভেবে দেখেছিস্?" "তপতী তো টি. কে. টি. বলতে অজ্ঞান; নোট সংগ্রহের জন্য সর্বক্ষণ স্টাফরুমে ঘুর ঘুর করছে!" "নোট না 'নেট' তা কি তুই জানিস? এবং কমপিটিটর অনিমা; তপতীর সাধ্য নেই ঘুড়ি নামানোর, অনেক উর্ধ্ব আকাশে উড়ছে!" নিজেদের মধ্যে এই খুনসুড়ির চচ্চাড়ি তৈরি হচ্ছিল কলেজীয় কোণে।

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রান্তে প্রবীর-প্রদীপ-মৃণালদের কথা কণ্ঠের 'মডুলেশনে' চোখের ইশারাতে আর গ্রীবার হেলনে বেশ জমজমাট হয়ে ছিল। ক্লাসরুমের চাইতে 'ক্যানটিন', 'ক্যানটিন' থেকে লন হয়ে বিকেল, বই-এর রেফারেন্স থেকে

নোট-এর লেনদেন, সম্ভাব্য প্রশ্নের ইঙ্গিত থেকে শিক্ষকের আকর্ষণ সবই সেখানে ঘুরে ফিরে স্থান পাচ্ছিল। নাম করা অধ্যাপকদের প্রীতি যে ক্লাসের কাষ্ঠ কেদারার চাইতে স্টাফ্-রুমের আরাম কেদারার প্রতি সমধিক, বিষয়-এর চাইতে অনেক শিক্ষকই যে বিষয়ীর প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দিয়ে থাকেন এবং ইত্যাদি বিষয় টুপ্‌টাপ্ করে ওদের আলোচনার চিরচঞ্চল সরসী-কে বাঙময় করে তুলছিল।

বৃষ্টির জল ততক্ষণে জামা পার হয়ে গেঞ্জিকে আপন করে আমাকে বেশ স-জল করে তুলেছে। পায়ের পাতায় ভিজে ঘাসের অনুভব হচ্ছে; মোজা যেন পদদ্বয়কে আন্তরিক এবং সরস আলিঙ্গনে অশেষের উপলব্ধিতে ভরপুর করে তুলেছে। মাথার উপরের শণের ছাউনি বেয়ে নাক-মুখের ছাঁদনাতলায় টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে নামছে। শরীরের মধ্যে যন্ত্রপাতিগুলো নেহাতই আপন নিয়মে নড়াচড়া করে তাই তারা নিঃশব্দে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে। নিজের হাতে থাকলে কবেই তা বন্ধ হয়ে যেতো। একমাত্র যা আমাব ক্ষমতায় আছে বলে মনে হল তা আমার চোখের পাতা আর চোখের তাবা, চেখের মণি। তাকেই মাঝে মধ্যে, অন্যের অজান্তে, এধার-ওধার কবে চলন্ত স্থির-সান্নিধ্য গুলোকে দেখার চেষ্টা করছিলাম, বোঝার চেষ্টা করছিলাম, হঠাৎ কোন আক্রমণ কোন্ প্রান্ত থেকে আসতে পারে, অথবা পারে কিনা? একটা ধাক্কা দিয়ে ট্রেনটা আবার চলতে আবম্ভ করল, পরে ড্রাইভার মশাই 'হুইস্‌ল সংকেত দিলেন। সামনের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানো তরুণীরা এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ল। সামলেও নিল। আমার পা যে ট্রেনের স্টিলে, প্রোথিত ছিল না তা বুঝতে পারলাম ত্বরিতগতি পদসঞ্চালনে সক্ষমতা দেখে। এবং পুলিশের খপ্পবে যে তখনও পাড়িনি, হাতকড়ায় যে আমার হস্তদ্বয় নিশ্চেষ্ট নয় তা বুঝলাম দ্রুত হ্যান্ডেল ধরে টাল সামলাতে পারলাম বলে।

যদি পড়েই যেতাম? হঠাৎ মনে হল পড়ে গেলেই ভাল হত। তখন তো বিপদ-সময়, যারাই সামনে থাকে তারাই তো উদ্ধারকার্যে ব্রতী হয়। সবাই মিলে আমাকে ধরাধরি করে তুলে দিত। কানে ভেসে আসতো কতো কথা 'আহারে! বেচারি!' কেউ বলত 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। হয়তো কোনও সহানুভূতির কণ্ঠ ভেসে আসতো—'লাগেনিতো খুব?' অথবা অন্য কেউ, অন্যরকম, অন্যকিছু। সব ভাবনাগুলো আমার জলো হয়ে গেছে কেন?

ঘিলুর মধ্যে কি জল প্রবেশ করতে পারে? নিজের অস্তিত্ব যেন কেমন আচ্ছন্নের মতো মনে হচ্ছিল।

যখন সম্বিৎ ফিরে পেলাম তখন দেখি আমার চারধারে, আমাকে ঘিরে বহু লোক। 'জ্ঞান ফিরেছে, জ্ঞান ফিরেছে'—একটা 'কোরাস' শুনতে পেলাম। যেন অনেকখানি দুশ্চিন্তা হুস্ করে ঐ শব্দগুলোকে মাধ্যম করে বেরিয়ে এলো। চারদিকে তাকালাম। পাট করে চুল আঁচড়ানো মাথাগুলো যেন পাপড়ির মতো সাজানো। মাঝখান দিয়ে ঢেউতোলা এসবেস্টসের চালা দেখলাম। অনেকের চোখেই চশমা। আলোর ঝিকিমিকি, চশমার প্রতিফলন? 'আমি কোথায়?' 'এটা সিনেমা নয়, ডায়ালগ দেবেন না'—কে যেন তীক্ষ্ন করে ঝাঁঝিয়ে উঠলো। 'ট্রেনটা মিস করিয়ে দিলেন, এবারে 'লেট' অবধারিত।' সচেতন উঠে বসেছি, তাহলে সেই মহিলা কামরা?

একে একে সবই জানা গেল। দৌড়ে এসে হ্যাণ্ডেল ধরতে গিয়ে ফস্কেছি, পপাত ধরনীতলে, সপাটে। জ্ঞান আমার কোনও দিনই ছিল বলে মা-বাবা বিশ্বাস করেন নি, স্বজন পরিজনদেরও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আজ তাঁরা এই প্ল্যাটফর্মে থাকলে এতোজন সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির সাক্ষ্যে নিশ্চিত হতে পারতেন যে অতীতে আমার জ্ঞান ছিল। কারণ ওরা সকলেই সমস্বরে জানালেন 'পড়ে গিয়েই আপনার জ্ঞান হারাল'। পড়ে গিয়ে হারিয়েছিল না জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছিলাম সেই সুক্ষ্ম বিচারে আমার আর প্রয়োজন বোধ হল না। হারানোর মতো জ্ঞান যে আমার যে কোনও অবস্থাতেই ছিল সেটি প্রতিপন্ন হতেই আমি বেশ স্বস্তি পেলাম।

ততক্ষণে বৃষ্টি একেবারেই থেমে গেছে। আকাশে নীল দেখা দিয়েছে। রমনীয় বাতাস বইছে। মনে মনে ভাবলাম "ওরা বোধহয় এতোক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে!" কে যেন সেই অবস্থাতেও আমাকে বিদ্ধ করতে বলল, "বয়স তো কম হল না। লেডিস্ এ উঠতে গেলেন কেন?" অবাক হয়ে ভাবলাম, 'লেডিসে কখন উঠতে গেলাম? আমি তো ট্রেনে চড়তে গেছিলাম মাত্র!' অন্য একজন বলে উঠলেন—"আর কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছেন দাদা, ওদের আকর্ষণও যেমন মোহময় ওদের বিকর্ষণও তেমনি মোহমুদ্গর হয়, ছেড়ে দিন না!"

এক-পা দু-পা করে গৃহমুখী হলাম। সকলেরই দৃষ্টি-কেন্দ্র হয়ে উঠেছি,

জামা কাপড় ধুলো কাদায় লপেটা। ওরা আমার সেই বাইরেটাই দেখছে আর বিড়ম্বনাটা অনুভব করছে। আমার স্মৃতিতে তখনও সেই তরুণীত চন্দ্রিমারা তাদের কলকণ্ঠ জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে, তাদের হাস্যমুখর পর্যালোচনাগুলো টুপটাপ ঝংকার তুলছে।

লোককে ভূতে পায়, নিশিতে পায়, শুনেছি। আমি যেন অর্ধচেতনায় কেমন ভেসে ভেসে বাড়িতে ফিরলাম। হঠাৎ ঐ অবস্থায় আমাকে অসময়ে ধুলোকাদায় লপেটা হয়ে ফিরতে দেখে আমার গৃহিনী অবাক বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে হাঁ হয়ে গেলেন। মনে হল আমি বিশ্বরূপ দেখলাম। তিনি বললেন 'কি হল ?'

বললাম—"মহিলা কামরায় উঠেছিলাম !"

———

।। মেয়ের নাম বন্যা ।।

বন্যা অত্যন্ত সাধারণ ঘরের আটপৌরে মেয়েদের একজন। ওকে নিয়ে যে গল্প হতে পারে তা কেউই কখনও ভাবেনি, অন্ততঃ যতদিন বিদ্যালয়ের মাটি-ঘেঁষা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উপরে উঠছিল ততদিন সব মধ্যবিত্ত ঘরের লাল-রিবন বাঁধা, ঝুঁটি নাড়া কিশোরীদের মতোই উচ্ছল তরঙ্গে সকলের সঙ্গে তালে তাল রেখেই ও এগিয়ে চলেছিল। গানে আর ছবি আঁকায় বন্যার একটি প্রকৃতি-পুষ্ট ঝোঁক বা কুশলতা ছিল। সে তো অনেকেরই থাকে। মা-বাবা দুজনেই চাকরি করেন, এক দাদা আছে যে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে এক ধাপ আগে আগে চলে অভ্যস্ত। সচ্ছল সংসার, স্নেহের সচ্ছলতাও ঝরনার মতো ওকে সদাসর্বদাই সরস-শীতল-প্রাণবন্ত রাখে। এখানেও বন্যার কোনও বিশেষ দাবি ছিল না, কারণ অনেক সমগোত্রীয় সহপাঠিনীরাও অনুরূপ স্নেহ-সিঞ্চনে লালিত হয়ে থাকে।

বন্যা যে সাধারণ নয় তার প্রথম প্রকাশ ঘটল ওর জীবনে যখন প্রথম তারুণ্যের বন্যা এলো। অন্য অনেককেই যা উচ্চকিত-উচ্ছলিত করে বহির্মুখী করে তোলে সেই জীবন-সম্পদ বন্যাকে অন্তরমুখী করে যেন ক্রমশই শংখ করে তুলল। বাঙালী মেয়েদের মা-বাবা-রা তাদের জন্যে গান শেখার ব্যবস্থা করে থাকে, সামাজিক প্রয়োজনে, সাংস্কৃতিক কারণে এবং ক্বচিৎ সুন্দরের আরাধনায় সন্তানকে নিবিষ্ট করতে। বন্যাকে বয়স দিল কণ্ঠ-মাধুর্য, স্বভাব দিল অধ্যবসায় আর প্রকৃতি দিল আকর্ষণ-শক্তি। গানের সঙ্গে স্কুলের উচ্চস্তরে সাংগঠনিক শক্তি আর কল্পনার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেতে থাকল। বুদ্ধি আর বিচারের শ্রীবৃদ্ধি প্রতিটি শ্রেণী পরীক্ষার মূল্যায়নে শিক্ষিকাদের মনোহরণ করার মতো স্তরে পৌঁছে গেল।

সকলের মধ্যে থেকেও বন্যা আলাদা, সকলের মতো হয়েও সে স্বতন্ত্র অথচ সকলকেই সে সহজে ছুঁয়ে যেতে প্যারে, আপন করে নিতে পারে। বন্যা সকলেরই প্রিয়; ছোটদের মুখে মুখে বন্যাদি, সহপাঠিনীদের কাছে মধ্যমণি, বড়দের স্নেহের পাত্রী। ওর মধ্যে আলো আছে যা চোখ ধাঁধায় না, গুণ আছে যা অপরের আত্মসম্মানে নুনের ছিটে দেয় না, আর সব থেকে বড় কথা

ও যে অত্যন্ত ভাল গান গায় তার জন্যে ওর কোনও অহংকার নেই, গাইতে বললেই ও কণ্ঠসম্পদকে অপরের অনুভবের জন্যে খুলে দেয়, অকারণ বিলম্ব করে না, বাহানা বানায় না। বন্যা তখনও গল্প হয়ে ওঠেনি, আপন হয়েই ছিল ; অনেকেরই সপ্রশংস উল্লেখের পাত্রী হয়ে উঠেছে কিন্তু গল্পের বিষয় হয়ে ওঠেনি।

বন্যা শহরতলি ছেড়ে শহরে গেল পড়তে। যাতায়াত করে। পুরোনোকে সে ছেড়ে গেল না, যেতে দিল না, পারলও না। ভালবাসার টান ; স্নেহ-প্রীতির আকর্ষণ প্রাণের স্পন্দনকে স্বাভাবিক করে, সুন্দরের ছোঁয়ায় হাল্কা করে রাখে। তাই স্থানচ্যুত না হয়েও বন্যা নোতুন ক্ষেত্রে নিজেকে ক্রমশই মেলে ধরতে লাগল। ওর বুদ্ধির কোষে আছে অনুসন্ধানের তীক্ষ্নতা তাই ও পরীক্ষায় ভাল ফল করতে বিফল হয় না। বিজ্ঞান ওর বিষয়, কলেজে। শিল্প ওর সাধনা, জীবনে। রবীন্দ্রসংগীত ওর অস্তিত্বের সংগে রক্তসঞ্চালনের মতো স্বাভাবিক ; আত্মপ্রত্যয় ওর প্রকৃতিতে ঋষির মতো শান্ত দৃঢ়তায় দ্যুতিময়, কখনও প্রকাশের কণ্টকে অপরকে রক্ত ঝরানোর মতো তীক্ষ্ন নয়। ওর বন্ধুর কাছে শোনা একটা ঘটনা ঃ বন্যা তখন উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। ওদের বিদ্যালয় সমগ্র জেলার মধ্যে প্রশংসিত ; উচ্চ মান, পরিচ্ছন্ন এবং সুশৃংখল প্রশাসন, এবং শ্রেণীকক্ষের নিয়মানুবর্তিতা ছাত্রী ও অভিভাবকদের সমীহের কারণ। শ্রেণীর প্রধান প্রধান এবং প্রিয় ছাত্রীদের মধ্যে একজন হওয়া সত্ত্বেও বিলম্বে ক্লাসে প্রবেশের জন্যে বন্যা একদিন শাস্তি পেল। পিছনের বেঞ্চে বসার শাস্তি। নীরবে সে প্রথম সারির নিত্যকার স্থানটি ছেড়ে দিয়ে পিছনে চলে গেল, কিন্তু বসল না। দাঁড়িয়েই রইল। ঐ বেঞ্চে যে স্থানটুকু অবশিষ্ট আছে তা 'মিতা' বলে একটি মেয়ের পাশে। এই 'মিতা' অত্যন্ত অসুস্থ রকমের বড়লোকের মেয়ে, কথাবার্তায় চালচলনে সে তার পারিবারিক সম্পন্নতার জয়ঢাকটি সর্বদাই বন্ধুমহলে ধ্বনিময় করে রাখে, সে বহু ছেলের সংগে ঘোরাফেরা করে এবং পিছনের বেঞ্চে বসে বাইরের রাস্তায় দৃশ্যমান সেই সব বন্ধুদের সংগে ইংগিতে আর ভংগিতে, সুযোগ পেলেই, যোগাযোগ করে। এবং বন্যার বিশ্বাস মিতার মাথায় উকুন আছে। তাই সে মিতার পাশে বসতে রাজী নয়। এটাই তার দাঁড়িয়ে থাকার কারণ। রাশভারি শিক্ষিকার ব্ল্যাকবোর্ড-মুখী দৃষ্টি ক্লাসের দিকে ঘুরতেই তিনি বন্যাকে

দেখতে পেলেন এবং কেন না-বসে সে দাঁড়িয়ে আছে জানতে চাইলেন। 'মিতার পাশে আমি বসব না!' সমস্ত ক্লাস রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করছিল বজ্রপাতের। 'কেন?' 'ওর মাথায় উকুন আছে'। ক্লাসের সব ছাত্রীদের যেন দমবন্ধ হয়ে গেছিল, বিশ্বাসই করতে পারছিল না নিজের নিজের কানকেঃ মিতাকে যে এ-কথা বলা যায়, এবং তাও সর্বসমক্ষে এবং শিক্ষিকার সামনে—তা অভাবনীয়। 'দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না।' ক্লাসে স্থানাভাব ছিল; কিন্তু মিতার চোখ মুখ অসম্মানের আগুনে জ্বলে গিয়ে বিকৃত কুঞ্চিত-ক্রুর দেখাচ্ছিল। ক্লাস শেষ হলে মিতার দল অনেক জল ঘোলা করাব চেষ্টা করেছিল। বন্যা সেদিন আর একটি কথাও বলেনি, ঝগড়া বাঁধানোর সব চেষ্টাকে নীরব থেকেই পঙ্গু করে দিয়েছিল। মিতার সঙ্গে ওর কোনও ভাব ছিল না, তাই বিচ্ছেদের প্রশ্নটাই অবান্তর ছিল।

প্রাণিবিদ্যায় সাম্মানিক ছাত্রী। প্রথম পর্বের—পার্ট ওয়ানের পরীক্ষার মাঝখানেই পিতা-মাতা-নির্দ্ধারিত পাত্রের সঙ্গে বিয়েটা মেনে নিল! মা-বাবার ইচ্ছেয়, বা প্রয়োজনে, বন্যা বাধা দেয় নি। মা-বাবার প্রতি সন্তানের তীব্র কর্তব্যবোধ থেকে মেনে নিয়েছিল; শুধু জেনে নিয়েছিল বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ি থেকে পড়াশুনো চালিয়ে যাবার অনুমতি আছে কিনা, স্বামীর মত থাকবে কি না। সদর্থক উত্তর পেয়ে ও অনুত্তেজিত নৈমিত্তিক ভঙ্গিতে বিয়ে ব্যাপাবটা সেবে নিয়েছিল। এবং যখন ও পার্ট ওয়ান পরীক্ষার অবশিষ্ট দুইটি পেপার যথাসময়ে দিয়ে ফেলল তখন সকলেই অবাক বিস্ময়ে ওর প্রত্যয়ের দৃঢ়তার হদিস পেয়ে গেল। স্বামী বলেছিল, 'কি হবে পরীক্ষা দিয়ে? বিয়ে তো হয়েই গেছে। মেয়েরা তো বিয়ের বাজারে যোগ্য পাত্রের জন্যে পড়াশুনো স্কুল-কলেজ করে থাকে। তাহলে আর কেন?' অন্যান্য স্বজনেরা কেউই পরীক্ষা পর্যায়টা সমাপন করার বিশেষ কোনও যুক্তি খুঁজে পায় নি। স্বামীকে ও কোন উত্তর দেয় নি; অন্যান্যদেরও নয়। টিকিট সংগ্রহ করে উড়ে চলে এসেছিল দূরদেশ থেকে স্বামী সহ। এবং পরীক্ষাও সে যথারীতি শেষ কবে ফিরে গেছিল। দ্বিরাগমন-টিকে এগিয়ে এবং প্রস্থানকে পিছিয়ে দিয়ে পরীক্ষা পর্বকে সম্পন্ন করে ছিল বন্যা। এর জন্যে সে চোখের জল ফেলে নি, মুখ ভার করে স্বামীর উপর চাপ সৃষ্টি করে নি, গুরুজনদের অসম্মান করে নি কোনও কটু যুক্তির বা তীব্র বাদানুবাদের প্রক্রিয়ায়। বন্যা তার স্বামীকে

শুধু বলেছিল ঃ 'তোমরা সকলেই পড়াশুনোয় সম্মতি আছে বলেছো ; এখন পিছিয়ে যেতে পার না। তাছাড়া পরীক্ষা আমি দেবোই, অকারণ অশান্তি একমাত্র সৃষ্টি করতে পার যদি বাধা দাও।' অনেক চেষ্টায় অনেক যুক্তি-তর্কের উপস্থাপনা করেও ওর স্বামী ওর মুখ থেকে আর কোনও কথা বার করতে পারে নি। নীরবতা দিয়ে ওদের সকল জল্পনা-কল্পনার ইতি করে দিয়ে বন্যা তার সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করে তুলেছিল। অবশ্য সেই নীরবতার কোষে কোষে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ওর প্রত্যয়ের দৃঢ়তা।

বন্যা প্রথম রাত্রে না হলেও প্রথম ইচ্ছা-সংগ্রামে বিরুদ্ধতার বিড়ালটি মেরে ফেলেছিল। তাই ওর উড়ে এসে পার্ট-টু শেষ করাটাও অপরের টু-শব্দ ছাড়াই সম্ভব হয়েছিল। দীর্ঘদিন মায়ের কাছে থেকে থেকে এবং মাঝে মধ্যে শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর কাছে থেকে এবং না-থেকে ও এম. এস-সিটাও শেষ করেছিল। বন্যা তখন অন্তঃসত্ত্বা ; ওর গুণতি-দিন প্রসবের সময়টাই ছিল ওর নির্ধারিত পরীক্ষার সময়। স্ফীত-মধ্য কিন্তু শান্ত-শির নিয়ে ও একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে আটকালো একেবারে শেষ পরীক্ষায়—প্রাক্‌টিক্যালে। সন্তান এসে গেল পরীক্ষা শেষের দিনেই। আগে থেকে ব্যবস্থা, বিকল্প ব্যবস্থা, করা ছিল বলে, অন্য একটি দলের সঙ্গে, দুদিনের বাচ্চা দোলনায় রেখে, পরীক্ষা দিয়ে বিকেলে এই সদ্য মাতা প্রায় 'বিকল' হয়ে গৃহে সন্তানের কাছে এসে দেহ-মনের সন্তাপ ঝেড়েমুছে স্বাভাবিক হয়ে গেল। এই পরীক্ষাতেও সে প্রথম শ্রেণীই পেয়েছিল। ওর স্বামীর বাধা যত বেড়েছে ওর নম্বরও বোধহয় সেই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে! কে জানে? শ্বশুর বাড়িতে যত বিরোধ-বেষ্টন ওর চারদিকে এঁটে বসানো হয়েছে, বন্যার মধ্যে প্রাপ্তির আকাশ খোঁজার চেতনাকে ততই তা প্রত্যয়দৃঢ় করে তুলেছে।

বাধা পেলে অনেক মানুষই যে নদীর মতো গভীর আর প্রশস্ত হয়ে ওঠে, নিজের অন্তরের শক্তিকে একাগ্র করে প্রগাঢ় বৈদ্যুতিক তেজে সমৃদ্ধ করে অনুভব করে তার অনেক উদাহরণ আমাদের চারদিকেই ছড়িয়ে আছে। বাধা যে অধিকাংশ সময়েই অপমৃত্যুর বধ্যদশায় মানুষকে ঠেলে দেয় সে কথা অস্বীকার না করেও আমরা বলতে বাধ্য যে বন্যা-রা আপন স্বভাবের অন্তস্যূত শক্তির প্রত্যয়েই সব বাধাকে প্রাপ্তির পাথেয় করে তোলে। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এবং যশস্বী গায়ক অশোকতরুর কল্পশিষ্যা বন্যা তাঁর কাছে বসে

গান শেখার আশাটুকু কোনওদিনই বিসর্জন দেয় নি। বার বার বাধা এসেছে,- স্থান হয়নি, সময় হয় নি, কখনও বা সুযোগে টান পড়েছে। কিন্তু নিজের প্রত্যয়ের জোরেই একদিন, বহুদিন ধরেই অশোকতরুর কাছে বন্যা গান শিখতে পেরেছিল। বন্যার পরিশীলিত কণ্ঠটিই ওর pass.port, শত জনের মধ্যেও ওকে আলাদা করে চিনে নিতে ভুল হবে না কারোই। তাই যখন সামনে বসে গাইতে পারল তখনই সে ছাত্রী হয়ে গেল।

আর একবারের কথা মনে পড়ছে। আমার মেয়ের কাছে শোনা। বন্যা তখন বি. এড্ পড়ছে, কি একটা অনুষ্ঠান কলেজের অধ্যক্ষার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মঞ্চস্থ হবে। স্বার্থের টানাপোড়েন, ঈগোর নানাবিধ রসক্ষরণ, বিজ্ঞাপন publicity-র আকাঙ্ক্ষা, প্রভাব-প্রতিপত্তির সুতোটানাটানি সব মিলিয়ে সে এক জটিল অবস্থা। নির্বাচন, নির্ণয়, মনোনয়ন, তালিকা তৈরি হয় আবার পরিবর্তিত হয়ে যায়। সকলের ঘনঘন আনাগোনা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকার দ্বারে, টেবিলের সামনে আর গৃহাঙ্গনের চত্বরে। এ-সবের মধ্যে বন্যা নেই। সকলেই অন্য সকলের পিঠ-চাপড়াতে, প্রত্যয়ন আর অভিজ্ঞতার নামাবলী আকাশে-বাতাসে ওড়াতে ব্যস্ত। যে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর মনে হতে পারত কলেজে প্রথম সারিতে স্থান করে নেবার জন্যে একটা তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে মনে মনে, ঘোষণায়-বিজ্ঞাপনে, প্রশংসাপত্রে আর পারস্পরিক পিঠচাপড়ানির মাধ্যমে। বন্যা এ-সবের বাইরেই ছিল ; সময়ের অভাব, ইচ্ছার অভাব আর, সব দেখে শুনে, রুচির অভাব। তাই সকলেই যখন নির্বাচন কক্ষে তিলধারণের মতো স্থানাভাব ঘটিয়ে ভিড়কে ছিদ্রহীন করতে ব্যস্ত তখন অন্য একটি ঘরে একা একা আনমনে বাইরের আকাশকে দৃষ্টিবদ্ধ করে একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশ উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে চলেছিল। নির্বাচন কক্ষে যাবার সময় অধ্যক্ষা সেই ঘরের সামনে সচকিত দাঁড়িয়ে ওর গান শুনলেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং একটি নির্দেশেই ওর একাকিত্বের খোলসটি ছিঁড়ে দিলেন। সঙ্গে করেই নির্বাচনগৃহে প্রবেশ করলেন। তার পরের ইতিহাস জয়ের ইতিহাস ; ধ্বনিসর্বস্ব ঈগো প্রবাহিত বহু স্বঘোষিত-'প্রথমা'-দের সরব স্বীকৃতিতেই বন্যা নিজের স্থান পেয়ে গেল। তারপর থেকে সেই কলেজের সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সে হয়ে গেল মধ্যমণি। এই আমাদের বন্যা, ওর মনের গভীরে সাগরের ডাক আছে ;-

যখন সে প্রকাশ পায় তখন সব কিছুকেই উত্তাল করে তোলে, ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর নিজে থাকে স্তব্ধ-গম্ভীর-নীরব। ও যেন শঙ্খ; 'বিরাট' ওর অন্তরে চুপ করে থেমে আছে।

ওর স্বামী, প্রবাল, এই সত্য জানতে বা বুঝতে পারে নি। এটাই প্রবালের জীবনের মস্ত একটা ট্রাজেডী। প্রবাল পুরুষপ্রধান সমাজের একটি নিটোল পুরুষ-ঈগোর প্রতিভূ; নিজে মধ্যম শিক্ষিত—সেও পাঠ্যপুস্তকের সীমারেখায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা শিক্ষায়—যাবতীয় কুসংস্কারের বোঝা অষ্টপ্রহর মনে পিঠে বয়ে বয়ে জীবনের প্রতি দৃষ্টিটাকেই স্বার্থকেন্দ্রিক, পুরুষসর্বস্ব, নারী-বঞ্চনার ধারে ও ভারে পুষ্ট করে তুলেছে। 'মেয়েদের বেশি লেখাপড়া করতে নেই, বিধবা হয়,' 'বিবাহিত স্ত্রীদের পরপুরুষের সামনে যেতে নেই, সন্ধ্যার পরে তো নয়ই, ভূতে ধরে', 'স্বামীদের সেবাতেই স্ত্রীদের ঈশ্বর প্রাপ্ত'—এবং ইত্যাদি।

কিছু দিনের মধ্যেই বন্যার জানা হয়ে গেল যে ওরা দু'জনে দুই মেরুর অধিবাসী, ওরা স্বামী-স্ত্রী কিন্তু ও সহধর্মিনী নয়, ওরা পতিপত্নী কিন্তু সহমর্মীতা ওদের দ্বৈত বন্ধন নয়। প্রতিবাদ নেই, বিরুদ্ধতা নেই, ঝগড়া নেই, বিতণ্ডা নেই ওদের জীবনের প্রান্তরে। নেই কারণ বন্যার প্রত্যয়ে ওদের দ্বৈতচলনে স্বাভাবিকতার কথা সুদূরপরাহত, তাই প্রচেষ্টা নিরর্থক বলে মনে হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, বন্যার সিদ্ধান্ত ঃ একটি সন্তানের পিতৃত্বের মধ্যেই প্রবাল একমাত্র সত্য হয়ে থাকতে পারে ওর ভবিষ্যৎ জীবনে। চিন্তনে-মননে ভাবে-ভাবনায়-সংস্কারে-রুচিতে প্রবালের সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। অশিক্ষিতের শিক্ষিতজনোচিত কথাবার্তা ক্ষমা করা যায়, প্রয়োজনে তাকে সত্যের পথে শতপদ সঙ্গগমনেও সামিল করা যেতে পারে ; কিন্তু যে জানে যে সে শিক্ষিত তার অশিক্ষিত জনোচিত আচরণ কোনও সম্ভাবনাকেই খুলে রাখে না। তাই বন্যা প্রবালকে নীরবে মেনে নিয়েছে, সামাজিক জীবনে সত্য বলে নয়, সন্তানের জনক হিসেবে। একবারই সে চেষ্টা করেছিল তার বুদ্ধি-বিচারকে প্রয়োগ করতে, বিশ্লেষণের পথে সত্যকে নিশ্চয় করতে। আর সেই প্রথম এবং সেই শেষ বলে দাঁড়ি টেনে দিয়েছে। অনেক দুঃখে অবশ্যই। কারণ বন্যার বিজ্ঞান-অনুশীলিত মনের সামনে প্রবালের অতীত-মুখী সংস্কারাচ্ছন্ন মন ঝলসিয়ে গিয়ে পাশব শক্তিকে মুক্ত করে দিয়েছিল ঃ প্রবাল

বন্যাকে মেরেছিল ; জৈব শক্তির স্বভাব সিদ্ধ বলে শাণিত-মন বন্যাকে তার ভুল বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল। সুতরাং শেষ। প্রচেষ্টার শেষ, আশা করার শেষ এবং দ্বৈত জীবনে সম্ভাব্য সকল ছন্দেরও শেষ হয়ে গেল সেদিন। বন্যা তখন বি. এস. সি. অনার্সের ছাত্রী। অনেক দিনেরই কথা। তার পরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারের জন্যেও তো দ্বিতীয় চিন্তা দেবার কারণ প্রবালের দিক থেকে দেখা দিল না। হয়তো বন্যার হৃদয় থেকে দীর্ঘশ্বাস অজান্তেই বের হয়ে থাকবে ; কিন্তু সে মেনেই নিয়েছিল, শান্তচিত্তে।

বিয়ের তিন বছরের মাথায় বন্যা একটি কন্যাসন্তান পেল। তার দু'বছরের মাথায় শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে একা-সংসার হয়ে স্বামীর সঙ্গে তার কর্মস্থলে বাসা বাঁধল। কন্যাঅন্তঃপ্রাণ বন্যা খুঁজে পেল তার হারানো ভুবনকে। কবিতা-গান-নাচ আর ছবি আঁকা নিয়ে নিজের জগতকে সে ভরিয়ে তুলতে চাইল, মেয়েকেও দিল এক দিগন্তের খোলামেলা আকাশ। দূর-বিদেশে সমগোত্রীয় সমবয়সীদের নিয়ে গড়ে তুলল কৃষ্টি-সংস্কৃতি আর এক রবীন্দ্রময় বাতাবরণ। অন্য পরিবারের মা-বাবারা তাঁদের সন্তানদের এই রবীন্দ্র স্রোতে অবগাহন করানোর সুযোগ অঞ্জলি ভরেই গ্রহণ করল। বন্যা তার ফেলে আসা জীবন দিয়ে সিঞ্চিত করে তুলতে লাগল তার বিরস-অবশ-একাকী জীবনের বর্তমানকে। আর প্রবাল ? অফিস-অন্তঃপ্রাণ প্রবাল খুঁজে নিল অফিসের জিপ গাড়ি, দূরের অফিসের কেন্দ্র, নোতুন নোতুন বন্ধু-বান্ধব, এবং সম্ভবত সম-তরঙ্গ অন্ধকার জীবন। ক্রমশই তার ঘরের চাইতে বাইরের কাজ বেড়ে যেতে লাগল, প্রথম প্রথম যে প্রত্যাবর্তন দু'একদিনের মধ্যে বাঁধা ছিল, সেই ব্যাপারটা এখন সপ্তাহ ছাড়িয়ে ক্রমশই অধিকের টানে বেড়ে যেতে লাগল। বন্যার মনে প্রশ্ন ওঠে নি ; যদিও উঠে থাকে তাহলে তাকে সে গলা টিপে হত্যা করেছে। এখানে দুটি বিরুদ্ধ কারণ বন্যাকে মূক করে দিয়েছে। প্রথম, সে ঘর পোড়া গরু ; দ্বিতীয় তার রুচি বোধ।

বন্যার বাবা মিত্রবংশীয় হয়েও মায়ের সঙ্গে মিত্রসুলভ আচরণ করেননি। ওর মা যথেষ্ট সুন্দরী, স্কুল শিক্ষিকা, নিজের প্রচেষ্টায় এবং আগ্রহে বিবাহোত্তর জীবনেই আই. এ., বি. এ. এবং এম. এ পাশ করেছেন। ছেলে-মেয়েদের প্রতি মাতৃত্বের প্রস্রবণটি কোনদিনই মৃদু হতে দেন নি। কিন্তু কি ছিল বাবার মনে, এবং সম্ভবত দেহের রোমে রোমে, তিনি অন্য এক

সিংহীর পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত হয়ে দিন কাটালেন। যৌন আকর্ষণ যে মানুষকে বিচার-বিবেচনার সব দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়ে দেয় তা ওদের জানা ছিল না। সেই ভদ্রলোক ওর মার কাছে কি চেয়েছিলেন আর কি পান নি তার হিসেব ওদের কারও জানা নেই; শুধু জানা আছে যে তিনি মাকে ত্যাগ করে কলকাতার কোনও এক আস্তানায় তার নব-অর্জিত নারী-দেহ নিয়ে বসবাস করছেন। এই মর্মন্তুদ ইতিহাসের হয়তো উপক্রমণিকা ওদের জানা নেই, জানা নেই ধাপে ধাপে উদঘাটিত নাটকের অধ্যায় অনুচ্ছেদ গুলোও, হয়তো ওদের মা বুকে পাথর রেখে অপেক্ষাকে সহনীয় করতে করতে একদিন ভুলেই গেছেন যে তিনি তাঁর নিজের শবদেহখানিই বয়ে বেড়াচ্ছেন জীবন্ত জড়ের মতো। বন্যার কাছে এসব যখন একটু-আধটু প্রকাশ হয়ে পড়েছে, পড়তে বাধ্য হয়েছে ওর বাবার স্বার্থপর আব্রুহীন ঘোষণায়, তখন থেকেই বন্যার মনের কোণে সম্ভবত পুরুষ বিষয়ে বিষবৃক্ষের বীজটি উপ্ত হয়ে থাকবে। অর্ধ সত্যের চাইতে উলঙ্গ সত্যের সুবিধা এই যে সেখানে কল্পনা-জল্পনা, আলো-আঁধারির স্থান থাকে না; তাই জৈব সত্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু মন মানে না; সম্ভাব্য নৃশংস নগ্ন সত্যের সামনা-সামনি দাঁড়াতে কালক্ষেপ করাটা ভয় বিহ্বল সনাতন মানব মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আশার ক্ষীণ আলোটুকু যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যায় ততক্ষণই তো একটা কাল্পনিক সার্থকতার দেখা পাওয়া যায়। ক'জন মনে মনে প্রস্তুত হতে পারে এই কথা বলতে: এই মাত্র? আর কিছু নয়? ঘুচে গেল ভয়। ভয় নিয়েই তো জীবন। তাই বন্যা সম্ভাব্য ভয়টুকুকে আশার আলো মনে করে প্রশ্ন করে নি। আঘাতকে বিলম্বিত করার ইচ্ছাটা আমাদের সকলকেই তো অধিকার করে থাকে।

দ্বিতীয় বাধা ওর রুচিবোধ। সন্দেহ করাটা অরুচিকরই নয়, কুরুচির পরিচায়ক। যদি বন্যার প্রয়োজন ফুরিয়েই গিয়ে থাকে তা হলে কিসের সাহায্যে সে সেই প্রয়োজন বোধকে ফিরিয়ে আনবে? গড়িয়ে যাওয়া জলকে বাঁধ দিলে তাকে আটকানো যায়, যৌন-আবেগ জল নয় কিন্তু সে গড়ায়; আর যখন সে গড়ায়, নিম্নমুখী হয়, তখন তাকে রোধ করা যায় কি? প্রবৃত্তির অস্বীকারে মানুষের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। যখন সভ্যতাকে ত্যাগ করে প্রবৃতির স্রোতেই কেউ গা ভাসায় তখন তার দাঁড়াবার স্থান কোথায়?

ধ্বংসেই তখন দৃষ্টি ; গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণে তৃপ্তি। মূল্যবোধের কবরে যৌন চেতনার রবরবা। তাই পদস্খলন যদি ঘটেই থাকে তাহলে খাদের গভীরে গমন অবশ্যম্ভাবী। অনিবার্যকে রোধ করার বিফল প্রচেষ্টা থেকে বন্যা নিজেকে দূরে রাখাটাই বেশি পছন্দ করেছিল।

যে ভবিষ্যৎ অতীতের দিকে তাকিয়ে আনন্দ বোধ করে, স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়, বন্যার জীবনে সেই ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে থাকে নি। প্রবালের ভবিষ্যৎ-তো ব্যঙ্গের অট্টহাসিতে চৌচির হয়েছে। সে কথা আমরা অনেক পরে জেনেছি।

মেয়ের পড়াশুনো আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বন্যা কলকাতায় posting নেবার প্রস্তাব দিয়ে ছিল। প্রবালের খাদের অন্ধকার জীবন তখন বোধহয় নখ-দন্তের আক্রমণ আশংকা করছিল। তাই বোধহয় এক কথায় রাজী হয়ে, নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় বদলীর ব্যবস্থা করে ওরা সদলে কলকাতার কাছেই চলে এলো। একটি বাড়ি ভাড়া করে ওরা বাপের বাড়ির কাছাকাছিই সংসার বিছিয়ে বসল। একটি কলেজে জীববিজ্ঞানের অধ্যাপিকার কাজ পেয়ে গেছিল অনেক আগেই। তাই পরিচিত এলাকায় এবং মায়ের কাছে থাকাটা যোগ্য সিদ্ধান্ত বলেই সকলের এবং প্রবালেরও, মনে হয়েছিল। দু'জনেই কাজে বেরিয়ে যাবে, দিদিমা দেখাশুনো করতে পারবে। তাছাড়াও বন্যার অনেক বন্ধু-বান্ধবী, ওর মা-এর বন্ধু-বান্ধবী কাছে পিঠেই থাকেন।

এই নোতুন ব্যবস্থায় একদিন দুদিন করে তিন মাসে পড়ল। এক শনিবারের বিকেল কাল্ হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তখনও সে যে ভীষণের বার্তা বয়ে এনেছে তা বন্যা বুঝতে পারে নি। যখন ওরা সেই দূরদেশে ছিল তখন প্রবালের পরিচয় হয় এক স্থানীয় মুদির সঙ্গে। সেই মুদি নানান ভাবে প্রবালের দ্বারা উপকৃত এবং সুতরাং ঋণী। সব 'লেন'-এর পাশাপাশি একটা করে 'দেন' থাকে বলেই কথাটা লেনদেন। ডিম আগে না মুরগি আগে সে কূট কচালি পাত্রাধার-তৈল আর তৈলাধার-পাত্রের মতো অনাবশ্যক ; কিন্তু ঘটনা যখন হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সদ্য পাতা শহরতলির অভ্যন্তরে আছড়িয়ে পড়ে তখন কার্য-কারণের সূত্রটি সূর্যের মতোই ভাস্বর হয়ে দেখা দেয়। সেই দূরদেশে মুদি বন্যার চেনা ছিল, মুখ-চেনা, মুদি বলেই চেনা, উপকৃতজন হিসেবেই জানা ছিল। সেখানে একান্ত

মেলামেশার এবং কথা বলার জন্যে সুযোগ ছড়ানো ছিল ; এখানে একান্ত হতে তাই বন্যাকে সকন্যা গৃহত্যাগ করতেই হল। বন্যা গেল মেয়ের হাত ধরে নিজের মাতৃসান্নিধ্যে ;প্রবাল-মুদি একান্ত হল নোতুন ঘরে দীর্ঘ সময়ের জন্যে।

কি কি বিষয় নিয়ে ওরা দীর্ঘ সন্ধ্যা নিবিষ্ট ছিল তা বন্যা জানে না ; জানার আগ্রহও প্রকাশ করে নি। তবে পরদিন, রবিবার, সারাটা দিনই যে প্রবাল বাড়ির বাইরে কাটালো তা জানে। ঘোষণায় ছিল 'অফিসের কাজ' বাস্তবে কি ছিল তা বন্যা জানতে চায় নি। গভীর রাত্রে ফিরেছিল। স্বাভাবিকই ছিল, কারণ দীর্ঘদিন ধরেই বন্যার সঙ্গে ওর ব্যবহার বেশ অস্বাভাবিকই চলছিল ; অস্বাভাবিকটাই তাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এমন কি প্রতিভার আলো ঝলমল মিষ্টি মেয়েটির প্রতিও প্রবালের কোনও দুর্বলতা ছিল না ; অন্ততঃ প্রকাশে কোনও স্নেহ-প্রীতির ছোঁয়া ছিল না। ঘোষিত তথ্য ছিল ঃ 'মেয়েরা শ্রী ও ধী এর অধিকারী হলে দুঃখ পায়, ওদের রান্না-ঘরের যোগ্য করে তুললে সমস্যা হয় না। মেয়েরা কিচেনের প্রয়োজন আর বিছানার সম্পদ '।

তার পরেই এলো সেই মহা সোমবার। অফিসের কাজ সেরে অধিক রাত্রে ফিরল প্রবাল। অনেকগুলো file-পত্র সঙ্গে করে। সকলেই জানে যে, যে দপ্তরে প্রবাল কাজ করে যেখানে ঘড়ির কাঁটায় অফিসের শুরু ও শেষ ঘটে, তা সত্বেও প্রবাল দেরি করে, রাত গভীর করেই, ফিরল। কেন ? বন্যা জানে না, প্রশ্নও করে নি।

"আজ রাত্রে আমার অনেক কাজ আছে। তোমরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।" সেই সোমবার রাত্রে একান্ত ঘরে চেয়ার টেনে নিয়ে মোড়া সাজিয়ে প্রবাল কাজ সারতে বসেছিল। কখন তার কাজ শেষ হয়েছিল তা বন্যা জানে না। কাপড় মেলার নাইলনের দড়িতে ফাঁস তৈরি করে সে সিলিং ফ্যানের আঙটায় নিজেকে ঝুলিয়ে সব কাজ শেষ করে দিয়েছিল !

হাজার মাইল দূরে নিজের আত্মাকে হত্যা করে যে মৃত দেহখানি প্রবাল এতোদিন বয়ে বেড়াচ্ছিল সেই দেহখানিকেই সে নাইলনের সূক্ষ্ম দড়িতে শেষ করে দিয়েছিল। কেন ? এই কেনর উত্তর মুদিই একমাত্র দিতে পারে ; আর পারে মুদির ঋণ শোধের উপায় হয়ে যে নারীটি প্রবালের জীবনে জৈব-ছায়া ফেলেছিল সেই চরিত্রটি।

ঘটনাই যথেষ্ট ; সত্য উদ্ঘাটনের কোনও বাসনা বন্যার নেই। যে সত্য জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা দেয় সেই বৈজ্ঞানিক সত্যে সকলেরই আগ্রহ, আর যে সত্য নখদন্তে উলঙ্গ জীবনের perverted রূপ তাতে বন্যাদের অনাগ্রহ স্বাভাবিক। জোঁক যখন রক্ত শুষে নিয়ে আপনিই ঝরে পড়ে যায় তখন তাকে বলে good riddance. সেই ঘটনায় কি বিরহ বাজে ? ট্রাজেডীর সুর ওঠে ?

———

।। টোল ।।

তিন চারটি পোস্ট-অফিসের স্ট্যাম্প-চিহ্ন বয়ে এনভেলপ খানা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছল তখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে গ্রামের বিকেলে আমার মনটা যেন পেখম তুলে নেচে উঠলো। ঠিকানার হস্তাক্ষর পত্র লেখকের পরিচয় বহন করেই এনেছে। সুবিনয়! চিঠি খোলার আগেই আমার মনের জলতরঙ্গে ঝরনার আবেগ বহমান হয়ে উঠল। প্রায় দু' সপ্তাহ হয়ে গেল এবার সুবিনয়ের চিঠি পাই নি। চিঠি তো নয়, সুবিনয় বৃষ্টি-লেখে, ঝরনা নামায়; চিঠিতে ও ছবি আঁকে। তাই ওর চিঠি আমার মনের গ্রীষ্মাবসান, ঊষর সময়ান্ত প্রাণের সেচন। ও আমাকে চাঙ্গা করে তোলে, অন্তরের গভীরে কুঁড়ির চাঞ্চল্য জাগায়। সাতদিন হয়ে গেলেই আমার মনে হয় যেন এক যুগ পার হয়ে গেল। চিঠিখানা বুকে চেপে ধরে পত্রের মাধ্যমে আমার উষ্ণ হৃদয়খানির ছোঁয়া পাঠালাম। অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলাম।

অথচ ভাবলে কী ভীষণ অবাক লাগে। প্রথম দিনের সেই সাক্ষাৎ। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের আঙিনায় আমরা একে একে নিজ নিজ বিন্দুতে প্রথম জড়ো হয়েছি। বাক্স-প্যাঁটরায় প্রয়োজনের বন্ধদশা তখনও ঘোচে নি। কাঁধের ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে-দুলিয়ে আমরা পূর্বপরিচিতা মেয়েদের সঙ্গে সচল-সচ্ছল কল কাকলি শেষ করে পরস্পরের বন্ধুদের সঙ্গে প্রাথমিক বন্ধুত্ব শেষ করে ফেলতে ব্যস্ত। চারদিকে একটা মধুর বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে; সকলেই নিজের বিন্দুটি ছেড়ে, জিনিসপত্র ফেলে রেখে এ-ওর সঙ্গে, সে-তার সঙ্গে হৃদ্যতায় মশগুল হয়ে আত্মপ্রকাশ আর আত্মঅনুসন্ধানে মত্ত। অতীত স্মৃতি। বর্তমানের ডেবিট-ক্রেডিট। শুরু-শুরুর তীক্ষ্ন চিৎকার আর তীব্র চেঁচামেচি ক্রমশ মৌ-মৌ গুনগুনানিতে স্তিমিত হয়ে আসছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তাৎক্ষণিক ঘূর্ণিগুলো সময়ের প্রসারে এক একটা ধারায় বয়ে চলেছিল। আর তখনই আমার নজর পড়েছিল সুবিনয় ছেলেটির দিকে।

একেবারে একা একা, এক প্রান্তে নিজের ট্রাঙ্কের উপর বসে বোধহয় সেদিনের একটা দৈনিকে নিজেকে আটকে রেখেছিল। তখনও ওর নাম জানা হয় নি, ধাম জানি না, অনুমানে সমগোত্রীয় বলে বুঝে নিয়েছি। চোখেমুখে

বেশবাসে, গ্রামের সব্‌জ যেন বাঙ্‌ময়। দেখেই ব্‌ঝে গেলাম যে একাকিত্বটা ওর নিজের স্বভাবের অঙ্গ, অর্জিত অধিকার। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় যে শেষ করেছে, করেছে নিশ্চয়ই, অন্যথা আজ এখানে উপস্থিত হত না, সে এমন নির্বিকার নিরাসক্ত হতে পারে একমাত্র নিজ-প্রক্‌তির প্রভাবেই। হঠাৎ মনের হাতছানিতে একপা দ্‌'পা করে ওর কাছে গিয়ে বলেছিলাম ঃ নমস্কার, একা-একা কেন ? একেবারে অপ্রত্যাশিত, এতো কাছে আমাকে দেখে, নিতান্তই হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রতি নমস্কারট্‌ক্‌ ঘাড়ের দোলানিতে আর হাতের উত্থানে সেরে নিতে পেরেছিল। কথা বলে নি একটিও, কিন্ত্‌ চোখ দ্‌টি ত্‌লে গভীর করে আমার দিকে বিস্ময় আর ক্‌তজ্ঞতা একই সঙ্গে স্থির ধরে রেখেছিল। অনেকক্ষণ।

তারপরে কতোদিনই তো কতোভাবে পার হয়ে গেল। ক্লাসে দেখা হয়েছে, সাক্ষাৎ হয়েছে শ্রেণীকক্ষের বাইরে খোলা বারান্দায়, খোলা মাঠের পাশটিতে। প্রথম দিকের কখন-সখনর দেখা শ্‌না ক্রমশই যেন চেনা-জানার দিকে স্বাভাবিক গতি পেযে এগিয়ে গেছে। স্‌বিনয়ের সেই লাজ্‌ক লাজ্‌ক একা একা ভাবটি যে খ্‌ব সহজে কেটে গেছে তা বলতে পারি না। আমার মলিনা নামটার শেষের না টা নাকি 'পেসিমিস্টিক', নঞর্থক দ্যোতনায় অন্ধকারের প্রতীক! তাই নামের অন্ত্যচ্ছেদ ঘটিয়ে 'অপটিমিষ্টিক' করে নিতে চেয়েছে। যদিও অনেকদিন পরে, অনেক ঘনিষ্ঠ হবার পরে। একই নীতির প্রয়োগে ওকেও শেষান্ত হয়ে স্‌বি হতে হয়েছে। তখন অবশ্য আমরা আর মিনিট ঘণ্টার মাপে বাঁধা নেই ঃ নৈকট্যের ব্যঞ্জনা ততদিনে গভীরের টানে বর্ণময় ধ্বনিমগ্ন হয়ে উঠেছে। তখন আমরা পরিবেশকেও বেছে নিতে শ্‌র্‌ করেছি ; গড়ের মাঠ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, লেক ধারের ছায়া ছায়া সজল সব্‌জ পাড়ের জনহীনতা। রবিবার গ্‌লোকে তখন ক্রমশই যেন অহেত্‌ক বিলম্বে আসা দিন বলে মনে হতো ; অন্য দিন গ্‌লোয় হেড্‌মাস্টার স্‌লভ শাসন যেন হিরাকঁদ বা মাসাঞ্জোড় বলে মনে হত।

সব য্‌বকের মতোই স্‌বিনয় কবিতায় ঝঁকেছিল ; সেই কবিতার ঝোঁক এতোদিন নাকি পয়ারের মিলনে জোড় পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে অভ্যস্ত ছিল। আমার গানের টোল নাকি ওকে নোত্‌ন করে স্‌জনী করে ত্‌লেছে, আমার সঙ্গে পরিচয় ওর জীবনে প্রস্রবণ এনে দিয়েছে। এ-সব ও আমাকে

আমাদের একান্ত বেড়ানোর বিকেল সন্ধ্যায় বলেছে। পয়ারের বাঁধন থেকে ওর এখন মুক্তপদক্ষেপের নমুনাও ও পেশ করেছে। ভাল লেগেছে আমার। আমি কবি নই, কবিতার মূল্যায়নও আমার ক্ষমতার বাইরে। তবে যে লেখা মনের গভীরে ঝংকার তোলে, অনুভবের প্রবাহে অনুভঙ্গ ঢেউ তোলে আর নোতুন উপলব্ধির আলোকে সচেতন প্রত্যক্ষের সামনে তুলে ধরে তাকে আমার ভাল লাগে। তাকেই আমার কবিতা বলে মনে হয়। শব্দ, যতি ছন্দ এবং একটা প্রগাঢ় তাৎপর্য, একটা গভীর অনুভব যেন সুন্দর হয়ে কখনও চোখের সামনে, কখনও মনের, কখনও কল্পনার কেন্দ্রটিতে, কখনও অন্তরের তন্ত্রীতে মধুর সুরের মূর্ছনা তোলে।

ছোটবেলা থেকেই আমি অত্যন্ত সাধারণ। কেউ আমাকে সুন্দরী বলে মত প্রকাশ করেছে বলে কখনও শুনি নি। একমাথা লম্বাচুল আমার ঢ্যাঙা শরীরের পিছনে নাকি ঝুলে থাকতো আর আমার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে, অকারণ ঢেউ তুলে তুলে আমাকে ব্যঙ্গ করত। সেই আমার তরুণ বয়সের আকাশে-মাথা চেহারাটার মধ্যে অপরকে আকর্ষণ করার মতো কিছুই ছিল না। যাঁরা সব সত্ত্বেও আমাকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন, তাঁরা নাকি আমার ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন। তাঁদের হাতের তুরুপের তাস ছিল আমার গালের ঐ টোল দুটো। আর বোধহয় বয়সের জল সেচন যা প্রকৃতির গৃহিনীপনায় সব মেয়েরাই একটা সময়ে অকৃপণ পেয়ে থাকে। হবেও বা! তবে এই অত্যন্ত সাধারণ চেহারাটার জন্যেই বোধহয় যে কোনও লোকের সঙ্গেই আমি কোনও 'ট্যাবু' ছাড়াই বেশ সহজে মিশতে পারতাম, কথা বলতে পারতাম, আলপাচারি জমিয়ে ফেলতে পারতাম। আমার এই ঝরঝরে মেলামেশা নিয়ে নিজেও যেমন কখনও ভাবিনি, আমার অভিভাবকেরাও তখন কিছু ভাবেন নি। প্রকৃতির আপন মহিমায় সৃষ্ট আমার এই স্বভাবের দান আমার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই আমার কবচের মতো, অথবা, আমার অপরূপ চেহারাই আমার সহজ সচল মেলামেশার স্বাধীনতার মতো আমাকে কখনই ত্যাগ করে নি। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে মনের লেনদেনের অনেক কবিতা, ছোটগল্প আর উপন্যাস দেখেছি। দেখেছি প্রেমের পয়ার ছন্দ, দ্বিপদী থেকে চতুর্দশপদী; জেনেছি ছোটগল্পের আমেজে প্রেমের শেষ হয়েও অসমাপ্ততার রেশ টেনে টেনে অনেক কমেডি-ট্রাজেডীর

সমাবেশ। এবং অনুসরণ করার সুযোগ এসেছে অনেক উপন্যাসোপম প্রেম পরিসর পরিব্যপ্ত অনুচ্ছেদ-বিভক্ত মিল অমিলের। আর আমার স্বভাবের পদ্মপত্রে প্রেমের জল দানা বাঁধে না, গড়িয়ে সরে সরে ছল্‌কে ছল্‌কে যায়! অনেকের সঙ্গেই তাই নির্ভয়ে আলাপ পরিচয় করেছি। ক্যান্টিনে রেষ্টুরেন্টে সময় কাটিয়েছি, মাঠে গাছতলায় গঙ্গার ধারে দখিনে হাওয়াকে সুযোগ দিয়েছি কিন্তু তীর বিদ্ধ মরাল মরালীর অনুভব জাগাতে পারি নি!

নিতান্ত ভদ্রতার প্রকাশ ঘটাতেই একাকিত্বের বর্মে ঢাকা সুবিনয়কে সঙ্গ দিতে গেছিলাম। নিজের স্বভাবের কবজ-কুণ্ডলটি ততদিনে অভ্যস্ততায় এসে গেছে বলেই একটা বিশ্বাস ছিল। সেই ক্ষণমাত্র সময়ের পরিধিতেই সেই পরিচয় ক্ষণটির নিটোল সমাপ্তি ঘটবে এমন একটা অবচেতন প্রত্যয় নিশ্চয়ই মনের গভীরে স্থির ছিল। যেমন আগে আগে অনেকবারই হয়েছে, অনেক অমল বিমল পরিমলদের ক্ষেত্রে। কিন্তু ওর চোখের গভীরে, গ্রীবার ভঙ্গিতে আর উচ্চকিত প্রতিনমস্কারে বোধহয় অন্য কিছু ছিল, অথবা আমার হৃদয়ের ঝিনুকটি তখন স্বাতীনক্ষত্রের উজ্জ্বল ক্ষণে নিজেকে উন্মোচিত করে রেখেছিল। কি হয়েছিল, কেন এবং কিভাবে তা অনেক পরে জেনেছি। তখনকার মতো ঝিনুকের মুখ বন্ধ হলেও তার অভ্যন্তরে মুক্তির আলোড়ন টুকু ধীরে ধীরেই রূপ নিতে ব্যস্ত ছিল। সুবি-র আলোয় মলির মনে মুক্তোর সৃজন হয়েছিল। সে অনেক পরের কথা।

বিকেল বেলায় পরন্ত সূর্যের আলোয় গঙ্গার বুকে ঝিরঝিরে হাওয়া। তখন আমাদের ঘনিষ্ঠতা কোমল বাক্যহীন নৈঃশব্দ্যেও বাঙ্‌ময় হয়ে উঠতো। পাশাপাশি বসে থেকে একটিও কথা না বলে আমরা অফুরন্ত কথা বলতে তখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। গঙ্গার বুকে ছোট ছোট তরঙ্গের অবিরত ওঠা পড়ায় সুবি আমাকে বাতাসের প্রেম জলের বুকে কেমন করে নিতি নিতি অনুরণন তোলে তার ছবিছবি বিবরণ দিয়েছিল, মানুষের প্রেম তো অবস্থার চাপে আর পরিবেশের তাপে উজ্জ্বলতা হারায়, কালি হয়ে যায়। দৈনন্দিনতার যোগান আর চাহিদা, বাস্তব আর হিসাব নিকাশের নিষ্ঠুরতা মানুষের প্রেমকে বিমর্ষ করে, বিষণ্ণ করে, বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। প্রকৃতিতেই দেখা যাবে অনাবিল প্রেমের সচল গতিশীল অবগাহন। গঙ্গার জলে আর আকাশের বাতাসে এই যে প্রেমের কাহিনী এর ব্যত্যয় নেই, এতে বিষণ্ণতার স্থান নেই,

জীবন সংঘর্ষের প্রভাব নেই। তেমনই দেখবে আকাশের নীল আর বনের সবুজ একে অপরের জীবনে চিরপ্রেমের ঊর্ধ্ব-অধঃ বাণীটি কেমন অসীম অনন্তকাল ধরেই বহমান রেখেছে। বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নেই, বিকৃতির সুযোগমাত্র নেই। আবার দেখ ঊষার প্রথম কিরণের সঙ্গে ভোরের পাখির সুকণ্ঠ-প্রেম তারও তো কোনও শুরু নেই, শেষ নেই। অস্তসূর্যের ম্রিয়মান অবসান সময়টিতে দিকচক্রবালে সমাসন্ন মেঘেদের অনাগোনা, একে অপরের জন্যে এই যে আগামী দিনের বিদায় ক্ষণটির আলো উদ্ভাস এ সবই কি চির প্রেমের অনাদি অনন্ত প্রকাশ নয়?

আমি অবাক হয়ে সুবির দেওয়া প্রেম ব্যাখ্যা মনে মনে স্মৃতিতে আর কল্পনায় জাগরূক করে ওরই পাশে বসে নোতুন করে উপভোগ করতাম। ও বলত মানুষের আছে বাঁচার তাগিদ, আছে পরীক্ষা পাশের পড়া করার দায়। আছে চাকরির ঘানি টানা, র‍্যাশানের লাইন, বাজারের থলে, আর যাদের প্রাণে আছে প্রেম তাদের পকেটে থাকেনা জঠরের সম্পন্ন সংস্থান। তাই বহুসূত্র বাস্তবের হাতের পুতুলটি হয়ে মানুষকে অকারণেই অনেক নাচা কোঁদা করতে হয়। অবশিষ্ট সময়ে তাই মানুষের প্রেমের সময় নিশ্চিত হয়েছে। প্রকৃতি নিজের অন্দরমহলের জন্যে অফুরান ব্যবস্থা রেখে কেনই যে অতীব কৃপণের মতো মানুষের বেলায় অনটনের ব্যবস্থাটি করে রেখেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। আমরা জানি যে এই অব্যবস্থায় বেদনার ভাণ্ডটি তিনি মানুষের জন্যে পূর্ণ করার ব্যবস্থাটি পাকাপাকিই করে রেখেছেন।

একা একা পাশাপাশি বসে আমি কি ভাবতাম তা আমি জানি। আমি সুবিনয়-এর কথাগুলোকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতাম, নোতুন নোতুন তাৎপর্যে আর ব্যঞ্জনায় সে সব কথা আমার মনের মধ্যে দীপাবলী হয়ে ফুটে উঠতো। কিন্তু সুবি কি ভাবত? ও কি কারণে চুপ করে একান্ত হয়ে বসে থাকতো আমার পাশটিতে? প্রশ্ন করেও দেখেছি। ও বলে 'কেন? তোমাকে ভাবি!' আমি যদি অবাক হয়ে আবার প্রশ্ন করতাম 'আমাকে নিয়েই বা তুমি কি ভাব?' তাহলে অপলক আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কাটিয়ে দিত উত্তর কিছুই দিত না। ওর চোখে তখন আমি পাতার মর্মর, জলের তির তির তরঙ্গ অথবা মেঘের প্রান্তে পড়ন্ত সূর্যের স্তিমিত আলোর ঝিলিক দেখতে পেতাম। ওতেই যেন ওর উত্তর দেওয়া হয়ে যেতো; আর আমার মনে হত যেন সব প্রশ্নের

সব উত্তরই ও আমাকে চোখের ভাষায় আর ভাবের ইশারায় দিয়ে দিয়েছে। সুবি থেকে চোখ সরিয়ে দূর আকাশের অনন্তে ভেসে যাওয়া খণ্ড খণ্ড মেঘ গুলোর ধীর চলনের দিকে নিবদ্ধ করে দিতাম ; সেখানে একটা দুটো পাখির কুলায়-মুখ পক্ষতাড়নাকে আমার ছবির মতো মনে হত। একটা টানটান প্রেক্ষাপটে প্রাণের প্রবাহ, প্রেমের প্রকাশ যেন স্থির অচঞ্চলতার নিঃসীম গতিশীলতায় মুক্তি পাচ্ছে মনে হত। সুবির সান্নিধ্য আমাকে ভাবালু করে তুলত, ফিরে আসার পরেও যেন ওর উপস্থিতির রেশটি ঠুংরির মধুর ঝংকারে আমার মনে প্রাণে আনন্দের লহরী তুলে তুলে সুন্দরের হাতছানি দিত।

সব মা-বাবারা যেমন তাঁদের কন্যাদের প্রাগ্রস্থ করার জন্যে অনেক আগে থেকেই সঙ্গীত বিদ্যালয়স্থ করেন, অথবা নৃত্যের অথবা উভয়েরই, আমার বেলাতেও তার কোনও ব্যত্যয় হয় নি। বিশেষ করে অরূপের জন্যে সমধিক দুশ্চিন্তা ছিল তাঁদের। সেদিকেও সেই গানে আব নাচেও আমি কোন অসাধারণ হতে পারি নি। তবে আমার গালের টোলের মতো কণ্ঠের অভ্যন্তরেও নাকি প্রকৃতিঠাকরুণ একটা টোলের ব্যবস্থা কবে রেখেছিলেন—মধুরতা নাকি আমার কণ্ঠের স্বরূপ সম্পদ ছিল। আমার নিজেব অবশ্য সে বিষয়ে খুব একটা প্রত্যয় ছিল না। আর প্রকৃতি নিজেই নৃত্য-পটিয়সী বলে তাঁর নিজের প্রতিরূপে সৃষ্ট আমাদের মধ্যেও নৃত্যের স্বতঃপ্রকাশটি স্বাভাবিক করে রেখেছেন বলে শুনেছি। দীর্ঘ গঠন দেহে তাই নৃত্য নাকি খেলা করার অবকাশ পেত। এ-সবের কোনওটাই আমি ভবিষ্যতের প্রয়োজনে অনুশীলন করি নি ; যতটুকু ভাল লেগেছে ততটুকুতেই ছেদ টেনে দিয়েছি। কেন বললাম তাই বলি।

শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের উপান্ত-অনুষ্ঠানে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু করে মনোরঞ্জনের ডাক দেওয়া হল। গান নাচ ইত্যাদির ব্যবস্থায় রিহিয়ার্সাল হল। না-না করেও দুখণ্ড গান এবং দুদণ্ড নাচ করতে হল। ওদের বিচার দৃষ্টিতে আমার অংশে অনেকটা সময় ধার্য হয়ে গেল। সুবির চোখ কুণ্ঠিত হল ;ওকে নাকি বঞ্চিত করা হয়েছে, কেন এতদিন জানান হয় নি ? অভিমানের গভীরতাকে গাঢ় করে প্রকাশ করতে গিয়ে সুবি আমার আরও বেশি কাছে এসে গেল ! সেই প্রথম প্রেমের পার্থিব সরসতা মনের গভীরে প্রাণের দ্বারে পৌঁছে গেল। মধুর যে এতো মদির, সুন্দর যে এতো রসসিক্ত, তা আমার কল্পনার

বাইরে ছিল। অনেকদিন পরে যখন একদিন সুবিকে সেদিনের সেই প্রথম দিনের নিবেদনের অনুভব জানতে চেয়েছিলাম ও শুধু বলেছিল সে ছিল শান্ত অঞ্জলিতে সমাপন! আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'মানে?' সুবি বলেছিল সব মানে শব্দের মধ্যে ধরা থাকে না, সঞ্চারিত হওয়ার মতো মানে থাকে মনের গহনে, অনুভবের গভীরে। তাতেও যে আমি বেশ বুঝেছিলাম তা বলতে পারি না, তবে ঝংকার উঠেছিল মনে, অনুভবে, প্রাণে! সেটাই বোধহয় মানে এই ভেবে মনকে শান্ত করেছিলাম। যা সেদিন পেয়েছিলাম সে তো আমার অন্তরের নিধি হয়ে রয়ে গেল, মানের পিছনে ছুটে তাকে ধূসর করার প্রয়োজন ছেড়েই দিয়েছিলাম তখন।

সেই মহাবিদ্যালয় থেকে বিদায়ের মুহূর্তে অনেক সঙ্গোপনে একান্ত হতে পেরে সুবিনয়কে অনুনয় করে বলেছিলাম 'যাবার সময় এমন কিছু বল যা ধ্রুবকের মতো জ্বল-জ্বল ধরা দেবে।' ক্ষণমাত্র ভেবে নিয়ে চকিতে সুবি আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিল, আলিঙ্গনের গভীরে বাহুবন্ধ করে অধরে অধরা হয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করেছিল, দ্বিতীয়বার, আমাকে, নিজেকে। আমরা দুজনেই সমুদ্রের অতলে অবগাহন মত্ততায় আলপনা এঁকেছিলাম কম্প্র-সিক্ত ওষ্ঠে-অধরে অক্ষি-কপোলে বক্ষে-বাহুতে; সমাপ্তি সঙ্গীতের মতো করে বলেছিল 'কথা হারিয়ে যায়, বাক্য বিপথগামী হতে পারে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে তাই প্রাণের ঝংকার তুলে দিলাম, এ-স্মৃতি হারাবে না, বিপথচালিত হবে না, বিস্মরণের গভীরে যেতে যেতে এ অধিকতর তাৎপর্যে, সুষমায়, সৌন্দর্যে ক্রমশই মণ্ডিত হতে থাকবে। চিরস্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিয়ে বিদায়ের মুহূর্তটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখলাম।

চিঠিখানা খুলতে খুলতে ভাবলাম দশ মাসের মধ্যে একটি একান্ত-একা পুরুষের মনে কেমন করে একটি পরিপূর্ণ কবিতা জন্ম নিয়েছিল। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিজের মধ্যথেকেই বেরিয়ে এসেছিল। আমরা দুজনেই ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সির স্বল্পমেয়াদ মহাবিদ্যালয় সেরে নিজ নিজ পূর্বস্থিত বিদ্যার আলয়ে কাজে যোগ দিলাম। আমার জীবনে সমুদ্র পরিবর্তন আমাকে দলিত মথিত করে নবদিগন্তের প্রত্যাশায় আকাশমুখী করে তুলেছিল। সুবির চিঠিতে জেনেছিলাম যে আকাশ ও ছেড়ে এসেছিল সে আকাশ ওর যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, ওর জীবনে বিশ্বব্যাপী আকাশ তার নীলঘন দ্যুতি নিয়ে

একেবারে কাছের হয়ে দেখা দিয়েছে। তারারা এখন ওকে দেখে সুবিনয় বলে চিনতে পারে, নীলের ওড়নায় মলির খবর ওর হৃদয়ের গভীরে বয়ে আনে। সুবি এখন আর একা থাকে না। বাতাস যখন ওদের স্কুলের জলপাই গাছের পাতায় কথা বলে তখনও মলির কণ্ঠ শুনতে পায়, বিদ্যালয় মাঠের ঘন সবুজ ঘাসের ডগায় ডগায় অনুভব করে মলির আগমনবার্তা, বর্ষায় প্রথম বর্ষণের দিনে যখন একফোঁটা দু'ফোঁটা বৃষ্টি বিন্দু ওদের টিনের চালায় ঝংকার তোলে তখন সে আমার ঘুঙুর আঁটা পদশব্দ ছন্দ-বন্ধ নৃত্যভঙ্গিতে শুনতে পায়। ও বলে, শীতের শেষ রাতে ওর ঘুম ভেঙে যায় চাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া শিশির বিন্দু যখন নিচের শুকনো পাতার বক্ষ ভেজায়, ওর বুকের গভীরে নাকি তখন আমারও শব্দহীন পদার্পণ ঘটে! এ-সবই আমার আগের আগের চিঠিতে জানা হয়ে গেছে।

আজকের চিঠিখানা খুলে আমি একেবারেই অ-বাক হয়ে গেলাম। নীল পত্র-লেখার কাগজ থেকে বেশ একটা হাল্কা সুবাস। কিন্তু উন্মুক্ত হৃদয় সেই কাগজের বক্ষে নীলের টান টান আকাশটির ঠিক মাঝখানে কলমের একটি ছোট্ট চুম্বনের মতো দুটি কথা লেখা ঃ চলে এসো।

আমার দেহ-মনে আর একবার বিদ্যুৎ-এর ঝলকানি অনুভব করলাম। স্মৃতি যেন জীবন পেল। অতীত যেন বাহুবন্ধনে বর্তমানকে আলিঙ্গন করল। 'চলে এসো' কথা দু'টি যেন আমার চোখে-মুখে, গণ্ডে-অধরে, কপালে কপোলে উষ্ণ ছোঁয়ায় মাতালের মতো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। এই এতো দূরে বসেও যেন আমার মধ্যে একটা ত্রস্ত-অবশতা ঘূরপাক খেতে লাগল।

এই আহ্বানটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত। আগের আগের চিঠিতে সুবিনয় আমাকে সবিস্তার পথনির্দেশ দিয়েই রেখেছে। আমার ঘরের দরজা থেকে শুরু করে হুগলীর এক প্রত্যন্ত গ্রামের ছায়াঘেরা বিদ্যালয়ের হাতায় ওর ডেরাটি পর্যন্ত প্রায় প্রতি ফুট রাস্তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে ও পথের হদিস দিয়ে রেখেছে। তাই ওর বাসস্থানের পথ আমার মুখস্থই বলা যায়। বলা যায় চোখ বন্ধ করে পা গুণে গুণে ওদের গ্রামের স্কুলের কাঁচা রাস্তাটাও আমি পার হয়ে যেতে পারি। বাস থেকে নির্দিষ্ট স্থানে নেমে যে বিশাল বটগাছটা সামনে পড়বে তার নিচে বিকেলের তির্যক রোদে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের এখানে ওখানে বসে থাকতে দেখা যাবে। ওই বটবৃক্ষটিকে বাঁহাতে রেখে আমাকে যেতে হবে

কাঁচা রাস্তাটি ধরে সোজা সামনে। বাঁ দিকে থাকবে সুদূর প্রসারিত সবুজ মাঠ। সেই মাঠে চরবে কিছু গরু ক'একটা ছাগল আর তাদের তদারকী করতে ক-একটি আদুড়-গা ছেলে। মাটি কাটা জলাশয় থাকবে বড় রাস্তার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে সেখানে ইজের পরা ছেলে আর ফ্রক পরা মেয়েরা একান্তমনে মাছ ধরা শেষ করে নিজ-নিজ পাত্রের সম্পন্নতার হিসেব কষবে ঝুঁকে পড়ে উপুড় হয়ে। দু'চারটি শালিক ; কাদা খোঁচা বক, এক আধ ঝাঁক ফড়িং নিজের নিজের ছন্দে আর আপন আপন আনন্দে পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলবে। বাঁ দিকেই, বহুদূরে, তুলিতে আঁকা গ্রামের চিহ্ন দেখা যাবে। কিন্তু ডান দিকে আম কাঁঠালের ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থান, মাঝে মাঝে খড়ের ছাউনি আর টিনের চালা দেখেই বুঝবো ঠিক রাস্তায় চলেছি।

এমনি করে সুবিনয় বিদ্যালয়ের সামনে যে কাঞ্চন ফুলের ছাতা মাথায় গাছের নির্দেশ দিয়েছে তা আমার মনের মধ্যে ছবি হয়ে সবুজ হয়ে আছে। সবটা পথই সে শব্দের তুলি দিয়ে এঁকেছে। তাই পথ ভুল হবার সুযোগ কোথায় আমার ? ডানদিকে যখন একটা কোঠাবাড়ির সামনের ইতিহাস বিজড়িত বকুল ফুলের গাছটা দেখতে পাব তখন নিশ্চয় জানবো যে অর্ধেক পথ পার হয়ে গেছে। আর তখনই একটু দূরেই রাস্তাটা বাঁক নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরে যাবে। জনবসতি ঘন হবে, দুষ্টু ছেলেরা বাড়ির উঠোনে, রাস্তার ধারের ঘাসের আস্তরণে আর গাছের গুঁড়ি বেষ্টন করে খেলা করবে, মেয়েরা পুকুর ঘাটে জল নেবে, গল্প করবে, অলস বিকেল দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে বসে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করবে। আর আমি যখন সেই পথে দীর্ঘ ছায়া ফেলে স্কুলের দিকে যাব তখন এখানে সেখানে উৎসুক চোখ তুলে, চুলের গোছা ঠিক করতে করতে কলসীভরা স্থগিত রেখে গ্রাম এই অপরিচিতাকে বেষ্টন করে অনুমানের লাগামটা স্বাধীন করে ভাবনায় আর কল্পনায় ডুবে যাবে। দুই বিনুনি লাফ-দড়ি মেয়েটির ছন্দ-নৃত্য থেমে যাবে, পাশেই অপেক্ষারত তার ভাইটি ঘাড় কাত করে চোখ বড়-বড় করে আমাকে জরিপ করবে, আর মাঠ থেকে গরুর দড়িটি হাতে নিয়ে প্রৌঢ় লোকটি চোখ কুঞ্চিত করে ভাববে আমি কোথায় যাচ্ছি। তখন জানব স্কুল এসে গেল বলে।

গুণে গুণে শেষ মোড়টি পার হতেই স্কুলগৃহটি ছবির মতো ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কাঞ্চন ফুলের আকাশ-সংসার গাছটি পরিষ্কার

দেখতে পেলাম। রাস্তার গা বেয়ে বিরাট খেলার মাঠ, মাঠের শেষে ইংরেজী 'ই' চেহারার বিদ্যালয় গৃহটি। ইঁটের পাকা দোতলা স্কুল। পিছনের গাঢ় সবুজের প্রেক্ষিতে মনোহর লাগল। তারই একপাশে যেমন দেখার কথা ছিল দু'টি আলাদা আলাদা শিক্ষক আবাসন গৃহ। প্রত্যেকটিতেই দু'টি করে বাসস্থানের ব্যবস্থা। সামনে সমান্তরাল বাগান, বাঁশের কাঠামোয় ঘেরা, মাঝ-খান দিয়ে দু'টি প্রবেশের পথ। ঘরের কাছে গিয়ে দুদিকে বেঁকে দ্বিধা হয়েছে। সবই জানা, যেন আগেই দেখা। তবে বিন্যাসের বাস্তবতা, সবুজের সমারোহ আর সব মিলিয়ে গোটা জায়গাটাই যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো আমার চোখের সামনে।

রাস্তা থেকে নেমে মাঠ পার হয়ে সুবিনয়ের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে পা ফেলতেই নজরে পড়ল, নজর তো প্রান্ত আবাসনটির দিকেই বার বার চলে যাচ্ছিল, সুবি ত্বরিৎ পদে অভ্যর্থনার আন্তরিকতা ছড়িয়ে আমার দিকেই আসছে। তিনটি ছেলেমেয়ে মাঠের ধারে ছুটোছুটি করছিল। তারা এতোক্ষণে আমাকে দেখার ফুরসৎ পেল এবং হঠাৎ একেবারে 'ফুলস্টপের' মতো স্থির হয়ে, খেলা ভুলে তাকিয়ে রইল। দূরে দাওয়ার কাছে এক ভদ্রমহিলাকে ঝারি করে গাছে জল দিতে দেখলাম, তার পাশে চায়ের কাপ হাতে নিশ্চয়ই তাঁর স্বামী অলস-অবকাশে হাল্কা মনে গাছ, মাঠ, ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছিলো, অথবা নিরুদ্দেশ দৃষ্টিতে কোনও কিছুই লক্ষ্য করছিলো না।

প্রথমে সুবিনয় তৎপর হল, তারপরে দেখলাম ছেলেমেয়েরা হঠাৎই থেমে গেল, তারপর মহিলার গাছে জল সিঞ্চন বন্ধ হল, এবং ভদ্রলোকের হাতের চা ঠাণ্ডা হতে লাগল।

'চলে এলাম'—সুবিকে বললাম। 'জানতাম'—বলল সুবিনয়! একটু এগিয়ে বলল, 'বৌদি, এই নিন আপনার 'মলি'। পৌঁছে গেছে ঠিকই, রাস্তা ভুল করার ওর সাধ্য কোথায়?' বুঝলাম আমার আসার খবরটি এঁদের সকলেরই জানা। শুধু তাই নয়, পূর্ণ নামটি ঘোষণা না করে সুবিনয় সহজেই বুঝিয়ে দিল তার বৌদির কাছে আমি 'মলি', 'না'-বর্জিত মলিনা! ছেঁটে-কেটে একেবারে ঘরোয়া, আপন করেই রেখেছে।

মৃদু হাসি আর করজোড় শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে আমাদের প্রথম পরিচয় শেষ হতেই সুবিনয়-এর সঙ্গে ওর ঘরে ঢুকলাম। এক নজরেই বুঝলাম

একেবারেই অগোছালো। জানালার ধার ঘেঁষে একটা চৌকি, শতভাঁজ চাদরে ঢাকা। কোণে একটা সস্তাদামের আলনা ; তাতে ঝুলে আছে ফাঁসির দড়িতে লটকে থাকা ওর পাঞ্জাবি, আলনার বাটামে হুমড়ি খেয়ে ঝুলে আছে ল্যাজ ঝোলা পাখিবমতো ওর পায়জামা, মেঝের টানে বিরস গেঞ্জি। এবং ইত্যাদি। এক কোণে একটা মাটিব কুঁজো গ্লাসের টুপি মাথায় দিয়ে ঘরে উপেক্ষিতার মতো চোখের-জলে মেঝে ভিজিয়ে কোনওক্রমে যেন বেঁচে আছে। ঘরে ঢুকেই বাঁদিকে আব একটা জানালার ধারে একটি বিবর্ণ পুরোনো টেবিল, টেবিলের উপর 'ঝড়ে' বিধ্বস্ত বই-পত্র খাতা-পেনসিল-কলম ; অমনোযোগী একটা চেয়ার টেবিলের পাশে সমতাহীন অবস্থানে মালিকের হ্যাঁচকা টানের অপেক্ষায় আড় হযে আছে। টেবিলের পিছনে একটা গোল করে গুটোনো মাদুর। উপরে একটা ঢাউস্ পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে একটা তাজা ক্যালেন্ডার। ব্যাচিলারের ঘরে সিনেমাস্টাবের ছবি-ক্যালেন্ডাবের বদলে একজোড়া বাঙ্ময় পাখির ছবি দেখে ভাল লাগল। বলেছিলাম, 'কি হাল কবে রেখেছো ঘবের ?' সুবিনয় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, 'নিজেই তো বে-হাল তাই ঘরের আর দোষ কি ?' 'দুষ্টুমি করে কথা বলবে না'—বলতে গিয়েই নজরে পড়ল বৌদি হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকছেন, সঙ্গে তাঁর পুত্র-কন্যা। থেমে গেলাম, অভ্যর্থনা জানালাম। 'বসুন, দেখি চা করা যায় কিনা'—বলে সুবিনয়-এর দিকে তাকালাম। 'ইকমিক কুকারের' হাতে-ফোস্কা সংসারে সবই আছে, নেই কেবল গোছান-গাছান সুব্যবস্থা। খুঁজলে সবই পাবে, চাই কি সাহায্যও করতে পারি।'

সেদিনের বিকেলটা আমার যেন বাতাসের মতো হাল্কা, তুলোর মতো ভাসমান আর কোকিলের গানের মতো মিষ্টি লাগছিল। শেষ বিদায়ের আগে সূর্যদেব আমাদের রাঙিয়ে দিয়ে গেলেন। গ্রামের উপান্তে সন্ধ্যার আগমনটা যেমন দ্রুত তেমনি আকর্ষণীয় মনে হল। কথায় কথায় আমরা স্মৃতির আলপনা আঁকতে বসেছিলাম. অনেক অতীত তাই সহজ হয়েই আমাদের বর্তমানের মন দুটিকে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। ভাবের নদীতে ভালবাসার তরীখানি প্রেমের স্রোতে ভাসমান, চলমান, ছন্দময় হয়ে তর্ তর্ করে শিশুরাত্রির চঞ্চলতা থেকে তরুণ অন্ধকারের আবেশঘন নির্ঘন্টের দিকে ছুটে চলেছিল। বাধা দেবার মতো মনের জোর ছিল না ; তাই অপেক্ষার অনুরোধে, সময়ের প্রার্থনায় সুবিকে সন্তুষ্ট-সমাহিত করতে সক্ষম হলাম।

সেদিনের রাত্রির আহারের ব্যাবস্থা ছিল বৌদির ওখানে। একটু আগে থেকেই সেখানে বসে গেল রাত্রির আসর। কবিতা, গান, গল্প, ধাঁধা আর চুটকির অনায়াস আনাগোনায় সবাই মিলে মন খুলে প্রাণভরে উপভোগের তরঙ্গে তরঙ্গে অনেকক্ষণই ভেসে ভেসে বেড়ালাম, এক সময় সেই আসর শেষ করে আমরা ফিরে এলাম সুবির আস্তানায়। সঙ্গে ব্যবস্থা মতো বৌদির মেয়েটি এলো—অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের একঘরে একা রাত্রি যাপন করতে নেই! তাই সামাজিক প্রয়োজনের প্রথাসিদ্ধ বন্দোবস্ত। আমার আর মিনুর ব্যবস্থা হল নিচে, মাদুর-বিছানায়। সুবি রইল তার নিজের সাম্রাজ্যে, চৌকির 'পালঙ্কে'।

সুবিনয় নিজের কবিতা শোনাল, পাশে বসিয়ে একটা ছোটগল্প পড়ল। রাতের অন্ধকার ঝরনার মতো মধ্যযামিনীর প্রবাহ থেকে আমাদের মনের পাথারে নেমে আসছিল। ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটা আলো মনের রুপোলী আভাকে যেন সুরের পরিবেশে ছড়িয়ে দিচ্ছিল, সুবির অনুরোধে একটা গান করতে হল, অনুচ্চ কণ্ঠে গানের মধ্যে মনের আকুতিটুকু তুলে ধরলাম। তন্ময় হয়ে শুনল। ঘনিষ্ঠতর হয়ে অনুভব করল। গানের রেশ বেয়ে বেয়ে আমরা মোহানার দিকে ভেসে চললাম। রাত গভীর হল; মিনু ঘুমিয়ে পড়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি যেন নোতুন সৃষ্টির চেতনায় মৌন, সাধনায় নিমগ্ন। বাইরের জগতের নিথর সবুজ রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। এটাই বোধহয় সব হারাবার সময়, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার সময়; তাই হোক, তাই হল।

গাছের পল্লবের অন্তরে কুঁড়ির আগমন বোধহয় এমন সন্তর্পণেই সংঘটিত হয়, শিশিরের দূর্বাশীর্ষে নিঃশব্দ অবতরণ মুহূর্তগুলোও বোধহয় এমনই পেলব, সুন্দর, মনোরম। প্রকৃতির আপন গৃহে চলছে অনাবিল নিরাবরণ হবার ছন্দ-বন্ধ নিবেদন, সব কিছুকে আপন করে, সব কৃত্রিমতাকে অপসারণ করে একের সঙ্গে অপরের মহামিলনের মহাযজ্ঞ। ঝিঁঝিঁ পোকারা থেমে গেছে নিজেদের পারিবারিক অপেক্ষা-আহ্বানের শেষে, পাখিরা পেয়ে গেছে শান্ত কুলায়, বৃক্ষরাজি বনলতা আবেশের একান্ততায় নীরব অস্তিত্বের সাধনায় মগ্ন; নদী শান্ত বয়ে চলেছে মোহানার দিকে, সমুদ্র তার বীচিবিক্ষুব্ধ বক্ষখানি তুলে ধরেছে আকাশের জন্যে, আমার মনে হল আমরা অমৃত-সন্ধানে

দুটি প্রাণ, জীবন মহাযজ্ঞে আহুতি-প্রদত্ত দুটি জীবন ; মধু, মধু মধু ; শান্তি, ওম্ শান্তি।

বৃক্ষ-স্বর্ণলতা বেষ্টন। কল্পনায় প্রভাত কিরণে আনন্দ আর সুন্দরের বিচ্ছুরণ যেন ভাস্বর মনে হচ্ছিল। 'ছাড়ি ছাড়ি করি ছাড়িতে না চায়' করে রজনীর ফিকে হাসিটি সমাসন্ন জেনে, বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী কড়া নাড়ে চেতনার দরজায় ; রাত্রি তো শুধু ঘুমের প্রজা নয়, শান্তির সম্রাজ্ঞীও বটে। পূর্ণকুম্ভ দেহ-মন নিয়ে তাই অবশিষ্ট রাতটুকু মিনুর পাশে কেটে গেল। বন্ধ-কপাট আঁখি-পল্লব বিনিদ্র যাপন করে সকালের ঊষা-কিরণের অপেক্ষায় ধ্যানে রইল অবশিষ্ট রাত্রি। সেতারের ঝংকারে আর বেহালার ছড়ে লঘু-সংগীতের মৃদু অনুরণন ছড়িয়ে গেল মনের পর্দায়, চোখের তারায়, প্রাণের ভরাট প্রবাহে। পূর্ণতার প্রকাশে, পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে রিম্-ঝিম্ মন আমার ফিরে পেল দশ বছরের পুরোনো আমাকে। সেই কাক-ভোরে আমি ময়ূর হয়ে গেলাম, প্রজাপতির ডানা পেলাম, সী-গালের পাখা পেলাম আর মনের সর্বত্রই যেন রামধনুর বর্ণছটা অনুভব করলাম।

সুবি ওঠার আগেই স্নান সেরে নিয়েছি। আজ আমার জীবনে নোতুন সূর্য উঠেছে, প্রাণের গভীরে প্রবেশের দ্বারটি আজ উন্মুক্তই ছিল ; আজ সকালে পাখির কণ্ঠে আমার কণ্ঠের গান দিকে দিকে উচ্চারিত হয়েছে, যে কুঁড়িটি সদ্য ফুটেছে সে তো আমারই মনের বৃন্তে। সব কিছুই এক, একই রকম। কিন্তু কতই তফাৎ হয়ে গেল একটি রাতের নদী-মোহানা সঙ্গমে!

সারাটা দিন ঝরঝরে আনন্দে, গল্পে, গানে আর আড্ডায় কাটিয়ে দিলাম। প্রজাপতির মতো ভেসে ভেসে ময়ূরের মতো নেচে নেচে, পাখির মতো উড়ে উড়ে সকাল পেঁছিল দুপুরে, দুপুর পেল বিকেলের পরিচয়। সুবি বাজার করে এনেছে ; আমি অনভিজ্ঞ হাতে গৃহিনীপনার হাতেখড়ি দিলাম ; গুরু, বয়সের অগ্রাহ্য-তফাৎ উড়িয়ে দিয়ে, বৌদির রূপ ধরে পথ দেখালেন ; মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ অহরহই তরঙ্গাঘাতে দেহ-কূলকে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ফিরেছে ; যত স্মৃতির ঝাঁকুনি ততই আনন্দের ঢেউ উথালি-পাথালি আমাকে অন্যমনস্ক করে তুলেছে। বৌদি সে সবকে অকুশলী জনের আড়ষ্টতা বলে মনে করে থাকবেন ; যে জানে সে সঠিক জানে।

অন্য দিনের মতো নয়, সকালটা যেন দৌড়ে বিকেলের দোরগোড়ায় পেঁছে

গেল। সুবিনয় আমাকে রাস্তায় সঙ্গ দিল, বাসের জন্যে বটতলায় অপেক্ষা করল, চিঠিতে কথা হবে জানাল। ওর চোখে আজ আর সেই একাকিত্বের ছায়া দেখলাম না। অনুচ্চ কণ্ঠে সুবিনয় জানাল, 'টোল তোমার গালেই নয়, কণ্ঠমাত্রেই নয়, সে আছে তোমার সর্বদেহে, সর্বত্র প্রাচুর্যের সম্পন্নতায়!' রাত্রি জাগরণ কাজল চোখে শাসন করলাম, মুখে হাত চাপা দিলাম সুবির। সেই সুযোগে ও আমার হাতের সঙ্গে বিদায়-সম্ভাষণ করে ফেলল!

যৌবনের দ্বারে বসেও এক স্তূপ তারুণ্যকে সঙ্গী করে ফিরে এলাম।

।। অপেক্ষা ।।

বার বার ভেবেছি কি হবে আমার কথা লিখে! জীবনের নদীতে সময় বয়ে যেতে যেতে জুলফিতে সাদার ছোপ পরিষ্কার হয়ে এলো। ঘাটে ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে বার বারই মনে হয়েছে মলিকে জানানো আমার উচিত ছিল, আমাকে ভুল বোঝার তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যে অধিকার আমিই তাকে দিয়েছি। আজকালের দীর্ঘসূত্রতার জালে জড়িয়ে গিয়ে এক সময়ে নিজেরই মনে হয়েছে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন কোনও ব্যাখ্যা, কোনও কার্যকারণ বিশ্লেষণেব চেষ্টা হাস্যকর মনে হতে পারে। তাই মলিকে জানানোটা আর হয়েই ওঠে নি।

গ্রামের সবুজের ছাপ মাবা একেবারে একা-একা গোছের যে সুবিনয়কে মলি আবিষ্কার করেছিল, যার অভ্যন্তরে নাড়া দিয়ে, আর একটা প্রেরণার উৎসমুখ খুলে দিয়ে, মলি রামধনুর বর্ণছটায় সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, "সুবি" করে কাছে টেনে নিয়েছিল৲ সেই সুবিনয়, আমি, আর একটা স্রোতের টানে আবার কোথায় হারিয়ে গেলাম। কথাটা যদিও আমার নয়, মলির। সে বলেছিল 'সুবি, শিক্ষকতার জীবনই তোমার প্রকৃতির জন্যে উপযুক্ত প্রকাশক্ষেত্র, সেখানে তুমি স্বাভাবিক, সু-সমঞ্জস। তোমার মধ্যে আছে সবুজের টান, অনুভবের গভীরতা আর তান-লয়-ছন্দের গতি। ধীর-স্থির দিঘি বা হ্রদের মতো তুমি সুপেয়, সজল, সরস। তোমার পক্ষে প্রশাসনের মরুভূমিতে শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। তুমি সরকারী আদেশ আর প্রয়োজন বোধের ধুনকরের হাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হবে, অপরের কাজে লাগবে না। তোমার মধ্যে যে তুমি এখন বাঁচার একাগ্রতায় সৃষ্টিশীল সেই তুমির অপমৃত্যু আমার সইবে না।'

এ-সব অনেক দিন আগের কথা। অনেক, অনেক আগের। সেই যখন আমরা একে অপরের স্রোতে সমৃদ্ধ হচ্ছিলাম, দুই কূলে বহমান দুটি নদী হঠাৎই একদিন মিলিত-প্রবাহ হয়ে চাঁদের আলোতে ঝলমল করে মোহানার দিকে স্বিকূল ছিলাম। তখন আমরা অতীতের জীবন থেকে সুন্দরের নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে ভবিষ্যতের জন্যে দ্বৈত-যাত্রার ভিত তৈরি করছিলাম।

আর সেই ভিতের উপর আমাদের বর্তমানের সঞ্চয় জমা করে করে কল্পনার সৌধ রচনা করে চলেছিলাম। সবই ঠিকঠাক চলছিল ঃ মিলনের তরীখানি তরতর বেগে প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত-নীরবে যাত্রাপথের মনোরম সব উপলব্ধিগুলোকে, সুন্দর সব তারকাখচিত মুহূর্তগুলোকে ভবিষ্যৎ জীবনের আঁচলখানিতে গ্রথিত করে চলেছিল। আকাশের নীল আমাদের আশীর্বাদ করে চলেছে, দুকূলের শ্যামলিমা আমাদের হৃষ্ট করে চলেছিল আর আমরা প্রেমের তৃপ্তিতে সম্পন্নতর হয়ে হয়ে স্বপ্নবিভোর দিন কাটাচ্ছিলাম।

এই সময়েই এসেছিল সেই ইন্টারভিউ-এর ডাক। মলির ভাষায় সুপ্ত-ঝড়ের ইংগিত। সেই সময়ে ও আমাকে আমার প্রকৃতি, আমার ক্ষেত্র এবং সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। নিষেধ করেছিল ইন্টারভিউ দিতে। আমি সেদিন ওর কথা শুনি নি। বলেছিলাম, 'ইন্টারভিউটা দিয়ে দিই ; হবেই এমন তো কথা নেই। অভিজ্ঞতা বাড়বে। আর যদি মনোনীত হয়েই যাই তা হলেও তো আমার আই. এ. এস. এ যোগ দেবার বাধ্যবাধকতা কিছু নেই ; আমার স্বাধীনতা তো থেকেই যাবে ঐ কাজে যোগ না দেবার।'

সেই প্রথম আমি মলিকে বিষণ্ণ হতে দেখেছিলাম ; দেখেছিলাম ওর গালের টোলটি ঘন কালো মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল। অনেকক্ষণ কিছুই বলে নি। আমি অনেক অকারণ বক বক করে আমার সিদ্ধান্ত বিষয়ে ওর সম্মতি পাবার চেষ্টা করেছিলাম। মাঠের ধারে ঘাসের উপর বসে বসে দ্বিভাজ হাঁটুর খাঁচে থুতনি ডুবিয়ে সেই যে ঘাসের শিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করা সে আমার এখনও চোখের সামনে ভাসছে। তার মৌনীর মধ্যে যে নির্বাক প্রতিবাদ ছিল তা আমি বুঝেছিলাম ; সম্মতি সে দেয় নি, দেবেনা বলেই। কথা বলেনি। কিন্তু বুঝি নি সেই প্রতিবাদের তীক্ষ্ণতা, সেই অসম্মতির গভীরতা। আমি যাকে হালকা ভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের একটা সম্ভাব্য সুযোগ বলে মনে করেছিলাম, আশা করেছিলাম, মলিও ব্যাপারটাকে সেই ভাবেই নেবে, সেদিন তাকে মলি সে ভাবে নেয় নি। মলি অনেক বেশি দূরে দেখেছিল বোধহয়, ওর বাস্তবতা বোধ, ব্যক্তি মনের জটিল টানাপোড়েন বিষয়ে ওর অবহিতি সম্ভবত ওর মনে সেদিন ঈশান-কোণে রাঙা মেঘের সংকেত দিয়ে থাকবে। সেদিন আর ছন্দ ফিরে আসে নি, লয় হারিয়ে গেছিল, নিঃশব্দ পদক্ষেপে আমরা নিজ নিজ ভাবনার বোঝা ঘাড়ে করে ফিরে এসেছিলাম।

মলির সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। চিঠি পত্রের চলাচল অনেকদিনই ছিল। সে সব চিঠিতে আমি প্রাণের ছোঁয়া দিতে সচেষ্ট থাকতাম ; কিন্তু মলি পাঠাতো শুধুই উত্তর! অতীতের চিঠিতে দুটি মাত্র কথায় যে উদ্বেল ঢেউ উঠতো মলির মনে, এখন, ইন্টারভিউ সমাপন করে ফিরে আসার পরে, শত শব্দের ঝড়ো বাতাসেও সেই মৌন মনে তরঙ্গ-মাত্র সৃষ্ট হত না। আমি যতই উচ্ছ্বসিত হয়ে দিল্লির অভিজ্ঞতা জানাতাম, সম্ভাব্য সাফল্যের আনন্দ প্রকাশ করতাম আর ভবিষ্যৎ জীবনের, আই. এ. এস. জীবনের, কর্মমুখরতার ছবি আঁকতাম, সে সবই ওব মনের বরফ-শীতল ঠাণ্ডার স্পর্শে হারিয়ে যেতো। ওখানে, ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে, যাদের যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাদের কথা লিখেছি ; কলকাতার, কলকাতার বাইবের বাঙ্গালীদের এবং অন্যান্য ভারতীয়দেব কথা সবিস্তার বর্ণনা করে ওকে জানিয়েছি। এমন কি বাণীর কথাও ওকে লিখে জানিয়েছি। সে ওর সহপাঠিনী ; মলিকে বেশ ভাল ভাবে চেনে বলেই জানিয়েছে—সে কথাও লিখেছি। যেবাব আগে তাজমহল দেখে এসেছি এবং সেই জ্যোৎস্না সন্ধ্যাব বিস্তারিত বিবরণ ওকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে কাব্যময় করে লিখেছি। বাণী যে তাজমহল দেখে কতোটা অভিভূত হয়ে পড়েছিল তার বিবরণ দিয়েছি। বলেছি সে যাত্রায় আমার তাজমহল দেখা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে মলি সঙ্গে ছিল না বলেই। সে সব চিঠির কোনটার উত্তব পেয়েছি, কোনটার পাই নি। যা পেয়েছি তার মধ্যে উষ্ণতার ছোঁয়া নেই, আছে বাস্তব জিজ্ঞাসা। কখনও কখনও কেবল মাত্র বিস্ময়ের প্রকাশ ঃ 'ওঃ তাই নাকি ?' গোছের দ্ব্যর্থকতা।

এখন মনে পড়ে নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে আনন্দের প্রকাশ ঘটিয়ে বেশ ঘটা করে ওকে পরামর্শের জন্যে ডেকেছিলাম। দীর্ঘক্ষণ সময় কাটিয়েছিলাম 'কফি হাউসে'। সেই ভিড়ের মধ্যেও আমরা একান্ত হতে পেরেছিলাম এক কোণে। কঠিন মেঝের মসৃণতায় মলির যত মনোযোগ ছিল তত আগ্রহ ছিল না আমার আনন্দের অভিষেকে। অন্ততঃ সেদিন আমার তাই মনে হয়েছিল। বলেছিলাম, 'লিয়েন নিয়ে কাজে যোগ দিয়ে দেখাই যাক না কেমন লাগে নোতুন জীবন। ট্রেনিং আছে, পোস্টিং আছে, এবং হাতে সময়ও তো থাকবে। স্কুল লিয়েন দেবে বলেছে।' নদীর জলের একেবারে কাছাকাছি মাছরাঙাদের স্থির ভেসে থাকার মতো করে মলি আমার চোখের মণিটির উপর নিজের ঘন

কালো দৃষ্টিটি অনেকক্ষণ স্থির রেখে যেন সেখানে আদ্যোপান্ত দেখে নিল। আমার বেশ অস্বস্তি লাগছিল। মলি চোখ সরিয়ে নিল না। প্রশ্ন করলাম 'কী দেখছো অমন করে?' চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তখনই কোনও উত্তর দেয় নি। পরে চিঠি লিখে জানিয়েছিল।

"প্রিয় সুবিনয়, সেদিন কফিহাউসের হাটের মধ্যে তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তর তোমর নিজেরই জানার কথা। কিন্তু তুমি তা না বলে দিলে জানতে পারবে বলে আমার মনে হয় নি। তাই এ চিঠি। তোমাকে কেন 'সুবি' বলে সম্বোধন করলাম না, সে প্রশ্নও তুমি করতে পার। সুবিনয় কে আমি 'সুবি' করে তোমার চেতনার জগতে যে শিল্পীর প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সে এখন পথহারা। তোমার নোতুন নাম আমার জানা নেই; তুমি আর একবার নবজন্ম গ্রহণ করতে চলেছো। সেই ভবিষ্যতের নাম জানা নেই বলেই তোমাকে তোমার অতীতের নামেই সম্বোধন করেছি।

অমন করে সেদিন তোমার চোখে আমি খুঁজেছিলাম সেই নবীন সবুজকে, সেই জলপাই-প্রাণবন্ততাকে যা আমি অনেকবারই তোমার চোখের গভীরে খুঁজে পেয়েছি। সে হারিয়ে গেছে। সেদিন তোমার দৃষ্টির অতলে সাগরের নীলকে খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম। পাইনি তার দেখা। তোমার জীবনের সমুদ্রে আর আকাশ কথা বলছে না, সুবিনয়, তুমি এখন ধূসর চোখে ক্ষমতা আর সম্পন্নতার স্বপ্ন এঁকে চলেছো, তোমার চোখের তারায় তখন কর্মচঞ্চল সমৃদ্ধ জীবনের হাতছানি দেখেছিলাম। তুমি তোমার গ্রামের অতীতকে হারিয়ে ফেলেও আবার নোতুন করে নিজের সৃষ্টি চেতনায় খুঁজে পেয়েছিলে। কিন্তু এবারে তুমি তোমার নিজেকেই হারাতে চলেছো। তোমার অতীতকে, বর্তমানকে আর, সবথেকে বেদনাদায়ক, তোমার শিল্পী অস্তিত্বকেও। তোমার চোখের গভীরে আমি সুন্দরের নয় ভোগের ঝিলিক দেখেছি সেদিন, সৃষ্টির নয় শাসনের আবেগ দেখেছি, তৃপ্তির নয় তৃষ্ণার হাহাকার শুনেছি।

আমার বিশ্বাস তুমি সুবি'তে সত্য, সুবিনয় তোমার প্রস্তুতিপর্বের অস্তিত্ব; আর শাসনের যে আভরণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সে তোমার অবসানের ক্ষেত্র। এটা আমার বিশ্বাসই নয়, বলতে পার আমার প্রত্যয়। উৎস থেকে সচল-সবল সম্ভাবনাটি নদী হয়ে জীবনদায়িনী হয়ে ওঠে; সেই নদীই আবার প্রাণঘাতী দুর্বিনীত দুকূলভঙ্গকারী দুঃখ হয়েও

প্রকাশ পায়। কোনও পর্বটাই মিথ্যে নয়; সত্যে স্থির থাকা নির্ভর করে পরিবেশ পরিস্থিতির টানাপোড়েনে। তুমি এখন ধেয়ে চলেছো সুবিনয়, তোমার এই গতি রোধ করা তোমার নিজের পক্ষেও আর বোধহয় সম্ভব নয়। তাই তোমাকে কিছুই বলি নি সেদিন! এবং তারও আগে। আজ বলে রাখতে ইচ্ছে হল এই ভেবে যে আমরা যখন ইতিহাস হয়ে যাবো, যখন আমাদের জীবনে অতীতটাই একমাত্র সত্য বলে মনে হতে থাকবে, তখন যেন আমরা একে অপরকে ভুল না বুঝি। যে সুবিকে আমি আবিষ্কার করেছি সুবিনয়ের মধ্যে, যার নোতুন স্রোতের আমি ভগীরথ সেই সুবি যদি কখনও আবার আমার জীবনের সরস- সচল বেলাভূমিতে সবুজের সমারোহ বয়ে আনে তখন হয়তো আমায় ফিরে দেখার সময় আসবে। তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে; তখন হয়তো আমার যৌবন আমার প্রৌঢ়ত্বের আবরণে 'মমি' হয়ে স্মৃতি হয়ে যাবে। তা যাক্; তবুও সেই অনাগত দিনের কাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্যে আমার জীবন মরুতে তুমিই হবে পিরামিড। আমি হারিয়ে গিয়েও আমার অতীতের মধ্যে সত্য থেকে যাব।

এই চিঠিকে তুমি আমার শেষ চিঠি বলে মনে করতে পার; মনে করতে পার এটা আমার মলি-থেকে মলিনায় প্রত্যাবর্তন; 'অপ্‌টিমিজিমের' উজ্জ্বল থেকে 'পেসিমিজিমের' অন্ধকারে। আর এখন থেকে তুমি আর 'সুবি' নও, তুমি সুবিনয়, তোমার সামনে ভারতব্যাপী কর্মক্ষেত্র, আলোঝলমল জীবনের হাতছানি, শাসন-যন্ত্রের দণ্ড হাতে তুমি হবে দণ্ডধারী, সংহারের দেবতা; সৃষ্টির বেদনা তোমাকে আর স্পর্শ করবে না, অন্তরের দুঃখ যে কবিতায় ফুল হয়ে ফুটে ওঠে সেই অনুভব থেকে তুমি থাকবে অনেক অনেক দূরে। আর তাই, আমার থেকেও।"

তার পরে কতো দিন, কতো মাস, বছর, পার হয়ে গেল। গোনাগুনতির বাইরে, হিসেবনিকেশের বাইরে। ফেলে আসা জীবন কোথায় হারিয়ে গেল তীব্র জীবনস্রোতের গতি পথে তা টেরও পাই নি। স্থান থেকে স্থানান্তরে, কর্মক্ষেত্র থেকে কর্মক্ষেত্রে ছুটে বেড়িয়েছি। মনের সচেতনে সমস্যার দাপাদাপি, সমাধানের হাতছানি আর নোতুন নোতুন যোজনা-পরিকল্পনা-রূপায়ণের দায়-দায়িত্ব। সময় আর ঘণ্টার মাপে ধরা পড়ে না, মিনিট-সেকেন্ডের পরিমাপে আসে যায়। ব্যক্তিগত জীবনের অবশিষ্ট যা কিছু অফিসের সিংহ-ভাগ-

ভোজনের পরে আমার ভাগে পড়ে থাকে সে সব কাটে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায়, উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় আর প্রতিযোগিতার আগুনে ঝলসে গিয়ে। যদি কিছু বেঁচে থাকে তা ঘুমের আরাধনায় আর পার্টির সহবতে নেশাগ্রস্ত রজনীর গভীরে হারিয়ে যায়। স্কুলের জীবনে সময় ছিল অফুরন্ত; এখন আমার জীবনে সময় ফুটন্ত কটাহে অহরহ সমস্যার আগুনে টগবগ ফুটছে। টগবগ ছুটছে। অবকাশগুলোও যেন কেমন সামাজিক-অফিসিয়াল দড়িদড়ায় পরাধীন। নির্দিষ্ট পোশাক-আশাক, মাপা-মাপা পা ফেলা, ঘড়ি ধরে ওঠাবসা স্ন্যাকস্-ড্রিংক্স-ডিনার। ফাঁকে ফাঁকে কমা-সেমিকোলন-ফুলস্টপের মতো এখানে করমর্দন, ওখানে মৃদু-হাস্যে স্বাগত-জ্ঞাপন, সেখানে গ্লাসের সঙ্গে গ্লাসের রিম-ঝিম টোস্ট-সঙ্গীত, দেহ-পান, শুভ-কামনা। প্রশংসা, নিন্দা, বাহবা, সমালোচনা। এখানে রাত্রির শৈশব ধরা পড়ে না মন দেওয়া নেওয়ার পটভূমি হয়ে, ধীর গতি যামিনী তারুণ্যে চঞ্চলতা পায় না, রজনী আসে না গভীর দ্যোতনা বয়ে নিয়ে। এখানে উত্তরসন্ধ্যায় যে সমাগম তা তরল-যৌবনের আকণ্ঠ পানে চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়, নাকের ডগায় সির-সির অনুভব ক্রমে অদূরের দৃশ্যকেও নজরের বাইরে করে দেয়। একেই এখানে অবসর যাপন বলা হয়।

উত্তর যৌবনে এসে একসময় সব যেন কেমন বিরস শুষ্ক মনে হত মাঝে মাঝেই। প্রথম প্রথম একে ক্লান্তি জনিত অবসাদ বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে দ্রুত এবং সদা ধাবমান জীবন যন্ত্রে এই অবসাদ অত্যন্ত স্বাভাবিক। হয়তো কেটে যাবে কিছু বিশ্রাম নিলে, ক'এক দিন শান্ত জীবন যাপন করলে। তখন বুঝি নি আমার অবচেতন আমাকে অবসন্ন করে দিচ্ছে, আমার মধ্যে যে একটা সৃষ্টির প্রেরণা ছিল তার অবসানে আমার ভিতরের আমি প্রতিনিয়ত আমার জাগ্রত স্বার্থপর আমির হাতে মার খেয়ে খেয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল। বাইরের অবসাদ সেই ভিতরের আমিকে অন্তর-বীক্ষণে সামনে আনতে চাইছে, সচেতন স্তরে উঠে এসে আমার সঙ্গে একটা সামনাসামনি বোঝাপড়ায় নামতে চাইছে। সেই অজ্ঞাত বিস্মৃত অন্তরের কোনও এক প্রকোষ্ঠে যে মলিনা অপেক্ষা করেই চলেছিল সে কথা কোনও দিনই আমার মনে হয় নি।

দীর্ঘ কর্মজীবনে পেয়েছি অনেক, ভোগ করেছি তার চাইতেও বেশি। সাধারণ দৃষ্টিতে যাকে ভোগ করা বলে—সুন্দর বাসস্থান, উজ্জ্বল উপভোগ

ভোগ্যসামগ্রীর অঢেল উপকরণ আর যোগান, মুক্ত বিহঙ্গের মত যত্রতত্র বিচরণ আর তৃপ্তির গুনগুন ধ্বনি মৌমাছিরমতো ফুলে ফুলে মধুর অন্বেষণ, সুন্দরের সান্নিধ্য, আনন্দের হাট। বৈচিত্র্যের স্বাদে বর্ণে গন্ধে জীবনকে মনে হয়েছে বর্ণময়, সার্থক। গতিশীল কর্মরথের ঘরঘর যন্ত্রঝংকারকে মনে হয়েছে পরমার্থ, উন্নতির ধাপে ধাপে স্বর্গের সুষমা হাতের মুঠোয় এসে গেছে বলে মনে মনে প্রসাদ অনুভব করেছি : এই তো জীবন, এই তো সার্থকতা, এই তো সমৃদ্ধি!

বীণা, রীনা, বাণীদের বাস্তব নৈকট্যে কল্পনার মলি কখনও মনে স্থান পায় না ; কিন্তু এই বিকেলের প্রলম্বছায়া জীবন বেলায় মাঝে মাঝেই আমাকে পেয়ে বসে, আমার আধো-জাগা আধো-ঘুম একা নিশীথের একাকিত্বে উঁকি ঝুঁকি দেয়। মনে রাখতে পারি না। মাঝে মাঝে অভিমান দানা বেঁধে ওঠে কেন আমাকে তেপান্তরের মরুসাহারায় সে অমন করে নিঃশব্দে ছেড়ে দিল, ছেড়ে দিতে পারল। তখন মনে হয়েছিল গ্রামের ছায়ায় শিক্ষিকার মন দিয়ে মলি আমাকে, আমার 'এ্যমবিশন'-কে সঠিক উপলব্ধি করতে পারে নি, মনে হয়েছে ওর প্রস্তুতি ছিল না, মনে হয়েছিল মলি বোধহয় ঘড়ায় তোলা জলের প্রতিই আকৃষ্ট, প্রাচুর্যের অনুভব নেই বলেই প্রচুরের প্রতি ওর অনীহা। এক ধরনের সুখ আছে অকিঞ্চনের আকর্ষণে, তৃপ্তি আছে গতানুগতিকতায় ; মনে হয়েছে আত্মপীড়নেও সুখ পাওয়া যায়, দারিদ্র্যের মধ্যেও বোধ হয় থাকে কোনও আত্মশ্লাঘা। মনোবিজ্ঞানে এসবের ব্যাখ্যাও আছে। তাই যখন অতীতকে পিছনে ফেলে ভবিষ্যতের টানে ছুটে চলেছিলাম তখন মলিই যে ভুল করেছে সে বিষয়ে আমার মনে কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। তাছাড়া মলি যে আমাকে তেমন করে পিছনে টানে নি, পথের মাঝে আমাদের অতীতকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পথরোধ করে নি তাতে ওকে বেশ সাধারণ আর নিজেকে অনেকটাই মুক্ত মনে করেছিলাম। সে যে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল, বন্ধনের সম্ভাব্য একটি সূত্রও উল্লেখ করে নি তাকে আমি স্বস্তির বলেই মনে করেছিলাম।

এখন মাঝে মাঝেই মলি আমায় শয়নে স্বপনে জাগরণে বিব্রত করে। ওর কথা যেন ক্রমশই আমাকে আনমনা করে দেয়। সহকর্মীরা আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিশ্রাম নিতে বলে ; বন্ধু-বান্ধবেরা আমার গৃহী না হওয়াটাকে দায়ী করে। আমার নিজের মনে হয় আমি যেন কেমন ছিন্নসূত্র নোঙর-ছেঁড়া

হয়ে যাচ্ছি। কাজ করি কিন্তু মন বসে না, বিশ্রাম সময়ে শান্তি মেলে না, অবসর সময় আমাকে অবসন্ন করে তোলে। সঠিক বুঝি না কেন এমন হয়, কেন এমন হচ্ছে।

ইদানিং মলি আমার স্মরণ জগতের অনেকখানিই দখল করে রাখে। আমার তরফে যে বিশেষ কোনও চেষ্টা আছে তা নয়; সচেতনে বরং মলি আমাকে অনেক অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। ওর সেই স্থির মাছরাঙা দৃষ্টি, সেই নীরব সমর্থনহীনতা, আলোচনার চাইতে ঘাসের শিষের প্রতি অধিকতর আগ্রহ আর 'কফিহাউসের' মসৃণ মেঝের প্রতি একান্ত মনোযোগ—এ-সবই আমার অজ্ঞাতেই আমার মনের পটে ছবি ছবি ভেসে ওঠে। অবচেতনের প্রভাব? আকৃতি? জানি না; তবে বুঝি যে মলি আমাকে ত্যাগ করেনি, আমারই মনের কোনও এক অজ্ঞাত অপরিচিত কোণে দিন গুনেছে এতোদিন সংগোপনে। সে যে আমাকে মুক্তি দিয়েছিল অত্যন্ত সহজে সে আসলে আমারই মনের ভুল, চিন্তার দৈন্য; সে আমাকে ছেড়ে দিয়েই বেশি করে ধরে রেখেছে। পাহাড়ের মতো বাধা হয়ে আমার চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সমতল সহজ বুকে আমার গতিপথের যথাখুশি চলনকে সহজতর করে দিয়ে অকারণ অনেক ঘুরপাক খাইয়েছে। আমার মন এখন মোহনামুখী? তাই কি?

মলি আমার জীবনে অতীত। অতীত না ভবিষ্যৎ? দীর্ঘ-বর্তমান ধরে মলি কোথায়ও ছিল না। এখন কেন মলি আমার মনে আলোড়ন তুলছে? তাই একদিন এই দ্বন্দ্ব আর অস্বস্তির মূল ও মূল্য নির্ণয় করতে পুরোনো দিনের দিকে ফিরে গেলাম। মলির চিঠিগুলো ফেলে দেই নি। তাদের আবার বাইরে এনে বর্তমানকে দেখার চেষ্টা করলাম। চিঠিগুলো পড়লাম আর মলির কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম।

যে চিঠিখানাকে মলি তার শেষ চিঠি বলে ঘোষণা করেছে সেখানা বার বার মন দিয়ে পড়লাম। অনেক ক্লেশ, বিস্তর গ্লানি আমার ধুয়ে গেল। মনে হল যেন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, আর আমি সেই বৃষ্টিতে স্নান করে শান্ত হয়ে গেলাম।

ভুল। শুধুই ভুল করে গেছি। আর সেই ভুলের পাহাড়ে আজ নিজে পিষ্ট হয়ে হাঁস ফাঁস করে মরছি। ঠিক করলাম নোতুন করে জীবনের সত্যে আলোকপাত করতে হবে, নোতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। আমি যে

এতোদিন আমার নিজের জান্তব দেহখানা বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা যেন বেশ পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আমার আবাস, আমার অফিস, আমার উপভোগ আর আমার আনন্দ উন্নতি সম্পন্নতা—এই আমার আমার করে নিজেই আমি আমার অন্তরটাকে খুইয়ে বসে আছি। আর যদি কিছু অবশিষ্ট এখনও থেকে থাকে তবে তা আছে সেই জায়গায় যেখানে মলি বসে আছে সংগোপনে। মলির মনের বিশালতাকে পরিমাপ করতে পারিনি ; উল্টে তাকে ঘড়া বলে ভুল করেছি ; যে অত সহজে মুক্তি দিতে পারে সে যে নিজে কতখানি মুক্ত তার কোনও আন্দাজ করতে পারি নি ; যে নিজে স্বাধীন সেই পারে অপরকে অনায়াস স্বাধীনতা দিতে ! আমার 'এ্যমবিশাস্' মনের আয়নায় মলির স্বচ্ছ-সনাতন মনের ছায়া পড়েনি একেবারেই। এ আমার ভুল, আমার বিড়ম্বনা।

আমার চেতনার মধ্যে মলি নিশ্চয়ই আধুনিক অসুস্থতার 'নিদর্শন' দেখেছিল। শহরের 'নিওন লাইটের' টানে গ্রামের সন্ধ্যাপ্রদীপ নিভে যাচ্ছে ; 'কন্জিউমারিজিমের' তাড়নায় ব্যক্তি অভীপ্সা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ছে ; 'এ্যমবিশন' মানুষের অন্তরের গভীরে উৎকেন্দ্রিক গতি এবং দিক নির্দেশ করে চলেছে। অনেক মূল্য দিয়ে আমি যা এতোদিনে উপলব্ধি করেছি সে সত্য বোধহয় স্বচ্ছদৃষ্টির সরল প্রকাশে মলির কাছে স্বাভাবিক ধরা দিয়েছে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে যেমন সহজ স্বাভাবিক চলনে চালনা করা যায় না তেমনি মলিনা হয়তো সেই চেষ্টাই করেনি ; আর তাকেই আমি মুক্তি বলে মনে করেছি, স্বাধীনতা বলে ভেবে নিয়েছি ! রূপই শুধু জ্বালায় তাই নয় আধুনিকতার ঔজ্জ্বল্যও আমাদের অনেককেই শ্যামা পোকা করে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যেতে সাহায্য করে।

বিবর্ণ-বিশীর্ণ নিঃশেষিত সুবিনয়, আমি, এখন তাই বার বার মলির কথা স্মরণ করছি। বাণীর সংগে যোগাযোগ করে মলির খবর পাবার চেষ্টা করেছি, আমার বিষয়ে মলির মনোভাব জানার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছি। মলি তার পুরোনো স্কুলেই আছে। সহকারী-প্রধানা শিক্ষায়িত্রী। ছাত্রীঅন্ত জীবন। স্কুল সর্বস্ব অস্তিত্ব। ব্যক্তিগত জীবনের একাকিত্ব মলিকে পীড়া দেয় না ; সকলের মধ্যে সে নিজেকে সত্য করে তোলার ব্রত নিয়েছে। আমার বিষয়ে মলির আগ্রহ আছে, কিন্তু কোনও আকর্ষণ প্রকাশ করে নি। আমি যে

নিতান্তই একা, আমি যে আমার হৃদয়ের সত্তাকে হত্যা করে মনের তাৎক্ষণিক সম্পন্নতাকে নিয়েই বেঁচে আছি, এবং অনবহিত হয়েই, সেই কারণে মলি এখনও দুঃখ প্রকাশ করে। আমাকে কেন্দ্রকরে মলি তার অতীতটুকুকে অত্যন্ত সযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছে; কিন্তু আমাকে নিয়ে তার কোনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তার মনে বিষাদের বিন্দুমাত্র ছায়া ফেলে না। স্বাতীনক্ষত্রে ওর মনের ঝিনুকে সৃষ্ট মুক্তাটুকু মলি নিজের কণ্ঠে অলংকার করে ধারণ করে রেখেছে, কণ্ঠকে নীল হতে দেয় নি। বাণীকে ও বলেছে "যে প্রেমের ফুল কুঁড়ি থেকে পূর্ণতা পায় সে যদি কোনও পুজোয় নাও লাগে তাহলেও সে তার অস্তিত্বের সৌন্দর্যে, সৌরভের মাধুর্যে, বর্ণ-গন্ধের সম্ভারে সমান সত্য হয়েই তার ক্ষণমাত্র জীবনে সার্থক হয়ে ওঠে। ফুলের জীবন কেন চিরস্থায়ী নয়, কেন সে দৈনন্দিন সংসারের কাজে লাগে না—তা নিয়ে ক্ষোভের কোনও কারণ তো নেই। যা দিয়েছি তা যেমন মিথ্যা নয়, তা পেয়েছি তাও ঠিক তেমনি সত্যি; এবং তাই তা চিরদিনের।"

অনেক ভেবে নিজের মনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার বাসনায় মলিকে চিঠি লিখেছিলাম। বলেছিলাম দুঃখপ্রকাশ বা অনুশোচনা কোনও অবস্থাতেই আমাদের জীবনের হারিয়ে যাওয়া দীর্ঘ কুড়িটি বছরকে ফিরিয়ে দেবে না, নোতুন করে সার্থক করে তুলবে না। তবুও সব বিস্তারিত জানিয়ে মলিকে আমার অবশিষ্ট জীবনের 'স্টিয়ারিং'-টি স্বহস্তে গ্রহণের অনুরোধ করেছিলাম। যদি কিছুমাত্র অবশিষ্ট থেকে থাকে সুবিনয়-এর প্রত্যন্ত জীবনে তাকে অন্তত বাঁচানোর আবেদন করে মলির মতামত জানতে চেয়েছিলাম। নির্দেশ চেয়েছিলাম।

মলিকে আমার মনের বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়েছিলাম। দীর্ঘ কর্মজীবনে ঊষার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, ভোরের নম্র আলো আমার জেগে ওঠাকে আলোকিত করেনি বহুদিন; আমার জীবন থেকে সবুজের নির্মূল অপসারণ শিশিরের সম্ভাষণকে অবসিত করে ফেলেছে। পিচ্-ঢালা পথে দ্রুত চলমান গাড়িতে বসে কখনও কখনও দূরে দুপুরের তীব্র রোদ্রের ঝলসে যাওয়া রাস্তায় মরীচিকা অনুভব হলেও, মনে হয় যেন কতোদিন প্রান্তরের জ্যোৎস্নাস্নাত স্নিগ্ধতা নজরে পড়েনি। বিকেলগুলো অকারণ ক্লান্তি বয়ে এনেছে; কখনই আলো আর মেঘের দিনান্ত আলাপনের মাধুর্যটুকু ধরে

দেয়নি। তাই আমার অন্তরের গভীরে মনের চোখের জল জমা হয়ে হয়ে আমাকে অসহায় করে তুলেছে। সার্থকতা খুঁজতে খুঁজতে নিজেকে শেষ জীবনে এসে একেবারেই শূন্য করে ফেলেছি; রিক্ততাই আমার জমার ঘরে হাহাকার হয়ে বেড়ে উঠেছে। অসাধারণত্বের সাধনায় নিজেকে একেবারেই সাধারণ থেকে সাধারণ বলে টের পেয়ে গেছি। আর জেনেছি যে তুমি নিজেকে অত্যন্ত সাধারণ বলে মনে কর বলেই তোমার মধ্যে একটা অসাধারণ সহজ হয়ে সদাই বিরাজ করছে। তুমি কি পার না তোমার সুবিকে ফিরিয়ে দিতে তার মধ্যে এখনও বেঁচে থাকা অবশিষ্ট তোমার সৃষ্টিটুকু ?

মলি আমার চিঠির কোনও উত্তর দেয়নি। একাগ্র অপেক্ষা যখন বেদনার পর্যায়ে পৌঁছেছিল তখন বাণীকে বলেছিলাম 'তোমরা, মেয়েরা ক্ষমা করতে শেখনি, তোমরা বজ্রের মতো কঠোর আর ধরিত্রীর মতো নিথর।' বাণী আমার বিষয়ে অনেক জানে, আমার অতীত, বর্তমান। আমার আনন্দ যন্ত্রণা, দিশাহীন যাত্রাপথ আর অনুশোচনার দুঃখ। তাই বোধহয়, অনেকদিন পরে হলেও, মলিনার খবর সংগ্রহ করে এনেছিল। মলিনা ওকে বলেছিল 'সুবির সময় হয়নি ফেরার। নিজের মনের মধ্যে যার ফেরার জোর স্বতঃই তৈরি হয় না, যে পরের নির্দেশের অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে, পথ তাকে কখনই ডাক দেয় না। সুবির মধ্যে আবেগের মাত্রাটা বরাবরই একটু অধিক। আবেগ-অনুভব সৃষ্টির চেতনায় পেয় নদী হয়ে নিজেকে এবং সমগ্র জনপদকে সমৃদ্ধ করে। দামাল স্রোতকে বেড়ি পড়ালেই তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হবার মতো শক্তির উৎসটি সভ্যতাকে আলো দেয়, শস্যকে সজল-সরস-সুফলা করে তোলে। ওর সেই আবেগের স্রোতটি আমার সংস্পর্শে এসে উন্মুক্ত হয়ে গেছিল, গতি পেয়ে সুপেয় নদীতে, বেড়ি পরে সার্থক ব্যবহারে সত্য হয়ে উঠছিল। আর সেই সময়ে ও আমার স্পশর্কে আমার বন্ধনকে অস্বীকার করে গতি আর সম্পদের, আধুনিকতার আর এ্যমবিশনের টানে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তখন যদি ওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতাম তাহলে সুবিনয় দুর্বিনীত হয়ে উঠতো, ফেরার সব রাস্তা একটি একটি করে বন্ধ করে দিত। আজ যে ওর ফেরার টান নিজের ভিতর থেকেই উৎসারিত হয়ে উঠেছে, সেখানেই ও নিজের আত্মোপলব্ধিকে খুঁজে পাবে।' বাণী চুপ করে শুনে যায়। কোনও কিছু বলাটা ওর পক্ষে শোভন হবে কি না সেই ভেবে নীরবতাকেই বেছে নেয়।

মলি অনেকটাই স্বগতোক্তির মতো করে বলে। "প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি—এসব তো কখনও অপরের নির্দেশে প্রকাশ পায় না ; সময় হলেই হৃদয় সাড়া দেয়। সুবির এখনও সময় হয়নি। কুঁড়ির উন্মেষ তো পাখির ডাকের অপেক্ষায়, ভ্রমরের গানের জন্যে ঘটে না ; ওরা ফুলের আবির্ভাবেই গান গেয়ে ওঠে। সুবির মনে এখনও বৃন্তের বেষ্টন ; সময়ের ক্ষণটি উন্মুখ হয়ে ওঠেনি। তাই ওকে আমি উত্তর দেইনি। রাতের যে নীরব অপেক্ষা নবারুণের উদ্ভাসের জন্যে, অঙ্কুরোদ্গমের জন্যে উষ্ণ ধরার বুকে শস্যদানার যে বৃষ্টির প্রতীক্ষা সে কি মন্দিরের শঙ্খের ধ্বনির বা চার্চের ঘণ্টার অপেক্ষা রাখে ?"

মনের গভীরে কান পেতে আমি তাই সময়ের পদধ্বনি শুনতে অপেক্ষা করেই আছি।

———

।। শেষ আভা ।।

আভা সান্যাল এখন আর চোখে ভাল দেখতে পান না। চোখ দুটো সারা জীবন দেখে দেখে যেন আবছা হয়ে গেছে। অতি ব্যবহারের পীড়নে দৃষ্টিতে বারে বারেই বেদনাবোধ চিনচিন করে উঠেছে। এখন যা কিছুই দেখেন তা সবই যেন ঘোলা ঘোলা অস্পষ্ট। কেউ এলে ঠিক ঠাক চিনতে পারেন না। বলে ওঠেন, 'কে রে? মিলু নাকি? তপা নাকি?' দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিকেলটা একটা জলচৌকির উপর বসে বসে কাটান; রাস্তার দিকে মুখ করে থাকেন। দেখেন না কিছুই। দেখলেও কিছু ঠাহর করতে পারেন না। নড়াচড়া টের পান। বাইরেও টের পান, রাস্তায়। ভিতরেও টের পান, মনের মধ্যে। কপালের নিচে চোখ দুটোয় বর্তমান ঠিক ঠিক ধরা পড়ে না বলেই বোধহয় মনের চোখ দুটো অনেক স্পষ্ট করে অতীতকে দেখতে পায়। কিছুদিন আগেও তো এমন ছিল না। আভা সান্যাল অবাক হয়ে ভাবেন। তখন তো বর্তমানটা বেশ পরিষ্কার দেখতে পেতেন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলো এই সেদিন পর্যন্তও তো বেশ তরতাজা নড়াচড়া করতো। তাহলে?

এই একটা 'তাহলে?'—নিয়েই আভা সন্যালের দিন কাটে না। এখন তাঁর জীবনে এমন বহু 'তাহলে' তার সকাল দুপুর রাত্রির সংগ্রহ। সবগুলোর উত্তর তিনি খুঁজে পান না। আদৌ কোনটার উত্তর পান কি না সে বিষয়েও তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সন্দেহ আছে কিন্তু ভাবনার অন্ত নেই। জীবনের সুপ্রশস্ত কাঁথাখানায় সেই তরুণ বয়স থেকেই ফোঁড় দিয়ে দিয়ে নক্সা তৈরি করে এসেছেন। মনে মনে নক্সা এঁকেছেন আর ফোঁড়ের পর ফোঁড় কেটেছেন। যা করতে চেয়েছেন তা কখনও হয়েছে কখনও হয় নি। ইচ্ছের নক্সাগুলো একে একে পাল্টে গেছে, উল্টে গেছে। আবার নোতুন করে ফোঁড় তুলেছেন। সেই কাঁথাখানা অসম্পূর্ণই থেকে গেল। যে কাঁথাখানাকে তিনি জীবনের শয্যাকে সমৃদ্ধ করবেন বলে সারাজীবন সচেষ্ট থেকেছেন সেইখানাই এখন তিনি পেতে বসে আছেন! অসহায় অসম্পূর্ণতা আর নিরালম্ব নির্জনতায় সেই সারাজীবনের সৃষ্টির উপর স্থানুবৎ বসে বসে আভা সান্যাল অত্যন্ত

অস্পষ্ট বাইরের জগত আর নিতান্ত নীরব মনের অতীত নিয়ে পড়ে আছেন। ভাবনাই তাঁর একমাত্র সম্বল। ভাবনা এবং দুর্ভাবনা। প্রতিদিন সকালের একা একা ভাবনাগুলো একাধিক 'তাহলে কি হত ?'-র ধাক্কা খেয়ে খেয়ে দ্বিপ্রহরের বিশ্রামকে উদ্বেল করে তোলে। দুপুরের অস্বস্তিগুলো আবার আরও 'তাহলের' জন্ম দিয়ে বিকেলকে বিভ্রান্ত করে তোলে। আভা সান্যাল তাই সকাল বিকেলের জের টেনে টেনে তাঁর রাতগুলোকে অসহায় খুঁজে পান। এই দিনলিপিতে আভা সান্যাল অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অভ্যস্ত হলেও তাঁর মন মানে না। এটা কি তাঁর পাওনা ছিল ? এমনটিই কি হবার কথা ছিল ? আভা সান্যাল উত্তর খুঁজে পান না। আর উত্তর পান না বলেই অতীত খুঁজে বেড়ান!

সেই অতীতটা খুঁজতেও আভা সান্যালকে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। একটা একটা করে পাতা ওল্টালেও সত্তরটা হয়। তার সবকটিই আর গ্রীষ্ম ছিল না, ছিল না শীত আর বর্ষা। যদিও তারাই ছিল দলে ভারি। ক্ষণজীবী হলেও বসন্ত এসেছিল। সেই স্বল্পস্থায়ী বসন্ত আভা সান্যালকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তানের ফসল দিয়েই চিরবিদায় নিয়েছিল। বাইরে শীতগ্রীষ্মের চোখ রাঙানি আর ভিতরে ঘোর বর্ষার ঝরঝরানি। আভা সান্যাল তাই দুটি সন্তানকে সম্বল করে জীবনের তরীখানি ভাসিয়েছিলেন ভবিষ্যতের খরস্রোতা নদীতে। সে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। মাঝে মাঝে মনে হয় 'এই তো সেদিন'! হেমন্তের সেই জীবনকাঠিই আভা সান্যালকে জীবনের বহু ঘনঘোর স্রোতাবর্ত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যৎকে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরার শক্তি যুগিয়েছে।

যখন পুতুলের সংসারে নাতিনাতনী নিয়ে ভরভরাট মশগুল থাকার কথা তখনই আভা সান্যালকে বাস্তব সংসারের ঘেরাটোপে আটকা পড়ে যেতে হয়। তখনকার দিনে আভাদের এটাই ছিল সমাজ-লিপি। মা-বাবার গৃহের অভ্যন্তরে আভাদের যে নিজ নিজ সংসার আনন্দে-অনুষ্ঠানে মনমাতানো প্রবাহ পেত তা হঠাৎ হঠাৎই অপর-অপরের সংসারের টানে খান খান হয়ে ভেঙে যেত। আর সেই বাস্তব সংসারের পুতুল-পুতুল জীবনেই আভারা পুতুলের মা হবার বদলে সন্তানের জননী হয়ে পড়ত। আভা সান্যাল অনেক সময়েই বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করেন। তুলনা করেন আর দীর্ঘশ্বাস

ফেলেন। জীবনকে কিছুমাত্র বোঝার আগেই আভারা কেমন জীবনের বোঝা বইতে শুরু করে দিত। তরুণী-হবার আগেই বালিকারা বুড়ি হয়ে যেত।

আভারাণী সান্যাল আমার, বলা যায়, পার্শ্বদ্বার প্রতিবেশী—নেকস্ট্ ডোর নেবার। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর যেমন ব্যবহার প্রথাসিদ্ধ আমাদের সম্পর্কটি তেমন হতে পারে নি। কাতরতা আমাদের পরস্পরের শ্রী বা বিশ্রীর কোনও অংশের দিকেই ধেয়ে আসতে বা যেতে পারে নি। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করেও আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারি, মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি। দেশ বিভাগের আর্থ-মানসিক যাবতীয় ক্ষত বহন করে আমরা, উদ্বাস্তুরা, যখন ঝরাপাতা জীবনকে এখানে-সেখানে একখন্ড জমিতে বাঁচার মত করে খুঁজে নিচ্ছি তখনই অন্যান্য শত সহস্রের মত, আমরা দুজনে পাশাপাশি এসে গেছি। সেই একদার ভাগ্যের তাড়নায় যে পাশাপাশি অবস্থান তাই মনের টানে কাছাকাছি এসে গেছিল স্বল্প সময়েই। সেই সময়টা আর আমাদের মধ্যে হারিয়ে যায় নি। আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকি, পাশাপাশি স্কুলে দীর্ঘদিন কাজ করেছি এবং প্রায় কাছাকাছি সময়েই অবসর নিয়েছি। এখন এই শেষ পর্বে এসে আমরা এক দিকে যেমন একই রকম একা একা জীবন যাপন করছি তেমনি অন্যদিকে ভিন্ন রকম বেদনাকে লালন করে চলেছি।

আভারাণী সান্যাল একই সঙ্গে দেশ ও স্বামী হারিয়েছেন। সন্তানদ্বয়ের দায়দায়িত্ব বহন করে খরস্রোতা জীবনের গতি পথে কোনও মতে একটা পাড় খুঁজে নিয়েছেন। আর আমি, প্রীতিকণা রায়, সারাজীবন ধরে একটা প্রেম-প্রীতি ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে না পেয়ে নিজের মধ্যেই ধীরগতি জীবনটাকে বেছে নিলাম। আমার একা জীবন আমার নিজের অর্জন। আভা সন্যালের একা জীবন তার পুত্র কন্যা এবং অবশ্যই তার স্বামীর দান।

প্রায় একই সঙ্গে জমি কিনে একই সঙ্গে দুজনের বাড়ি তৈরি হতে থেকেছে। আমরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আভা সান্যাল সহজেই আভাদি হয়ে গেছেন। আমি প্রীতিদি থেকে শুধুই প্রীতি। গাছতলায় মিস্ত্রীদের কাজ দেখতে দেখতে আভাদি বলেছেন, 'জান প্রীতি ছেলেমেয়েকে আমি যথাসম্ভব লেখাপড়া শেখাব, বড় করে তুলব, মানুষ করে গড়ে তুলব। আমার জীবনে দু'টি মাত্র কামনা এখনবেঁচে আছে। একটা বাড়ি, যা আমাদের

উদ্বাস্তু জীবনের অবসান ঘটাবে আর সন্তানের ভবিষ্যৎ যা আমাকে সার্থকতা দেবে।' আভাদি নিজের কথা বলতে গেলেই, বিশেষ করে ছেলেমেয়ের কথা বলতে গেলেই আমি অবাক হয়ে তাঁর চোখের গভীরে একটা দীপশিখার নিষ্কম্প্র দ্যুতি দেখতে পেতাম। একটা স্থির প্রত্যয় যেন সাধনার অনুধ্যান হয়ে প্রকাশ পেতে থাকত। স্বামীহারা আভাদির মধ্যে একটি চিরন্তন মাতৃভাবনা যেন অনুপস্থিত তাঁর সন্তানদের ঘিরে রাখত। স্নেহময়ী সন্তানসর্বস্ব সেই মাতৃরূপটি আমার অন্তরের গভীরে স্পর্শ করে যেত। বলেছি, 'আপনার কষ্ট আর সংগ্রাম ব্যর্থ হবে না, আভাদি। আপনার সাধনা চরিতার্থতার কূল অবশ্যই পাবে।' আভাদির চোখ ছলছল করে উঠত। বলত, 'তোমরা আশীর্বাদ কর যেন তাই হয়।'

আমার নিজের 'সংসারে' আমিই একা এবং অদ্বিতীয়। আশা করার মত যেমন কেউ নেই প্রত্যাশা পূরণেরও তেমন কোনও তাগিদ নেই। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে আমি নিরুদ্বিগ্নচিত্ত। যা হোক একটা হলেই আমার চলে যায়, যেমন তেমন করে সকালকে দুপুরে আর দুপুরকে রাতের অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে গেলে আমার জঠরের আর কিছু বলার থাকে না। কিন্তু তেমনি করে অন্য আর কিছুতেই আমার ছাড় নেই। বিশেষ করে আমার শাড়ি জামারা আমাকে ছাড়ে না, পরিচ্ছন্নতা আদায় করে নেয়, আমার ছোট্ট ঘরের দেয়াল মেঝে থেকে শুরু করে রান্নাঘর বসার এবং পড়ার ঘর আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেয়। আর আছে আমার গানশোনার বাতিক। ট্রানজিস্টারের সুইচটা বন্ধ হলেই যেন যন্ত্রটা গানের বদলে নৈঃশব্দ্যকেই সোচ্চারে ঘোষণা করতে থাকে। তাই আমি যেখানেই থাকি না কেন, যে কাজেই ব্যস্ত থাকি না কেন আমার ঐ যন্ত্রটি আমাকে সদাসর্বদাই সঙ্গ দেয়।

আভাদির জীবন একেবারেই অন্যসুরে বাঁধা। সাতসকালে ওঠেন। ছেলেমেয়েদের ওঠার আগেই এক হাতে প্রাত্যহিকের সকল দায় সম্পন্ন করে ফেলেন। ওদের ডেকে তুলে চা-বিস্কুটের প্রভাতী আসর বসিয়ে ফেলেন। নিজে এক কাপ চা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ সঙ্গ দেন। তার পরেই ওদের দুপুরের সব ব্যবস্থা সেরে রেখে কিছু একটু মুখে দিয়ে স্কুলের পথে পা বাড়ান। প্রায়ই আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দেন, কৈ প্রীতি তোমার হল? আমার খেয়াল-অঙ্গের জীবন যাপন আর আভাদির ঠুংরি ছন্দের।

আভাদি অনেক কাজ করেন বলে আরও কাজের সময় পান এবং সব কাজই সময় মত সমাধা করেন। আমি কোনও কাজই তেমন করে করিনা বলেই বোধহয় আমার সব কাজেই সময়ের অভাব দেখা দেয়। আভাদি বকেন, 'কি এমন কর যে রোজ রোজ তোমার দেরি হয় ?' আমি অপরাধীর মতো মুখ করে আভাদির চোখে তাকাই। তার পরে দুজনেই হন হন করে স্কুলমুখী হই। এটা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। তাই আভাদির স্কুল শুরু হয়ে যায় আমাদের গৃহাঙ্গন থেকেই, আমার শুরু হয় বিদ্যালয় গৃহে পৌঁছে। আভাদির এই 'ওপেন এয়ার' মাস্টারীটুকু আমার বেশ ভাললাগে। কে যেন বলেছিলেন আমরা সারাজীবনই ছাত্র। তিনি আভাদিকে দেখলে হয়ত বলতেন—আমরা সারাজীবনই ছাত্র থাকতে চাই। একটা স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহের প্রবাহ যেন আভাদির হৃদয়ের স্পর্শে আর অন্তরের ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে প্রকাশ পেত।

ছেলে অসীম স্কুল ছেড়ে কলেজে এবং কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। পিছন পিছন মেয়ে। আভাদির মনের মধ্যে আনন্দের ঊর্মিমালা যেন একে একে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কপালের পাশের কেশগুচ্ছকে বেছে নিল। আনন্দের রঙ কি শুভ্র ? পুত্রকন্যার প্রতিটি সাফল্য যেন আভাদিকে বেশি উজ্জ্বল করে তুলল। আমি যখন আভাদিকে বলেছি, 'তোমার ত্যাগে, তোমার সাধনায় তোমার ছেলেমেয়ে সফলতার গন্তব্যে পৌঁছোবে। তোমার দুঃখ ঘুচবে।' আভাদি বাধা দিয়ে বলেছেন, 'মায়ের আবার ত্যাগ কি, সাধনা কি ? ওদের যা পাওনা ছিল আমাদের কাছে তার কতটুকুই বা আমি একা ওদের দিতে পেরেছি ? দীনতার মধ্যেই তো ওরা মানুষ হয়ে উঠছে। এটা তাই ওদের অর্জন, আমার কিছুই নয়।'

একা ঘরে আপন মনে আভাদির কথা ভাবি। যে বয়সে আজকাল মেয়েরা সংসারের কথা ভাবে সেই বয়সে আভাদি সংসার শেষ করে বসে আছেন। সেই চুরি যাওয়া তরুণ বয়স, সেই কখনও-না-আসা যৌবন আভাদিকে কখনও বিমর্ষ করেছে কিনা, কখনও আনমনা করে তুলেছে কিনা তা আমি টের পাই নি। তবে ছেলেমেয়ের প্রতি আভাদির সতৃষ্ণ মনোযোগ আমি বার বার দেখেছি ওঁর চোখে, ওঁর কণ্ঠে। মেয়ে যদি স্কুলের বা কলেজের বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাইরে সময় কাটিয়ে এসেছে অথবা ঘরে এসে দু'ঘণ্টা আড্ডা দিয়েছে তো আভাদি বলেছেন, 'আহা, এই তো বয়স ! একটু আনন্দ করবে না ? একটু

স্বাধীনতা না দিলে মনের প্রসারটিই তো ঘটবে না। এই প্রাণের মুক্তির সময়ে যদি সংসারের দড়িদড়ায় ওদের বেঁধে ফেলি তাহলে ওদের জীবন তো আমাকে ক্ষমা করবে না।' আমি শুনে অভিভূত হয়েছি। বার বার মনে হয়েছে এসব আভাদির শোনা কথা নয়, বই থেকে পাওয়া বক্তৃতা নয়। এ-সবই আভাদির অন্তরের রান্নাঘরে হৃদয়ের অনুভবে পাওয়া।

অসীম বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কাজে যোগ দিল। দূরে। আভাদি প্রথমে রাজী হন নি। বলেছিলেন, 'ও কাজ নিতে হবে না। আমি একা থাকতে পারব না।' অসীম মায়ের পাশে বসে বলেছিল, 'কাজ কি অত সোজা মা? তাছাড়া এটা শিক্ষকতার কাজ না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়েরই তো কাজ। রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্ট। একদিন অধ্যাপনার কাজটাও জুটে যেতে পারে। একটু দূরে হলেই বা!' আভাদি ছেলের কোনও কথা শোনেন নি। তাঁর অভিমান তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। এই এতদিন পরে আভাদির অন্তরের বেদনা চোখকে ঝাপসা করে দিয়েছিল। বাষ্পাকুল আভাদি ছেলের পাশ থেকে উঠে চলে গেছিলেন। অসীম বলেছিল, 'মাঝে মাঝেই তো বাড়িতে আসব—ছুটি ছাটায়। তাছাড়া বোন তো রইল!' রান্না ঘরে সেই যে ঢুকেছিলেন আভাদি আর অনেকক্ষণই বের হন নি।

হাল্কা মনে বিকেলের টুকিটাকি কাজ সারছি। একটা গানের সুর ঘরের মধ্যে ঝির ঝিরে বয়ে চলেছে। ট্রান্‌জিস্টারটিই উৎস। আমি রিসিভারটি হয়ে লঘু পায়ে আপন মনেই গুনগুন করে চলেছি। অসীম ঘরে এসে বলেছিল, 'মাসি, তোমার সাহায্য চাই। মা একদম কথা শুনছে না।' আমি অবাক হয়ে হাঁ করে অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বলে কি! আভাদি অসীমের কথা শুনছেন না? অসীমের? পুত্র-অন্ত প্রাণ আভাদিকে তাহলে অসীম কি কথা বলেছে? সেই প্রশ্নই করলাম অসীমকে, 'কি কথা?' অসীম ঘরের কোণের একটা চেয়ারে বসল। ট্রানজিস্টারটা অফ্ করে দিয়ে আমিও একটা চেয়ার টেনে ওর কাছাকাছি বসলাম। বললাম 'বল কি সেই কথা যা তুমি আভাদিকে শোনাতে পার নি?' অসীম ধীরে ধীরে সব জানাল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্তির কথা। অধ্যাপনায় নয় অনুসন্ধানের কোনও এক প্রকল্পে সহকারীত্বের ডাক এসেছে।. দূর বলে তার মা মত দেন নি। অসীম বলেছিল, 'তুমিই বল মাসি দূর বলে কি আমি এমন একটা সুযোগ

হাতছাড়া করতে পারি ? মা বলছে সে একা থাকতে পারবে না ! একা হল কি করে ? সীমা থাকছে না ? তুমি আছ না ? আর তাছাড়া আমার একটা ভবিষ্যৎ বলেও তো বিষয় আছে ! তা ভাবতে হবে না ?'

এতদিন আমি অসীমকে দেখেছি প্রধানত আভাদির চোখে, আভাদির মনের অনুভবে তিল তিল করে গড়ে তোলা অসীমকে। পড়াশুনোয় দুর্দান্ত কিছু না হলেও বেশ ভাল। পাড়া প্রতিবেশীদেব সঙ্গে মেলামেশা বেশ কম। যা কিছু বন্ধুবান্ধব তা দু'চারজনের মধ্যেই সীমিত। তারাও কলকাতার। বোধহয় কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্রকৃতিতে গম্ভীর, কথায় স্বল্পবাক। ঘরের মধ্যের জগতটাই ওর বেশি বলে বাইরে থেকে ওকে বোঝা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। আর যতটুকুই জেনেছি তা আভাদির মনের প্রতিফলনেই জেনেছি। তাই এই প্রথম অসীমের সামনাসামনি বসে, ওর কথা শুনে আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা ঝিমঝিম ভাব অনুভব করলাম। ওকে শুধু বললাম, 'আভাদির সঙ্গে আমি কথা বলব।'

অসীম আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। হয়ত আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। আমি বিষয় পরিবর্তন করতেই বলেছিলাম, 'সীমা এম. এ. ক্লাসে ভরতি হয়েছে ?' অসীম হয়ত আমার মনের ভাবটা বুঝেছিল। তাই হয়ত অমন ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিল। অথবা এমনও হতে পারে যে ভাইবোনের মধ্যে কোথায়ও কোন ছন্দ-পতন ঘটে গেছে। অসীম বলেছিল, 'সীমার ব্যাপার সীমা জানে !' আমি দ্বিতীয়বার খাদের মুখে নিজেকে আবিষ্কার করেছিলাম। তাই থমকে থেমে থেকে বলেছিলাম, 'আভাদির সঙ্গে কথা বলি কেমন ? তার পরে তোমাকে জানাব !'

অসীম আমার ঘর থেকে চলে গেল। কিন্তু আমার মনের গভীরে তীক্ষ্ন কিছু আঁচড়ের দাগ রেখে গেল ! সে কি আমার বোঝার ভুল ? সে কি আমি আভাদিকে অত্যধিক ভালবাসি বলে ? সে কি আমার বয়সের ছানিপড়া মনের অনুভব-তলে 'রিফ্রাক্‌টেড' প্রত্যক্ষ ? মনটা আমার বিষণ্ণ হয়ে গেল। উঠে পড়ে যে ট্রান্‌জিস্টারটা চালাব সে ইচ্ছেটাও হল না। উঠি উঠি করেও কেমন যেন আভাদির চিন্তায় আর অসীমের ভাবনায় ডুবে রইলাম। ওঠাটাই হল না।

আভাদির অতীত যেন একের পর এক আমার চোখের সামনে সেই

প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যার অন্ধকারে একে একে এসে দাঁড়াতে লাগল আর সরে গেল। একেবারে একা আভাদিকে দেখলাম দুটি মাত্র দুধের শিশুর হাত ধরে যেন অসীম জীবন সমুদ্রের পাড়ে অসহায় একাকিত্বে দিশেহারা। তার পর বেঁচে থাকার সংগ্রাম। জীবন যুদ্ধ। সেই সংগ্রাম যতটা নিজের বাঁচার জন্যে তার চাইতে অনেক অনেক বেশি ছিল সন্তানদের বাঁচানোর জন্যে। যে জীবনের জন্যে আভাদি আজও পর্যন্ত যুঝে চলেছেন সে তো তার নিজের জীবন ছিল না কোনও দিনও। তার পর ? অসীম আর সীমাকে মানুষ করে তোলার সাধনা। কৃচ্ছ্রতার অনুসরণকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে সন্তানদের পুষ্টির যোগানটি অব্যাহত রাখতে আভাদি নিজেকে যতটা বঞ্চিত করেছেন তার চাইতে আত্মতৃপ্তির পূর্ণতাবোধে অধিক সমৃদ্ধ বোধ করেছেন। অভাবের যাবতীয় পীড়নকে তিনি নিজের কণ্ঠে ধারণ করে সন্তানদের স্ব-ভাবের অনুশীলন পথটি পীড়নহীন করে তুলতে সচেষ্ট থেকেছেন। আমার কাছে আভাদি এক সর্বংসহা জননীর রূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

আর আজ ? আজ যখন পড়ন্ত বেলার হেলে পড়া জীবনের মুখোমুখী, যখন দ্বিতীয়বারের মত একাকিত্বের বোঝা বইবার মত মনের জোর আর শরীরের শক্তি নেই তখন তাঁর ছেলে এসে জানাল 'এমন সুযোগ কি বার বার আসবে ?' বলল—'দূর ? এমন কি দূর আর ?' অনায়াসে ঘোষণা করতে পারল—'আমার ভবিষ্যৎ বলেও তো একটা কথা আছে ?' অসীম তার অতীত নিয়ে ভাবতে আর রাজী নয়, কারণ তার অতীত তো অতীতই। সে তার মায়ের বর্তমান নিয়ে চিন্তা করতে আগ্রহী নয় কারণ তার নিজের একটা বর্তমান আছে যেখানে ভবিষ্যতের ভিত তৈরি হবে। অসীম এখন একমাত্র তার নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত কারণ তার জীবনটি অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু তার মায়ের একাকিত্ব বোধ ? তাঁর ভবিষ্যৎ ? বিবেকের হাত থেকে মুক্তি পেতেই কি অসীম সীমার কথা বলেছে, সীমাকে দেখিয়ে দিয়ে নিজের দায় সেরে নিতে চাইছে ? কি জানি, কেন আমার মনে এমত সহস্র প্রশ্ন ফণা তুলে আমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়।

দিন দশেকের মত একটা ছোট্ট দেশভ্রমণ সেরে ঘরে ফিরেছি। আমার নিজের বলতে ঐ আভাদি আর তাঁর ছেলে মেয়ে। টুকিটাকি দু'চারটি

জিনিসপত্র ওদের জন্যেও এনেছি। আভাদির জন্যে, কেন জানিনা, একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা। সেই সব হাতে করে আভাদির ঘরে গেলাম। অবিন্যস্ত পর্যুদস্ত আভাদিকে দেখে আমার কষ্ট হল। ঘরে পা দিতেই সীমা আমাকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেল। বলল, 'দাদা চলে গেছে! মায়ের কথা শোনেনি। মা সেই যে মৌন হয়ে ঠাকুরের কাছে বসেছেন আর কোনও কথা বলছেন না। সংসারের সব যথারীতি যন্ত্রের মত করে চলেছেন। নিজের বলে যা কিছু সময় তা ঐ ঠাকুরের আসনে চোখ বন্ধ করে কাটিয়ে দিচ্ছেন।' মনে মনে শংকিত বোধ করলাম। এই শেষ বয়সেব দ্বারপ্রান্তে এসে নিজের উপর এমন কঠিন শাস্তির বিধান দেওয়াটা আভাদির পক্ষে কখনই ভাল হতে পারে না।

ঘরে ঢুকে আভাদির একেবারে পাশটিতে গিয়ে ডাক দিলাম, 'আভাদি!' আভাদি একটুখানি নড়ে উঠলেন। তার পরে ঠাকুরকে গড় করে প্রণাম করলেন। এবারে অত্যন্ত ধীর ভাবে উঠে এলেন। প্রশ্ন করলেন, 'কেমন বেড়ালে এবার? কোথায় কোথায় ঘুরতে পারলে?' এসব প্রশ্ন যে উত্তরের অপেক্ষায় করা নয় তা আমার জানা। তিনি আমাব হাত ধরে এ-ঘরে নিয়ে এলেন। পাশে বসলেন। তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই করেন।' ঈশ্বর আছেন কি নেই, থাকলেও তিনি আভাদির বিষয়টি নিয়ে কতখানি ভেবেছেন অথবা অসীমের এই দূরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে তাঁর হাত কতটা এসব নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই, কিন্তু সেই ঈশ্বর আভাদির মনে যে স্থৈর্যটুকু ফিরিয়ে দিয়েছেন তার জন্যে তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আভাদি বলেছিলেন, 'প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম যে এবারের এই আঘাতটা বোধহয় আমি আর সহ্য করতে পারব না। তুমি এখানে ছিলে না, প্রীতি। আমি মনে মনে এতবড় আঘাতের জন্যে তৈরি ছিলাম না। জীবনে যখন প্রথম আঘাতটা এসেছিল তখন আমি আমার সন্তানদের দিকে মুখ করে উত্তর খুঁজেছি। তিনি আমাকে বিমুখ করেন নি।' বলেই আভাদি তাঁর ভগবানের উদ্দেশেই যুক্ত কর কপালে ঠেকালেন। আমি মনে মনে অনেকটাই আস্বস্ত বোধ করলাম। তার পরেই আভাদি বললেন,—'আমার ঠাকুর আমাকে কি বললেন জান? বললেন—সারাজীবনই তো মায়েরা ছেলের জন্যেই বাঁচে, ছেলের জন্যেই সর্বস্ব ত্যাগ করে। তুইও তো তাই করেছিস এতদিন।

তাহলে এখন কেন পিছিয়ে যাবি ?—কাল ঠাকুর যখন আমার মধ্যে বসে এই কথাগুলো আমাকে শোনালেন তখন থেকেই আমি শান্ত বোধ করছি। আমার মনে আর কোনও কষ্ট নেই, নেই কোনও যন্ত্রণা।' আভাদির দিকে আমি এক দৃষ্টিতে কি দেখছিলাম তা আমি নিজেই জানি না। পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল সীমা। সীমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে কি আনন্দের ? সে কি বেদনার ? সে কি সমবেদনার ? আমি আর অপেক্ষা করিনি। প্যাকেটটা যেমন নিয়ে গেছিলাম তেমনই সীমার টেবিলে রেখে চলে এসেছিলাম।

নিজের একান্ত ভাবনায় আভাদিকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। আভাদির ঈশ্বরকে আমার একচোখো বলে মনে হয়েছে। এমনিতেই পুত্র-অন্তপ্রাণ আভাদি। মেয়েটিকে তিনি তাঁর নিজের ধন বলে মনে করেন না। অপরের ধন তাঁর কাছে গচ্ছিত আছে মাত্র। পুত্র-সন্তান আর কন্যা-সন্তানের মধ্যে এই যে সামাজিক-মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রভেদ সেই প্রভেদকে যদি ঈশ্বর নিজেই তাঁর ভক্তের মনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে তো বড়ই বিপন্নবোধ করতে হয়! মায়েরা সন্তানের জন্যে নয় পুত্রের জন্যেই প্রাণ ধারণ করেন ? এই যে সমাজপতি সুলভ বিচার এই বিচার যদি ঈশ্বর সুলভ সমর্থন পায় তাহলে আমরা যাই কোথায় ? তা, এসব তাবড় তাবড় প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা একএকজন আদার ব্যাপারী ছাড়া আর তো কিছুই নই! কিন্তু সীমার প্রশ্নটা কিছু দিনের মধ্যে আমাদের মনে বিভেদ সৃষ্টি করে দিল!

ইতিহাসের সাম্মানিক স্নাতক সীমা চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। চারদিক অন্ধকার। দেখতে শুনতে সাধারণ বাঙালী মেয়ে। সর্বার্থেই। তাই চাকরি জুটছে না। জুটছে না কারণ বাঙালী হয়েও সে রাজনীতি থেকে আশৈশব দূরে থেকেছে। বাঙালীত্বের এই কলঙ্কটুকুই শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়ে দেখা দিল। একমাত্র সম্ভাবনা ছিল মায়ের স্কুলে শিক্ষিকা হয়ে প্রবেশের সুযোগ। কিন্তু 'রত্ন' না হয়ে মেয়ে হয়ে জন্মানোর দ্বিতীয় কলঙ্কটি সেই পথটুকুও রুদ্ধ করে দিল। সকলেই আভাদিকে বলেছিল, 'আপনার তো আর বছর দু'এক মত পড়ে আছে। আপনি যদি সীমার স্বপক্ষে অবসর নিয়ে নেন তা হলে মেয়েটার একটা হিল্লে হয়ে যায়।' আমিও বলেছিলাম, 'সারাজীবন এতোই তো করলেন, এবারে এই শেষ জীবনে এইটুকু

নিজের সন্তানের জন্যে করবেন এ আর এমন কি ?' তা, আভাদি সে কথায় কান দিলেন না। 'কেন ছাড়ব ? মেয়েতো পরের ঘরে চলে যাবে।'

সময় আভাদির মুখ চেয়ে বসে রইল না। আভাদির ঈশ্বরও আভাদিকে ঠাকুরের আসনে না দেখতে পেয়েই হয়ত কন্যা বিষয়ে কোনও উপদেশ নির্দেশ দেবার অবকাশ পেলেন না। আভাদি অবসর নিলেন। কন্যা বেকারিত্বের জ্বালা সর্বদেহেমনে বহন করে আভাদির কণ্ঠকে যথেষ্ট ঝাঁঝাল করে তুলল। স্কন্ধের পীড়ামুক্তির জন্যে কোথায় কোন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এক ইন্দ্রলুপ্ত বয়সের ভারে ন্যুব্জ সুপাত্রের সন্ধান পেলেন। পুরুষ শাসিত সমাজের বরপুত্র, মা-বাবার বড় ছেলে এবং মাতৃতান্ত্রিক প্রশাসনের বিধি-ব্যবস্থায় সীমা এক ঝরো ঝরো বর্ষার লগ্নে রাজেন্দ্রের হাত ধরে শ্বশুরের বাড়ি চলে গেল শাশুড়ীর সংসারে। বলা চলে, আভাদিকে মুক্তি দিয়ে গেল। সীমার জীবনে এই মুক্তি দান কতটা সার্থক হয়েছিল আর ওদিকের প্রাপ্তির পরিমাণ কতটা স্তূপাকৃতি জমে উঠেছিল সে এক অষ্টাদশপর্ব মহাভারত। মেয়ের সুখে এবং দুঃখে সমান নিরুদ্বিগ্নমনা হতে পেরেছিলেন কিনা আভাদি তা আমার জানা হয়নি। তবে এটুকু পরে জেনেছিলাম যে সীমার জীবনের খাতায় সুখের 'ক্রেডিট' পৃষ্ঠাটি দীর্ঘদিনই 'কুমারী' ছিল !

আর আভাদিব শেষ জীবনে ? দীর্ঘজীবন একাকী যোদ্ধা আভাদি এখন সর্বৈব একা। দুবেলা দু'মুঠো ফুটিয়ে নিজের জঠরের জ্বালা শান্ত করা আর আহ্নিক গতির অনিবার্য টানে গড়িয়ে চলা সকাল দুপুর রাত্রির সকল জ্বালা যন্ত্রণাকে নিঃশেষে পান করা—এই এখন আভাদির দিনলিপি। যে ভবিষ্যতের তাড়নায় অসীম গৃহের নৈকট্য আর মায়ের স্নেহাঞ্চল ছেড়ে উত্তর বঙ্গে জীবনের ভিত গড়তে চলে গেছিল সেই ভবিষ্যৎই একে একে তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে টেনে নিয়ে যায়, স্ত্রীর হাত ধরে গৃহ থেকে গৃহান্তরে ছুটিয়ে বেড়ায় এবং অবশেষে দক্ষিণ বঙ্গে, কলকাতার উপকণ্ঠে, স্ত্রীর পরামর্শে এবং শ্বশুর বাড়ির দাক্ষিণ্যে স্বগৃহের ঘট-স্থাপনটি সেরে ফেলে ! সে এক দীর্ঘ ইতিহাস, সুদীর্ঘ টানাপোড়েনের নাটকীয় উত্থান পতনের অঙ্কবিন্যস্ত ঘটনা পরম্পরা। সেখানে আভাদি দর্শকমাত্র। কখনও শুধুই শ্রোতা। একেবারেই মহিলা ধৃতরাষ্ট্র ! সেই মহাভারতের সবটা আমার জানা নেই, সবটা জানার আমার আগ্রহও ছিল না। যে বেদনা সুন্দরের সূতিকাগার তা

আমাদের সকলের মনেই সুরের মূর্ছনা জাগায়। কিন্তু যে বেদনা শুধুই রক্ত ঝরায়, সুরের বদলে অসুরের সূতিকাগার হয়ে প্রতিভাত হয়, সে বেদনা ট্রাজেডীর জন্ম দেয় না, ভ্রাজারি সূচিত করে মাত্র।

এখন আভাদি তাই সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কখনও ঘরের কোণে তাঁর ঠাকুরের সামনে বসে থাকেন, কখনও বারান্দায় দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দৃষ্টিহীন আকাশকে খোঁজেন। আবার সামনের রাস্তায় চলমান জীবনের গতিকে অনুভবে কাছে পেতে আসন পেতে অপেক্ষা করেন। এসবই তাঁর রবিবারের প্রতীক্ষা। রবিবার অসীম আসবে। তাঁর অসীম নিজের সংসার থেকে তার মায়ের জন্যে টেনেহিঁচড়ে এই রবিবারের দেহ থেকে একটা টুকরো অংশ ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। সকাল থেকে আভাদি শবরী হয়ে অপেক্ষা করেন। প্রথম প্রথম যা ঘটত সকাল সকাল আর যে প্রত্যাবর্তন সন্ধ্যার অন্ধকারে লগ্ন খুঁজে পেত তা এখন ক্রমশই যেন মধ্যাহ্নের এপাশে ওপাশে এসে ঠেকতে চলেছে। আমি সময় পেলেই আভাদির সঙ্গে সময় কাটাই। আভাদি বলেন, 'ছেলেটা সময় পায় না একেবারেই। কত কাজ, কত ঝামেলা। সবই তো এক হাতে করতে হয়!' আমি আভাদিকে তাঁর ছেলে মেয়ে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করি না। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই করি না। আভাদি নিজে থেকেই বলেন। ছেলের কথাই বলেন। মেয়ের উল্লেখমাত্র কখনও করেন না। আমার ভাল লাগে না। কিন্তু বাধা দেই না। নির্বাক শ্রোতা হয়ে আভাদির মনের ভার হালকা করার সুযোগ দেই। তাঁকে এটুকু মনের আকাশ দেবার জন্যে আমার দায় আছে বলে আমি মনে করি। আভাদি আমার দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী যে!

আভাদি দীর্ঘজীবনই একাকী কাটালেন। তাঁর পুতুলের খেলাঘর. বাস্তবের সংসার, তাঁর পুত্রকন্যা নিয়ে সংগ্রামের জীবন আর এই শেষকালে একেবারে একা একা জীবন। পুতুলের সংসার তাঁর নিজের ছিল না। সেখানে তিনি উৎপাটিত। স্বামীর সংসার নিজের হল না। সেখানে তিনি বিতাড়িত উদ্বাস্তু। ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর যে দীর্ঘ-সাধনার জীবন সেখানেও তিনি মেয়েকে ভাবলেন অপরের গচ্ছিত ধন বলে আর ছেলেকে ভাবলেন আপন সম্পদ বলে। তাঁর ঈশ্বর তাঁকে দিলেন ত্যাগের মন্ত্র আর তার পুত্র দিল তাঁকে ছিন্নডোর রবিবাসরীয় ক্ষীণ বন্ধন। তাই এখন এই শেষ জীবনে

এসে আভাদি বোধহয় নিজের মনের সঙ্গে সোম-শনি সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। পুত্রের সংসার তিনি নিজহাতে গড়ে দিতে পারলেন না, শুধুমাত্র পুত্রকেই গড়ে দিলেন অপরের 'গচ্ছিত ধন' হিসেবে।

আমার নিজের অনেক দুঃখ কষ্ট অনেক হতাশা আর আশা-ভঙ্গ আছে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই তা আছে। সে সবই তো জীবনের নিজস্ব দান। কিন্তু ঐ আভাদি ? বেদনার বোধ আছে যন্ত্রণার অনুভব আছে কিন্তু প্রকাশ করার মনটা নেই। নেই কারণ প্রকাশ করতে গেলে নিজের আজীবনের সাধনার দেহে ব্যর্থতার চিহ্ন এঁকে দিতে হয়। ছেলে অন্তপ্রাণ এই তিনকাল-গিয়ে এক-কালে এসে ঠেকা প্রায় দৃষ্টিহীন বৃদ্ধার কাছে একটিই মাত্র বেঁচে থাকার তাৎপর্য অবশিষ্ট। একটা বিশ্বাস। ঈশ্বর তাঁর সেই বিশ্বাসকে সেচন করতে পারে না, উৎস হয়েও স্থায়ী হতে পারে না। পারে তাঁর পুত্র। পুত্র, পুত্রবধূ এবং দু'টি নাতিনাতনী। তাঁর "নিজের" সংসার। আভাদি সেই নিজের একটা সম্পূর্ণ সংসারের কাল্পনিক হৃদয়ের কেন্দ্রে নিজেকে দেখতে চান, ফুসফুসের ওঠাপড়ায় উষ্ণতার ছোঁয়া পেতে চান। তাই তিনি নিজের দৃষ্টিক্ষীণতাকে আশীর্বাদ বলেই বোধহয় মনে করেন। বাস্তব বড় কঠিন, জীবন বড়ই নিষ্ঠুর। স্নেহ বড় বালাই। আর বিশ্বাস ? যুগ-যুগ সঞ্চিত বিশ্বাস ? বিশ্বাস বোধহয় নিঃস্বতার মধ্যেও পূর্ণতার প্রত্যয় ফুটিয়ে তুলতে পারে ; অথবা, সেই পূর্ণতা-বোধ কি অধিকতর শূন্যতার হাহাকারটুকু ঢেকে দেবার জন্যেই প্রয়োজন ?

রবিবার আমি আভাদির কাছে যাই না। রবিবারগুলো যে তাঁর পূর্ণতার দিন। আজ সোমবার। আভাদি সকাল থেকে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসেছেন। আভাদিকে দেখে মনে হল অত্যন্ত ক্লান্ত, অবসন্ন, নিস্তেজ। বললাম, 'কি হয়েছে আপনার আভাদি ? শরীর খারাপ নয় তো ?' আভাদি বাঁহাতে আঁচলের খুটটা টেনে নিয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জল মুছলেন। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে, যেন এক ঝলক রক্ত উদ্গারের মতো করে বললেন, 'জান প্রীতি, কাল অসীম আসেনি।' বলেই আভাদি যেন নিজের আবছা-দৃষ্টি চোখ দুটোকে আমার দৃষ্টিথেকে বাঁচাতেই ডানদিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

আমি আভাদির একেবারে পাশটিতে বসে তাঁর একটা হাত আমার দুটো হাতের মধ্যে অঞ্জলিবদ্ধ করে ধরে রাখলাম। আভাদির হাতের আঙুলগুলো

আমার হাতের মধ্যে থরথর করে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ওঁর ঠোঁট দুটোও যেন বিড়বিড় করে কিছু ভাবছিল। আমার মনে হল আভাদি যেন সোম থেকে শনি পর্যন্ত বারগুলোকে টপকাতে চাইছিলেন মনে মনে। অনেকক্ষণই আমি সেইদিন আভাদির পাশটিতে মৌন বসেছিলাম। বার বার একটা ভাবনাই চাইছিলেন আমাকে কুরে কুরে যাচ্ছিল ঃ একটা একটা করে এই যে দিন যাপন, সপ্তাহান্ত এই যে প্রতীক্ষা এটা কি আভাদির প্রাপ্য ছিল? জীবন নিষ্ঠুর অবশ্যই। কিন্তু সেই নিষ্ঠুরতা কি ছেলের রূপ ধরে না আসলেই চলছিল না?

———

।। ভাস্করের স্ত্রীভাগ্য ।।

এখন মাঝে মাঝেই মনটা উড়ু উড়ু করে। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে কারো কাছে গিয়ে কিছুটা সময় কাটাই। এমনি এমনিই। কাজের কথা নয়, সে তো সেই কবেই ফুরিয়ে গেছে। অকাজের কথাও নয়, সেও এখন আর তেমন মন টানে না। শুধুই সময় কাটানো। একা একা সময় বলে আমার কোনও সময় নেই। আমার তবুও মাঝে মাঝে মনে হয় পুরোনো বান্ধবীদের কাছে গেলে, একটু পাশে বসলে যেন আকাশটা হাতের কাছেই খুঁজে পাওয়া যায়। আর সেই আকাশের সবটাই তো অতীতের। অতীতের ছোটবড় তুলিতে আঁকা দেয়ালে টাঙান ছবি। জীবনের চারদেয়ালে টাঙান। সেই ছবিগুলো একা একা দেখার চাইতে দুজনে মিলে দেখলে দেখাটাই যেন কেমন অন্যরকম হয়ে যায়, যেন ছবিগুলোতে প্রাণের স্পর্শ লেগে যায়। তারা ছবি থেকে, নীরব নিশ্চুপ ছবি থেকে, হঠাৎ হঠাৎই বাইরে বেরিয়ে আসে। ভাল লাগে সেই সচল জীবনকে সে সব দিনের চলন-বলন সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না উচ্ছলতা-বিহ্বলতা—সব যেন কেমন মনের প্রবাহে হৃদয়ের তাপ পেয়ে যায়, উষ্ণ হয়ে কাছে আসে, সরে সরে যায়। আবার পাশাপাশি বসে বসে মনের আকাশে কল্পনার পাখায় যে যার মত উড়ে বেড়াতেও ভাল লাগে। তখন সেই একান্ত নীরবতাও যেন বুকে চেপে বসার বদলে পাখনার স্বাধীনতা পেয়ে যায়। দুটো পুরোনো শরীরকে কাছাকাছি বসিয়ে রেখে দুটো পুরোনো মনের সেই যথেচ্ছ পাশাপাশি ভেসে বেড়ানোটাও যেন কতই মধুর কতই হালকা কতই প্রাণবন্ত মনে হয়।

মহামায়াদি আমার ছমাস মত আগে অবসর নিয়েছেন। আমি তখন বলেছিলাম, 'তুমি আগে গিয়ে আমার জন্যে একটু স্থানের ব্যবস্থা করে রেখ মহামায়াদি। তোমার তো সব আছে। আছে ঘর আছে সংসার আছে নাতিনাতনী। আর আমার ভুবন তো একার। আপন বলতে কেউ কোথায়ও টিকল না। আপন বলে কাউকে সারাজীবন খুঁজেও পেলাম না।' মহামায়াদি বলেছিলেন, 'ওরে প্রীতি, সবাই আমরা একা। আমরা আপনদের ভিড়ে একা আর তুই সকলের মধ্যে একা। এই যা তফাৎ। তাছাড়া…' মহামায়াদি কি যেন বলতে

গিয়েও থেমে গেলেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'তাছাড়া?' মহামায়াদি ফাইল থেকে চোখ তুলে জানালা পথে যথাসম্ভব দূরে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিয়ে বলেছিলেন, 'তাছাড়া, তোর একাকিত্বের মধ্যে একটা মুক্তি আছে রে প্রীতি! আমাদের একাকিত্বের মধ্যে আছে বাঁধন, সহস্র বন্ধন! সেখানেই তুই বেঁচে গেলি। তোর সেই একাকিত্বের আকাশে তোর আছে ওড়ার স্বাধীনতা। আমাদের একাকিত্বের সর্বদেহে, কাপড় শুকানোর ক্লিপের মতো, সংসারের শতসহস্র চাই চাই আর নাই নাই গুলো চিমটি কেটে বসে থাকে যে! তোর আছে আকাশ আমাদের আছে সংসার।' সেদিন আর কোনও কথা বলি নি। মহামায়াদির দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও দিগন্ত দেখার চেষ্টা করেছি।

এই আমার মহামায়াদি। নৈকট্যের লোভ মনের মধ্যে জিভ লকলক করলেই মহামায়াদিব কথা মনে হয়। সোজাসাপ্টা হাজির হয়ে যাই। সময়ের বাছবিচার করার দরকার হয় না। একদিন মহামায়াদি নিজেই বলেছিলেন, 'দেখ প্রীতি, জীবন আমাকে কি দিয়েছে আর কি দেয় নি তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি নিজের জন্যে একটা ছোট্ট আস্তানা করেছি। বলতে পারিস নিজেকে দেওয়া সে আমার প্রধানতম উপহার। একান্ত, নির্জন একটি বাসস্থান। একপ্রান্তে আছে আমার সর্বআপনযুক্ত সংসার। অন্য প্রান্তে আমার একাকিত্বের নিজস্ব নীড়। তাই তুই সময় অসময়ের বিচার করে সময় নষ্ট না করলেও পারিস।'

তা, কাল বিকেলে হঠাৎই মহামায়াদি আমাকে ঘিরে ধরল। আমিও চটজলদি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওখানে যেতে আমার ভাল লাগে। যাই সময় কাটাতে নয়, সময় সংগ্রহ করতে। সে সংগ্রহ কখনও মৌন কখনও বা মুখর। মহামায়াদির মনে বোধহয় কোনও জাদুমন্ত্র আছে। কাছে গেলে মনটি পালকের মত হালকা মনে হয়। কথা শুনলে ভারি মনের যাবতীয় জট-জটিলতা যেন আপনা আপনি খুলে খুলে যায়। দুঃখ যন্ত্রণা সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ অনেকেই করতে পারে, সমাধান বাতলাতেও হয়ত পারে। কিন্তু মহামায়াদির অন্তরের স্পর্শটি যেন সবই সহজ করে দেয় সহনীয় করে তোলে। মনের তাপে মহামায়াদি একটি যেন শীতল ছোঁয়ার মত মনে হয়।

মহামায়াদির ঘরে ঢুকতেই বলে উঠল, 'কাল থেকে তোর কথা বার বার মনে পড়ছেরে প্রীতি। তুই এসে গেছিস, খুব ভাল হয়েছে। জানিস, কাল

ভাস্কর এসেছিল।' আমার কথা কেন বার বার মনে পড়ছিল, কিসে আমার আসাটা ভাল হয়ে উঠল—এই সব কথা আমার একমুহূর্তে হারিয়ে গেল। বললাম, 'কোন ভাস্কর? ভাস্কর রায়?' মহামায়াদি যেন ভেংচিয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ গো মহারাণী! ক'টি ভাস্করকে আমরা দু'জনেই চিনি?' আমি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছি, 'তা, সেই ভাস্কর এই এতদিন পরে তোমার কাছে কেন এসেছিল? আর এলোই বা কেমন করে? তার তো শুনেছি পক্ষাঘাতে অচল অবস্থা। কারো সাহায্য ছাড়া নাকি উঠতে বসতেই পারে না?' মহামায়াদি অনেকখানি সহানুভূতি কণ্ঠে মিশিয়ে বলেছিলেন, 'না রে প্রীতি, ভাস্করের ব্যাপারটা বেশ ভাবনায় ফেলেছে আমাকে। শরীরের শক্তিই যে আমাদের চালায় সে কথাটা সত্যি হলেও তা সত্যের সবটুকু নয়। মনের আনন্দ-বেদনা যন্ত্রণা-পীড়নও আমাদের চালনা করার শক্তি যোগায়। আশা-আকাঙ্ক্ষাও তো কুহকিনী।' আমি একটু মজা করার জন্যই বলেছিলাম, 'সে তো ঠিকই। পঙ্গুও যদি গিরি লঙ্ঘন করতে পারে তাহলে ভাস্কর আর টালিগঞ্জ থেকে এই বৌবাজারে আসতে পারবে না? তার উপর তার তো পেট্রল শকট আছে, আছে নিজস্ব চালক। কিন্তু আসাটার মূলে হেতুটি কি ছিল?'

আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে মহামায়াদি বলেছিলেন, 'তুই এক মিনিট বোস, আমি চট করে এক পট কফি করে আনি। তার পর কথা হবে। মহামায়াদির ঘরের সোফায় ঠেস দিয়ে বসে আমার মনটা যেন ভাস্করকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। বহুদিন ওকে আমি দেখি নি। ওর আংশিক 'প্যারালিসিসের খবরও আমি মহামায়াদির মুখেই শুনেছি। সেও প্রায় বছর দু'এক আগের কথা। ওর কোনও সদ্য ছবি আমার মনের পর্দায় ধরা পড়ল না। যে ছবিটা হঠাৎই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেটি অনেক পুরোনো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিন্দে, গ্রন্থাগার গৃহে, ক্যানটিনে। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর চেহারা। ভারি চশমার কাঁচের আড়ালে ওর স্কুলকলেজের উজ্জ্বল অর্জনগুলো যেন চোখের জ্যোতি হয়ে ঠিকরে পড়ত। চশমার কাঁচের চাইতেও যেন ভারি ছিল ভাস্করের কণ্ঠস্বর। মেয়েদের নজর কাড়তে পারত কিন্তু কারো মনে যে ভাস্কর আগ্রহ জন্মাতে পারবে তা আমরা বিশ্বাসই করতাম না। ও থাকত নিজেকে নিয়ে আর নিজের বইপত্র নিয়ে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ভাস্কর একটা মাত্র নাম হয়ে গেল, একটা ঘোষণা; ব্যক্তি হয়ে

কোনও বৃত্ত রচনা করতে পারল না। পরীক্ষার ফলের দিকে ঊর্ধ্বমুখ ভাস্করের দৃষ্টিতে আমাদের কারো চোখের কাজলই ছায়া ফেলতে পারল না।

মহামায়াদি ছিলেন ভাস্করের কেমন যেন আত্মীয়। পারিবারিক। আমাদের এক বছরের 'সিনিয়র'। তাই আমরা দিদি বলতাম। ভাস্করেরও তাই তিনি ছিলেন পারিবারিক এবং সিনিয়রিটির দিদি। ভিড়ের মধ্যেও ভাস্করকে স্বতন্ত্র করে চিনে নেওয়া যেত। সে ছিল তার চেহারার দান আর স্বভাবের প্রভাব। বেশ ফর্সা চেহারায় এক গাল দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ভাস্করের দীর্ঘ দেহের ধীর গতি চলন বলনটি তাকে সকলের থেকে আলাদা করে দিত। আর এই জন্যেই ভিড়ের বাইরে কেউই বোধহয় ওকে একা একা চিনে নিতে চেষ্টা করে নি। ক্লাসের মধ্যে ভাস্কর অধ্যাপকদের প্রশ্ন করত, আলোচনাকে গুরুগম্ভীর পর্যায়ে অনায়াসে নিয়ে যেত। কিন্তু ক্লাসের বাইরে ভাস্করকে নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও প্রশ্ন উঠত না। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে ভাস্কর শুধু জ্ঞানের চর্চার মধ্যে বুদ্ধির ধার আর পাণ্ডিত্যের ভার বাড়াতেই জন্মেছে; ওর জীবনে সরস প্রাণের শ্যামল কোনদিনই পাতা ছাড়ার সুযোগ পাবে না। জ্ঞানস্পৃহার মরুতাপে ওর হৃদয়বৃত্তির সব কুঁড়িগুলোই শুকিয়ে গেছে। একটা বেখাপ্পা প্রাণীবিশেষ যেমন কাঁটা চিবিয়ে চিবিয়েই মনে করে জীবনের সব রসের উৎসই আছে কাঁটাঝোপের মধ্যে, ভাস্করও বোধহয় তেমনি প্রাণের সকল রসদের জন্যে বইপত্রের নীরস পাতাগুলোকেই বেছে নিয়েছিল।

তাই যেদিন শুনলাম যে ভাস্কর বিয়ে করেছে এবং সে বিবাহের গভীরে একটা প্রেমের কাহিনীও আছে তখন আকাশ থেকে পড়েছিলাম না আকাশ আমার মাথায় ভেঙে পড়েছিল তা বুঝতে পারিনি। হন্তদন্ত হয়ে অফিসের হাজিরা খাতার রক্তচক্ষুকে কলমের কাজল টেনে সজীব রাখার জন্যে দুটো করে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠেছি। খাতা খানার টেবিলজোড়া বক্ষে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবে জীবন্ত চিহ্ন এঁকে দিয়েছি, তখনও কলমের খোলামুখ বন্ধ করা হয় নি, এমন সময়ে মহামায়াদি প্রায় পাঁজাকোলা করে আমাকে হাইজ্যাক করে বারান্দায় টেনে নিয়ে গেলেন। 'জানিস, ভাস্কর প্রেম করে বিয়ে করেছে।' শুনেই কেমন যেন আমার দেহেমনে একটা অবশ সিরসির টের পেলাম। যন্ত্রের মত কলমের খোলা মুখটি বন্ধ করলাম। নিজের বন্ধ মুখটি যে কখন খুলে হাঁ হয়ে গেছে তা টের পাই নি। টের পেলাম মহামায়াদির

কথায়, 'শুনে যে একেবারে হাঁ হয়ে গেলি ? ছিল নাকি কিছু ? মনের কোন কোণে ?'

সেদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারেই ভাস্কর ঢুকে পড়ছিল। টিফিনের সময় সে উপস্থিত থেকে গেল প্রায় সবটা সময় মহামায়াদির মুখে। আগের বাড়ি ছিল খুলনায়। যৌথ পরিবারের পটভূমি ছেড়ে কলকাতা। একটু সকাল সকালই মা বাবাকে হারিয়েছে ভাস্কর। জ্যেঠা কাকাদের সংসারে নিজেকে কেমন বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়েছে ভাস্করের। বরাবরই ভাল ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েই একটা বেসরকারী সংস্থায় বেশ ভাল মাইনেতেই লেগে গেল। রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে সংস্থার উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে দিল। সংস্থা ওকে বঞ্চিত করল না। নিজের চেষ্টায় এবং স্বোপার্জিত অর্থে টালিগঞ্জে নিজের বাড়ি তুলে নিল একটু স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য।

বেকবাগানে ওদের পৈত্রিক যৌথগৃহে থাকার সময় থেকেই একটি বাচ্চা মেয়ে ওর কাছে এটা ওটা দেখিয়ে নিয়ে যেত। সেভেন কি এইটে যখন পড়ত। ভাস্কর তখন এম. এস. সি শেষ করে চাকরিতে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে, টালিগঞ্জে বাড়ি তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি পড়াশুনোয় বেশ ভাল অত্যন্ত সপ্রতিভ এবং স্বভাবতই মিশুকে। বাচ্চা বয়সের জন্যেই বোধহয় ভাস্করের পাথুরে কঠিন জীবনের কেন্দ্রে, স্বভাবের 'সেন্সর' বা স্যুপার ঈগোকে এড়িয়ে, ঐ মেয়েটি যাতায়াতের ছাড়পত্র পেয়ে গেছিল। দু'জনের দৃশ্যত 'আনব্রিজেবল' দূরত্বের জন্যেই বোধহয় কোনও 'কিন্তু' পাহারায় মোতায়েন ছিল না। এবং সেই কিন্তুর ছিদ্রপথেই প্রেম ঢুকে পড়েছিল যখন প্রকৃতি জাগ্রত বোধে কাছে এসে গেছিল। অবাঙালী এই মেয়েটির জাতি-ধর্ম-সংস্কার-বিশ্বাস ভরা বর্ষার কোটালের টানে ভেসে চলে গেল। আত্মীয় স্বজনবা গেল গেল করে উঠলেন, বন্ধুবান্ধব বয়সের বিরাট প্রভেদটিকে উল্লেখ করলেন। ভাস্কর সব বাধা বিপত্তি উড়িয়ে দিয়ে বীণাকে টালিগঞ্জের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করল। নিজের প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে অর্ধবয়সী অর্ধ-অঙ্গিনী সংগ্রহে ভাস্কর একাকিত্বের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যৌথ-জীবনের নিটোল সায়রে অবগাহন করতে মন দিল।

সব কথা শুনে আমি বলেছিলাম, 'যাক ভাস্করের একটা হিল্লে হয়ে গেল।' ও [illegible] কোনদিন কেনও মেয়ের কাছে যেতে পারবে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঝংকার

তুলতে পারবে এ-কথা আমরা কেউ কোনও দিনই ভাবিনি, বিশ্বাস করাতো দূরের কথা। তা, মহামায়াদি বলেছিলেন, 'হিল্লে হল কি না জানি না তবে ভাস্করের দৃশ্য খোলসটার মধ্যে যে অন্য একটা অদৃশ্য আসল আছে তা বাইরে বেরিয়ে এলো।'

তার পর যথারীতি ভাস্কর আমাদের কাছে আবার হারিয়ে গেল। প্রত্যেকেই আমরা নিজ নিজ জীবন বৃত্তে এত বেশি ঘুর পাক খাচ্ছি তখন যে অন্যকে নিয়ে ভাবার মত অবকাশ বড় একটা জোটে না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে এখন অতীতটা কপালের উপর দু'চারগাছা শুভ্রদৃষ্টি ফেলছে দেখতে পাই। কেশগুচ্ছে কাশগুচ্ছের আশ্বিনে আন্দোলন। একদিন টিফিনের প্রায় মৌন পুষ্টি সংগ্রহে ছেদ ঘটিয়ে মহামায়াদি বললেন, 'সামনের রবিবার আমার ওখানে চলে এসো প্রীতি। সংসারের মধ্যে থেকেও আমি নিজের বলে একটা আড়াল তৈরি করেছি। তুমি এলে আমার ভাল লাগবে।' আমি যাব বলে আগ্রহ দেখিয়েছিলাম। আগ্রহ দেখিয়েছিলাম কারণ মহামায়াদির ব্যাখ্যাটা আমার মনে ধরেছিল। বলেছিলেন, 'সকলের মধ্যে একা একা হয়ে থাকার চাইতে সকলের বাইরে নিজের একাকিত্বের মধ্যে একা থাকাটায় বেদনাবোধ অনেক কমে যায়।' সেই থাকাটা দেখতেই আমার আগ্রহ।

রবিবারের বিকেল। মহামায়াদির ঘরে বসে বেশ একটা তৃপ্তি বোধ করছিলাম। টেবিলে টি-পটে চা আমাদের মনোযোগের অপেক্ষায় উষ্ণ। নির্বাক চেতনায় আমরা মুখোমুখী বসে নিজ নিজ ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কেমন যেন আনমনা। হঠাৎই দরজার বাইরে কারো আগমন ঘোষণায় সুরেলা কলিং বেলটি বেজে উঠেছিল। আমি বাঙ্ময় চোখে মহামায়াদির দিকে তাকালাম, মহামায়াদি একবার আমার দিকে তাকিয়েই উঠে গেলেন দরজার দিকে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভাস্কর। হাতজোড় করে একটি নমস্কার করল। আমাকে। মহামায়াদিকে বলল, 'সামনের সপ্তাহে আমেরিকা চলে যাচ্ছি। মনে হল তোমাকে বলা দরকার, বলা উচিত। তাই চলে এলাম।' মহামায়াদি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হঠাৎ? টালিগঞ্জের বাড়ি? বীণা? বীণাও যাচ্ছে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই?' সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর দিলনা ভাস্কর। ধীরেসুস্থে সোফায় বসল। একবার মহামায়াদির

দিকে একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর টি-টেবিলে চা-এর সরঞ্জাম দেখে বলল, 'মনে হচ্ছে এখনও শুরু হয়নি?' মহামায়াদি আর একটা কাপ-সসার নামিয়ে আনলেন। খুব মন দিয়ে তিনকাপ চা বানালেন। একটা ভাস্করের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু বললে না?' ধীরে ধীরে ভাস্কর বলেছিল, 'হঠাৎ নয় মহামায়াদি। বীণার প্রতি আমার স্নেহ বড্ড বেশি মোহ সৃষ্টি করেছিল। সে বোধ হয় তার উদ্ভিন্ন তারুণ্য। আমি তাকে তৈরি করে নিতে চেয়েছিলাম। পারিনি! সে ক্রমশই সচল, গতিশীল ঝরনার মত নিজেকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েই জীবনকে খুঁজে নিতে চাইছিল। আমি আমার বয়স, গাম্ভীর্য আর আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বাইরে আসতে পারছিলাম না। চেষ্টার ত্রুটি করি নি। কিন্তু বীণা আমাকে ফেলে অন্য একটি সমবয়সী ছেলের সঙ্গে চলে গেছে। প্রায় বছর ঘুরতে চলল। ভাবতে পারিনি যে বীণা আমাকে 'ডিচ' করতে পারে।'

ঘরের মধ্যে একটা ভারি আবহাওয়া। চা কাপের গর্ভে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমার অস্বস্তি বোধ আমাকে স্থানুবৎ করে ফেলেছে। টেবিল দৃষ্টি হয়ে হাতের নখ খুঁটছি। মহামায়াদি চুপ করে ভাস্কবের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। ভাস্কর আবার বলল, 'জান মহামায়াদি, আত্মীয়স্বজনরা অনেক কটু কথা শুনিয়ে গেছেন। এমনিতে ওঁরা আসতেন না আমার বাড়িতে। এই ঘটনার পরে কিন্তু এসেছেন। এসেছেন সহানুভূতি জানাতে নয়, ধিক্কার দিতে। প্রতিবেশীরা অনেকেই মুখ টিপে হেসেছেন। তাই আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাব ঠিক করেছি। এক গ্রাম সম্পর্কের আত্মীয়কে ঘরের চাবি এবং দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি।' মহামায়াদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'তা, তোমার চাকরি? বিদেশের সংস্থান?' ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়েছিল, 'চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। পৈতৃক সম্পদ আর নিজের সঙ্গতি মিলে আমার তো যথেষ্টই আছে। চলে যাবে। ওখানে ডক্টরেটটা করে নেব। তার পরে ওখানেই যা হোক একটা নিয়ে থেকে যাব।'

ঘরের মধ্যে একটা থমথমে নীরবতা। আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করেই বোধহয় ভাস্কর বলেছিল, 'তোমাদের কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই, প্রীতি। দু'টো বছর একসঙ্গে কাটিয়েও আমি তোমাদের কাছে সাংখ্যের পুরুষ, 'ক্লিপ্টো'-সন্ন্যাসী, জড়দ্গব-ইত্যাদি নাম পেয়েছি! পারলে আমাকে

ক্ষমা ক'র।' আমি কিছু একটা বলতে পারলে ভাল হত টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই অবস্থায় আমার মুখে কোনও শব্দ যোগাল না। মুখটা তুলেই তাই আবার নামিয়ে নিয়েছিলাম। ভাস্কর মহামায়াদিকে বলেছিল, 'যদি আর ফিরে না আসি তাহলে জানবে যে আমি স্বস্তি পেয়েছি।'

সেদিন আর আমাদের কোনও কথা হয় নি। ভাস্কর চলে গেল। আমরা আপন আপন মনের ভাবনায় সমান্তরাল হয়ে চলেছিলাম অনেকক্ষণ। তারপর একসময়ে আমি উঠে পড়ে বলেছিলাম, 'যাই মহামায়াদি ?' মহামায়াদি আমাকে দরজা পর্যন্ত এসে প্রায় মৌন বিদায় দিয়েছিলেন। বুঝেছিলাম ভাস্কর আমাদের দু'জনের মনেই বয়ে চলেছিল একান্ত বিষাদের প্রবাহ রেখাটি হয়ে।

ভাস্কর রায় ফিরে এসেছিল। বছর ছ'সাত পরে। ডঃ ভাস্কর রায়। একটা বিরাট কোম্পানীতে এক্সিকিউটিভ হয়ে। সঙ্গে এনেছিল প্রায় দশ-বার বছরের বড় এক বিগত-যৌবনা জীবনসঙ্গিনী। ভাস্করের খবর দিতে গিয়ে মহামায়াদি বলেছিলেন, 'এটা বোধহয় ভাস্করের বিদ্রোহ। নারী জাতির প্রতি তার প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার প্রত্যুত্তর।' আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চেয়েছিলাম, 'সেটা কেমন ?' মহামায়াদি বলেছিলেন, 'ভাস্করের কথা শুনে আমার তাই মনে হয়েছে। খবর না দিয়েই এসেছে। কিন্তু এসেই আমার সঙ্গে দেখা করেছে। সব কথা বলে ভাস্কর কি বলেছে জান ? বলেছে 'তরুণী নিয়ে ঘর করতে গিয়ে দেখেছি যে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। বীণার সামনে চঞ্চল চপল জীবন অনবরত হাতছানি দিয়েছে। তাই সে স্থবির-কে ছেড়ে জঙ্গমের দিকে ছুটে গেছে। তাই দ্বিতীয়বার একই ভুল আমি করতে রাজি নই মহামায়াদি। এবারে প্রৌঢ়াকে সঙ্গী করেছি। তার সামনে ছটফট করার মতো জীবন আর অবশিষ্ট নেই। নিশ্চয়তা না পেলে জীবনকে ধরা যায় না যে!' আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'জীবনকে কি ভাস্কর ধরে রাখতে চায় পাখিকে যেমন খাঁচায় ধরে রাখা হয় ?' মহামায়াদি বলেছিলেন, 'ভাস্কর নিজেই কি জানে সে কি চায় ? অত্যন্ত ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত নেয় বলে মনে হয়।'

মহামায়াদির কাছে শুনেছিলাম। ভাস্কর এই বিয়ে করে যে এক প্রৌঢ়া মেম ঘরে এনেছে তার জন্যে আত্মীয়রা স্বজনরা প্রতিবেশীরা সকলেই ওকে ছি

ছি করছে। নিজের বাড়িতে এখন সে পরবাসী। দেড়খানা মত ঘর নিয়ে সস্ত্রীক স্থান পেয়েছে। সেই দূরের আত্মীয় আর এই বেকবাগানের কাছের স্বজনরা মিলে ভাস্করের দ্বিতল গৃহটিকে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে! এখন সামাজিক মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তারাই ভাস্করের সামনে দুটি মাত্র বিকল্প খোলা রেখেছে। হয় আইনআদালত থানাপুলিশ নয়ত গৃহত্যাগ। ভাস্কর দ্বিতীয়টি মেনে নিয়ে আর একটু দক্ষিণে একটা বাসস্থান কিনে নিনি-কে নিয়ে চলে গেছে। ভাস্কর অনেকটা খরচা করেই স্বস্তি কিনেছে বলা যায়। নিজে সে থাকে তার অফিসের কাজে আর বই-পত্রের মধ্যে মুখ গুঁজে। তার নিনি থাকে ক্লাব পার্টি আর মার্কেটিং নিয়ে। দু'জনে মিলে ওদের সহাবস্থান এমনি করেই চলে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে মহামায়াদির কাছে ভাস্করের খবর পাই। অন্যথা ভাস্কর আমাদের বিষয় হয়ে ওঠে না।

তা এমনিই একদিন মহামায়াদি জানালেন, 'জান প্রীতি, নিনি ভাস্করকে ছেড়ে চলে গেছে! টাকা পয়সা, সোনাদানা এবং নিজের নামের ব্যাঙ্ক ব্যালান্সটি ধীরে ধীরে নিপুণভাবে কুক্ষিগত করে চলেছিল। প্রায় ছিবড়ে অবস্থায় ভাস্কর এখন স্থাবর সম্পত্তি আর অস্থাবর চাকরিটি নিয়ে দ্বিতীয়বার নষ্ট নীড় জীবন যাপন করছে!' শুনে আমার কষ্ট বোধ হয়েছিল ভাস্করের জন্যে। আবার একধরণের যাথার্থ্যও যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম। জীবন তো খেলা করার বিষয় নয়, জীবন আমাদের নিয়ে খেলার অধিকারী। সেই জন্যেই বোধহয় আমরা জীবনকে নিষ্ঠুর বলি। সেই নিষ্ঠুরতার কতটা আমাদের নিজ নিজ অর্জন আর কতটাই বা জীবনের দান তা কে ঠিক করে দেবে?

দিন কারো মুখ চেয়ে বসে থাকে না, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ক্যালেন্ডার গুলোর মতো আমরা বছরগুলোকে পার করে দেই ধূসর স্মৃতির স্তূপে। একটা সময় আসে যখন জীবনটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। কোনও খবরই আর তেমন করে খবর হয়ে দেখা দেয় না কিন্তু যখন মহামায়াদির কাছে শুনলাম যে ভাস্কর হৃদরোগের আক্রমণে একাঙ্গ পঙ্গু হয়ে একেবারে স্থবির একাকিত্বে প্রায় অচল জীবন যাপন করছে তখন ওর জন্যে সত্যিই কষ্ট পেয়েছিলাম। জীবনের সঙ্গে ও অনেক ধৃষ্ট আচরণ করেছে। তাই বলে জীবন কি ওকে নিয়ে এতটা অকরুণ না হলেই পারত না? বীণা ওকে ছেড়ে গেছে। ভাস্কর প্রাণের অপ্রাচুর্যে তাকে ধরে রাখতে পারে নি। নিনি ওকে

ছেড়ে গেছে। অর্থসম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে সে নিনিকে ধরে রাখতে গিয়ে হারিয়েছে। নিনিকেও এবং সেই অর্থসম্পদকেও। মহামায়াদি বলেছিলেন 'জান প্রীতি, ভাস্কর এখন শুধু একাই নয়, একেবারে অসহায় একা। শরীরে এবং মনে। টাকাপয়সার তার অভাব নেই, অভাব আছে তার চারদিকে সর্বত্র ছড়িয়ে। দেখার কেউ নেই, খাদ্যের ব্যবস্থা অনিশ্চিত, অসুখে বিসুখে পাশে দুদণ্ড বসার মত একটি লোক নেই। ভাস্কর আমাকে চিঠি দিয়ে পরামর্শ চেয়েছে। একটি প্রস্তাব নিয়ে সে আমার মতামত চেয়েছে। কি বলি তা বুঝে পাচ্ছিনা।'

মহামায়াদি হয়তো বলার মত কিছু খুঁজেই পাননি। অথবা হয়তো নানান দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে দেখছিলেন, ভাস্কর কিন্তু ততদিনে সেই ষাটোর্ধ্ব জীবনে একাকিত্বের বজ্রদংশন থেকে বাঁচতে একটি নারীকে তৃতীয় বারের জন্যে ঘরে এনেছিল। এবারে সে আর জৈব সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখে বিয়ে করেনি, একেবারে নির্ভেজাল দিনযাপনের গ্লানি, অক্ষমতা আর অসহায়তার হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্যেই করেছিল। মহামায়াদিকে বলেছিল, 'তুলসীকে তুমি চেন। স্বামীহীনা পুত্রকন্যাদ্বারা বিতাড়িতা এই তুলসী স্বঘর এবং তিন চার বছরের ছোট। তাই তোমাদের এবং স্বজন পরিজনদের আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। তাকেই আমার দেখাশুনোর জন্যে বিয়ে করে এনেছি। বল ঠিক করি নি?' মহামায়াদি বলেছিলেন, 'করেই যখন ফেলেছো তখন আর ঠিক বেঠিকের বিচারের স্থান কোথায়? যে জন্যে করেছ যদি দেখা যায় তা সফল হয়েছে, তোমার মানসিক শান্তি আর শারীরিক দেখাশুনার যদি ব্যত্যয় না হয় তাহলেই ঠিক বলে মনে হবে!'

মহামায়াদির কাছে এই তুলসীর কথা শুনেছি। ছোটবেলা থেকেই মুখরা, ভোগসুখের দিকে অষ্টপ্রহর সজাগদৃষ্টি এই তুলসী বিবাহোত্তর জীবনে স্বামীকে দুটি পুত্র এবং একটি কন্যা ছাড়া আর কিছুই দেয় নি। দেশভাগের সময়ে পথিমধ্যে স্বামীকে হারিয়েছে। তারপরের দীর্ঘ ইতিহাসের শেষটুকুই মহামায়াদির জানা। তুলসীর ছেলেমেয়েরা যে যার মত করে জীবনকে খুঁজে নিয়েছে! তুলসী নিজের পাকস্থলীর চাপে এ-বাড়ি ও-বাড়ি কাজ করেছে। এই শেষ জীবনে চরৈবেতি যোগাযোগে আবার দেখা। ভাস্কর ওকেই গৃহকাজে লাগিয়েছে। টাকার অভাব ভাস্করের নেই তাই

তুলসী এককথায় সব কাজ ছেড়ে দিয়ে ভাস্করের গৃহে সর্বক্ষণের সেবিকা রাঁধুনীর কাজে বহাল হয়ে গেছে। হিসেবে তুলসী আঙুলের ব্যবহার করে, কাগজের নয়। কিন্তু ঠিকটি বুঝে নিতে তার অসুবিধা হয় না। সব বাড়ি মিলিয়ে যা সে পেত তার দ্বিগুণ মাইনেয় তুলসীও বেশ তুষ্ট পরিচারিকা।

আমি শুনে বলেছিলাম, 'তাহলে বেশতো চলছিল! ভাস্করের মাথায় বিয়ের ভূত চাপল কেন?' মহামায়াদি বলেছিলেন, 'সেইটাই তো ভাস্করের নিজস্বতা! বিবাহকে নিষ্কাম, প্রয়োজনভিত্তিক এবং স্থায়ী প্রমাণ করার জন্যে ওর সামনে আর সময়ও ছিল না সুযোগও ছিল না। ভাস্কর বলেছিল বীণা টিকল না চঞ্চল বয়সের গতির টানে, নিনি রইল না আর্থস্বাধীনতার মোহে, তাই এবারে তুলসীকে বিয়ে করলাম। তুলসীর বয়স নেই, আর্থস্বাধীনতার টান নেই। ও থাকবে আজীবন আমার সঙ্গে।'

আমি সহ্য করতে না পেরে বলেছিলাম, 'শুনেছি, আশায় মরে চাষা! তা, আজীবন জীবনতাড়িত আমেরিকা ফেরৎ ডক্টর ভাস্কর রায় যে এমন একটা মরণ ফাঁদকে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে স্বেচ্ছায় গলায় জড়িয়ে নেবে তা ভাবা যায় না!' মহামায়াদি কিন্তু কণ্ঠে সহানুভূতি মিশিয়ে বলেছিলেন, 'কাল ভাস্কর এসেছিল আমার কাছে অনুতাপ করতে। অনুতাপ আর অনুশোচনা করতে। একটা প্রশ্নই ওকে এখন কুরে কুরে খাচ্ছে। তার উত্তর ওর জানা নেই। আমার সাহায্য চাইতে ঐ অতটা পথ ছুটে এসেছিল ভাস্কর। বলেছিল—'আমি এখন কি করব? কি করতে পারি মহামায়াদি?' আমি অবাক হয়ে বলেছি, 'সে কি? তুলসী? তুলসীও কি চলে গেল নাকি?' মহামায়াদি বললেন, 'না তুলসী যায় নি। বরং বলা যায় এখন সে জাঁকিয়ে বসেছে। কাজকর্ম নিজে একেবারেই করে না। ভাস্করের দেখাশুনোর ভারও এখন তার মেয়ের হাতে। তুলসী তার ছেলেমেয়েদের খুঁজে এনে ভাস্করের বাড়িতে তুলেছে। বস্তির জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে আর ভাস্করের সম্পদ সম্পন্নতার তাপ পেয়ে তারা জীবনকে উপভোগের বিষয় করে তুলেছে। ওদের এখন মহোৎসব চলছে। দিনে রাত্রে ভাস্করের দিকে দৃষ্টি দেবার মত সময় নেই ওদের কারও। একা একতলার একপ্রান্তের একটা ঘরে ভাস্কর এখন এক হাট লোকের মধ্যে নির্বাসিত!

আমি অসহ্য যন্ত্রণায় বলে উঠেছিলাম, 'ওদের সবকটাকে তাড়িয়ে দিক। পুলিশে জানাক!' মহামায়াদি বলেছিলেন, 'সে কথা তুলসী কাটা কাটা করে ভাস্করকে বুঝিয়ে দিয়েছে। বিবাহিত স্ত্রীর অধিকার সে উকিলের কাছে জেনে নিয়েছে!' 'তাহলে? ভাস্করকে কি বললেন?' 'কিছুই বলি নি, বলতে পারিনি, লাঠিতে আর ড্রাইভারের কাঁধে ভর দিয়ে ভাস্কর চলে গেল কাল।'

আমরা অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসেছিলাম। আপন আপন মনে ভাবনার স্রোত তিরতির বয়ে চলেছিল। দু'জনেই যে ভাস্করকে নিয়ে ভাবছিলাম তা আমরা দু'জনেই জানতাম। তাই কেউ কোনও কথা বলিনি। ভাস্কর আমাদের অনুভবে নাড়া দিয়েছে। ভাস্কর, এবং তুলসীও। তবে তুলসী একা নয়। আমার চিন্তায় একের পর এক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিন থেকে ভাস্কর যেন ভেসে ভেসে চলেছিল। অদেখা বীণার কল্পনা করে করে, নিনির কথা ভেবে ভেবে তুলসীতে এসে থেমে গেলাম, বার বারই মনে হচ্ছিল জীবনের প্রতি ভাস্কর বিমুখ থেকেছে বলেই কি জীবন তাকে নিয়ে এমন একটা খেলা খেলল? সারা জীবনই ভাস্কর নির্বাসিত জীবন যাপন করল। কি ছিল তার অপরাধ? আর আজ এই শেষ বেলায় দুহাতে শেষবারের মতো জীবনকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে এই যে কর্দমাক্ত একাকিত্ব, এই যে অচেনা অজানা একপাল লোকের মধ্যে অবলম্বনহীন মৃতপ্রায় জীবন, এ-সবই কি ভাস্করের অনিবার্য পাওনা ছিল?

বললাম, 'মহামায়াদি, আজ চলি!' মহামায়াদি আমাকে স্বভাবসিদ্ধ মতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। ভাস্কর কিন্তু রয়েই গেল আমার মধ্যে, আমার ভাবনার মধ্যে। কতক্ষণ ছিল তা বলতে পারব না আর আজ। কখন যে সে হারিয়ে গেল তাও জানিনা, ভাস্কর আর ফিরে আসেনি। আপন গৃহের একান্ত নির্জনতায় কোন এক প্রায়ান্ধকার ঘরে জীবনের সবটুকু হারিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষাতেই হয়তো ভাস্কর তিল তিল করে জীবনেরই হিসেব মিটিয়ে দিতে চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করে আছে। আছে এবং থাকবে!

।। রুক্মিণী ।।

তখন আমার কাগজে কলমে বেশ মিতালি চলছে। একে অন্যকে প্রায় ছেড়ে থাকতেই চায় না। অনেকদিন ধরেই, কখনও সকালে কখনও বিকেলে ওদের দেখা হয়। একে অপরের বুকে মুখ রেখে অনেক কথা বলে। আরও বলতে চায়। কিন্তু সব কথা বলে শেষ করতে পারেনা। নানান কাজে আমার ডাক পড়ে। মুখ বন্ধ করে কলমকে চুপ করে যেতে হয়। কাগজ বেচারিও পড়ে থাকে নিজের বিছানায়, টেবিলশায়ী হয়ে। সে সব দিন গেছে অনেক দিন হল। অনেক কষ্টে তখন ওদের দেখা হত। সে প্রায় আট ন' বছর হবে। দেখা না-দেখার অব্যক্ত বেদনায় কলমের চোখে জল এসেছে। অনেক দিন সেজে গুজে এসেও কাগজ দেখা পায় নি কলমের। দিন যাপনের গ্লানি, কর্মের ঘানি, বাজারের থলি আর গৃহিনীর 'একবার শুনছ'-র গভীর টানে ঘটক-আমিই যখন উদ্‌ভ্রান্ত তখন ওদের চলছিল প্রথম প্রণয়।

এখন, অনেকদিন পরে, যখন ওদের দেখা সাক্ষাৎ বেশ ঘন ঘনই হতে পারে, অনেক কথা অকাতরে বলতে পারে, সকাল-বিকেল একমনে ওদের দুজনের মুখে-বুকে কথা বলা আমার বেশ ভাল লাগে। ওদের যেমন দীর্ঘ-প্রেম, আমারও তেমন অপরাহ্ণ বেলা। ধৈর্যের অভাব নেই। 'ওগো শুনছো' বছর দু'এক হল চির নিরুদ্দেশ যাত্রা করে আমাকে ছুটি দিয়ে গেছে। তাই আমি বহুসময় ওদের, ঐ কলম-কাগজের গুন গুন কথায় কাটিয়ে দেই। ভালই লাগে। আমার একাকিত্বও ওরা ওদের ভালবাসার আঁচল দিয়ে অমলিন মুছিয়ে দেয়।

এবারে, যার কথা প্রায়ই আমার মনে আসে, তার কথাটা বলি ?— সকালে ঘর মুছতে মুছতে রুক্মিণী আমাকে টেবিলে একমনে ওদের কথা শুনতে দেখে। আমার চেয়ারের পিছনটা ও মোছে না পাছে আমার মনোযোগ নষ্ট হয়, টেবিলের বাঁপাশে ও যায় না যদি আমি বিরক্ত হই। বিকেলে ও আসে প্রায় চারটের সময়। রুক্মিণী আমাদের ঘরের থালা-বাসন থেকে মেঝে ব্যালকনি সবই দেখাশুনো করে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আহ্বায়ক রুক্মিণী কথা কম বলে। যখন বলে তখন ওর মিষ্টি হাসিটি ওর সব কথায়, প্রথম

বন্ধনীটির মতো আমাদের দান করে উত্তর হিসেবে। সকলেই ওর এই মিষ্টি স্বভাবের প্রশংসা করে।

রুক্‌মিণী মধ্যবয়সী। বিধবা। মদ্রদেশীয় কিন্তু বাংলা পরিষ্কার বলে এবং বোঝে। আর বুঝবেই বা না কেন। এখানে, আমাদের পাড়াতেই তো ও রয়েছে প্রায় পঁচিশ বছর। রুক্‌মিণীর এক ছেলে দুই মেয়ে। কিন্তু এটাই ওর সংসার নয়। ওর বিরাট সংসার। আসলে ও পাঁচ-ছ'টি বিচ্ছিন্ন পরিবারের সহায়-সম্বল। আর কাজে একেবারেই ফাঁকি দিতে পারে না বলে সময়ের মধ্যে কোথায়ও ওর ফাঁক জোটে না। সকাল থেকে সন্ধ্যেপর্যন্ত রুক্‌মিণীর নিপাট কর্মযজ্ঞ চলে। রুক্‌মিণী চঞ্চলা। চঞ্চলা ও এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাবার সময়। ঘরে ও স্থির। ধীর। কিন্তু পূর্ণকলসীর ভর ভরাট স্থৈর্যে সব কাজ পূর্ণ করে। মুহূর্তে মুখে প্রথম বন্ধনীটি ঝুলিয়ে বলে "দাদাবাবু যাই?" অথবা "বৌদি যাচ্ছি"। রুকমিণীর যাওয়াটাও যেন সুন্দর। একটা বিদায় পর্ব যেন।

সবাই জানে এই বয়সে কলমে-কাগজে কথার কমতি পড়ে না। ওদের নাকি অফুরন্ত কথা থাকে। আমারও তাই বিশ্বাস। এক সময়ে অবশ্য মনে হত তরুণ-তরুণীদের, যুবক-যুবতীদের এতো কি কথা থাকে যা অনন্ত কালেও শেষ হয় না, শেষ হবার নয়। প্রকৃতি ওদের মধ্যে কতো কথার বীজ উপ্ত করেছেন যে সেই বীজ পত্রে-পুষ্পে গন্ধে-বর্ণে অসীম-অনন্ত হয়ে যাবে? কলমের বেলাতেও তাই। কলমও অফুরন্ত কথা বলার, কথা লেখার ঝরনা উৎস।

বিকেলে টেবিলে অলস বসে আছি। হাতে তেমন কোন ভাবনাও নেই। অন্যমনে সিগারেট পাকিয়ে সবে লাইটারটা মুখের কাছে এনেছি, পরিষ্কার শুনতে পেলাম: রুক্‌মিণীকে নিয়ে কিছু লেখ না!

আমার আর সন্দেহই রইল না। রুক্‌মিণী সবেমাত্র আমার ঘর ঝাড় দিয়ে দরজা দিয়ে ওঘরে পা বাড়িয়েছে অমনি আমার কলম কাগজকে ছেড়ে আমাকে নিয়ে পড়ল: 'রুক্‌মিণীকে নিয়ে লেখ, খুব ভাল হবে।'

কিন্তু রুক্‌মিণীর বিষয়ে তো আমি প্রায় কিছুই জানি না। তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে কলম যেন খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠলো: লিখতে গেলে কি সব জানতে হয়? তুমি কি ঐতিহাসিক, ইতিহাস লিখবে? তাহলে ভয় কেন?

মহাকবিকে নারদ কি বলেছিলেন ?' আমার বেশ রাগ হল। আমি কি মহাকবি ? আর তাছাড়া আমার কলম একথা জানলই বা কি করে ? এক শ্রেণীর হলেই কি এক জাতের হয় ? রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিকে দিয়ে যে কথা বলিয়েছেন সে তো অমর। সহস্রকথার এক কথা হয়ে আছে। রাগ করে একটা ধমক দেবো কি দেবো না ভাবছি এমন সময় ঃ 'আর এমন বলবনা, অত গম্ভীর হয়ে গেলে আমার কান্না পাবে,' বলে কলম দুঃখ প্রকাশ করল। মনে মনে ভাবলাম রুক্মিণী তো রামও নয় সীতাও নয় ; ওকে নিয়ে মহাকাব্যের প্রশ্নই ওঠে না যদিও মহাজীবনের বর্তমান পরিস্থিতিতে রুক্মিণীরা না থাকলে সব গৃহ-সংসারই তো পঙ্গু-অথর্ব হয়ে মুখ থুবড়ে থেমে যাবে। তবুও। ওরা কখনও নায়িকা হতে পারে না। বিষয় হয়ে আলোচ্য অবশ্যই হতে পারে।

আমার মনে হয় রুক্মিণীর খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয় নি। মানে আট-দশ বছরে হয় নি। তখন তো ও নিশ্চয়ই এখনকার মতো ধীরস্থির ছিল না। দেখে তো আমার মনে হয় চাঞ্চল্য ওর ভূষণ ছিল। ছট-ফটে, দুরন্ত, ছুটন্ত এবং অবশ্যই কথার ফুলঝুরি ছিল। কেন এ-কথা ভাবলাম ? প্রকৃতির নিয়মে, 'থিয়োরী অব্ কম্পেনসেশন্'-এর নীতিতে। আমি নিশ্চিত যে আমার অনুমান সঠিক। আট-দশ বছরের রুক্মিণী তাইই ছিল। সে তাই একদিকে তার মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছে আবার তাদের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে স্নেহ আর আদর আদায় করে নিয়েছে। ওর খেলা-পাতির জগৎ ছিল বেশ ছড়ান ছিটানো। ওর অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল। ও ছিল ওর দলের মধ্যে পাণ্ডা, সর্দার। কারণ রুক্মিণীর বর্ণটি মেঘলা, চোখ দু'টি কাজলকালো আর নিটোল মুখশ্রী। সর্দার হবার পক্ষে আর যা দরকার তা হল দাপট। রুক্মিণীর দাপটের অভাব ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না।

রুক্মিণী শহরে মানুষ হয় নি। ঠিক গ্রামও নয়। ওর জন্মস্থান আধাশহর। ওর বাবা লেখাপড়া খুব যে বেশি জানতো তা নয় তবে ধর্মবিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। রুক্মিণীর জন্মের পরে ওর মা-বাবা অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিল। নিজেদের জীবনকে পরিপূর্ণ করে পাবার বাসনায় উদ্বেলিত বোধ করেছে। অনেক আশা, অনেক ভবিষ্যৎ তারা তাদের এই মেয়েটির জন্মমুহূর্তেই উপ্ত দেখেছে। তাইতো তারা মেয়ের নাম রাখলো রুক্মিণী।

সেই অতটুকু মেয়েকে দেখেই তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছে। বাবার মতে মেয়ে তার মতো হয়েছে। আর কৃত্রিম মুখঝামটা দিয়ে মা বলেছে, 'কখ্খনো না, দেখছো না একেবারে আমার ছোটবেলাটা বসানো!'

আবার এই মেয়েই যখন তার পুতুল ঘরে নিজের মেয়ের বিয়ে নিয়ে মেতে উঠেছে, 'মেয়ে বড় হয়ে গেল, আর তো ঘরে রাখা যায় না, পাত্র একটা দেখতেই হয়'—বলে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় পাত্র খুঁজেছে তখন রুক্মিণীর মা-বাবা আবার ঝগড়া করেছে। মা বলেছে আমার মেয়ের জন্যে একটি সুন্দর পাত্র দেখ আব বাবা বলেছে 'কখ্খনো না! রুক্মিণী পড়াশুনো করবে, বড়ো হবে, শহরের লেখাপড়া জানা চাকুরে পাত্র দেখেই মেয়ের বিয়ে হবে। যে সে পাত্র চলবে না।' ওদিকে ধুমধাম করে রুকমিণী তার পুতুল মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, চোখের জলে মেয়েকে বিদায়ও দিয়েছে। কাজের অন্ত না পেয়ে সে সারা বাড়ি মাথায় করে নিয়েছে। অতিথিঅভ্যাগতদের দেখাশুনো ঠিক মতো হচ্ছে না, বরযাত্রীরা এসে পড়ল বলে, অথচ এখনো কনে সাজানোটাই হল না! বাবাকে উত্যক্ত করেছে, মাকে বিরক্ত করেছে। আর তারা মেয়ের দিকে, তার কর্মক্লান্ত মুখের আর ঘর্মসিক্ত দেহের চপল-চঞ্চল গতির দিকে স্মিত হাসিটি নিয়ে তাকিয়ে থেকেছে।

নিজের কন্যাসম্প্রদানের বেলা যখন শেষ করে সে নিজেই একদিন কনেটি সেজেছে তখন গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। হঠাৎই রুক্মিণী শাড়ি ধরেছে, শান্ত হয়ে গেছে। হরিণের মতো চলনটি শেষ হয়ে গেছে কিন্তু দৃষ্টিতে কাজল গভীরতা এসেছে। পুতুলের সংসার সে তার ছোটবোনকে নিঃশর্তে দান করে দিয়ে নিজেকে বাইরের থেকে ভিতরে নিয়ে এসেছে। এখন মা তাকে অনেক বেশি করে কাছে পায়, মায়ের চোখে স্নেহ গর্ব আর আনন্দ একই সঙ্গে মেয়ের সর্বাঙ্গ সিঞ্চন করে। বাবা দাওয়ায় বসে বিড়ি খেতে খেতে অনেক দূরের কল্পনা করে। শহরের ছেলে, লেখাপড়া জানা, চাকরি করা, ঘরে বছরের খাবার মজুদ। মেয়েকে নিয়ে আর ওদের ঝগড়া হয় না। মেয়ে বড় হয়ে গেছে। সে ধীরে চলে, আস্তে কথা বলে, সন্তর্পণে মাকে সাহায্য করে। রুক্মিণী তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেয়, দাওয়ায় ঝাড় দেয়, গৃহকে পরিচ্ছন্ন রাখে। বাবাকে যত্ন করে, মায়ের কাছে কাছে থাকে। ওর দেহ-পদ্মটি এখন সূর্যের জন্যে উন্মুক্ত হয়, ভ্রমরের গুঞ্জন

মনের সেতারে ঝংকার তোলে। হয়তো সে নিজেও জানে না কি সে খোঁজে। তার মনের গভীরে গান গুমরে গুমরে ফেরে। একটা বোবা অনুভব, প্রকাশে সংগীত হতে পারে না।

রুক্মিণীর বাবা হয়তো প্রথম বিশ্বাসই করতে পারে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সত্যিই ওর বিয়ের ঘণ্টা বাজালো তখন আশাতীতই ওদের দাওয়ায় তানপুরার পেলব মূর্ছনায় ধরা পড়ল। রুক্মিনী কলকাতায় যাবে। ছেলে সেখানেই একটি 'মিলে' কাজ করে। ওর বাবার নিকট বন্ধু খবর এনেছে ছেলের। ওর বাবার অপরিচিত নয় সেই পরিবার। এক দুই করে লাখকথাও একসময়ে শেষ হয়। এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াতেও সময় যায় অনেক। তাতে প্রস্তুতির সময় পায় ওদের পরিবার। রুক্মিণীর মনে কিসের ঝংকার ওঠে। অনাগত ভবিষ্যতের টানে ওর অপেক্ষার তীব্রতা ক্রমশই বাড়ে। বাড়ে ভয়, আশঙ্কা আর অনাগতের দোলদোলানি। সে কিছু বোঝে কিছু বোঝে না। সুর চেনা লাগে তো কথা হারিয়ে যায়, কথা সামনে এলে সুর কেটে যায়। একটা তরুণী মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ওর সর্ব অস্তিত্বকে যেন ধূপের গন্ধের মতো অষ্টপ্রহর ঘিরে রাখে! সদ্য পিছনে ফেলে আসা কৈশোরের ভূমিকম্প থেকে এখনও লাভা নিঃসরণ শেষ হয় নি, বাল্যের খেলাঘর হারিয়ে গেলেও তার স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল উপস্থিত, যৌবনের সমূহ পদধ্বনি দেহে-মনে টের পেলেও সে যে কি বারতা বয়ে আনে তা এখনও পরিষ্কার নয়, অর্থ তার জানা নেই, তাৎপর্যে আর সম্ভাবনায় সে সদা শঙ্কিত। রুক্মিণীর তাই মন সরে না, পা চলে না অন্তরের যত কথা ছিল সব যেন জমে গিয়ে থেমে যায়!

শাড়ি জড়ান দুরু-দুরু বুকে, পনেরো বছরের সকাল-দুপুর-বিকেলের আলোছায়া জীবনকে পিছনে ফেলে, একদিন রুক্মিণী এক অপরিচিত যুবকের হাত ধরে অথৈ জীবন-সাগরের দিকে পাড়ি জমালো। সে যা পেয়েছিল তার সাতগুণ সে হারিয়েছিল। সে হারাল তার পৃথিবী, তার খেলার সাথী, তার মা-বাবা তার যা কিছু নিকট আর আপন তার সবকিছুকেই। একদিনেই, এক লগ্নেই যেন সে ছিন্ন হয়ে দু'খানা হয়ে গেল। তার একটা অংশ পড়ে রইল ফেলে আসা ঘরের দাওয়ায়, তুলসীমঞ্চের পদতলে, তার খেলা ঘরের সংকীর্ণ কক্ষে, তার বন্ধুদের হাতে হাত-ধরে, আর প্রিয়জনের আঁচলের আড়ালে। তার আর একটা অংশ দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপ, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের

অতলান্ত গহ্বরে, ভয় আর বিস্ময়ে সাশ্রুনেত্র হয়ে মনের হাতটি বারে বারে বাড়িয়ে দিতে লাগল সেই অচেনার দিকে যে তার ভবিষ্যৎ, তার সবকিছু।

রুক্মিণী কলকাতার উপকণ্ঠে একটা নিশ্চিত আস্তানা পেল। পেল আশ্রয়, নৈকট্য। এবং ভালবাসা। একটা ঘর যাকে সে গৃহ বানাবে। ক্রমশ সে ভয় থেকে জয়ে পেঁাছল, শঙ্কা থেকে ডঙ্কা বাজিয়ে আপন করে নিল তার 'অপরিচিতকে'। সেই অপরিচিতকে যে এখন সব থেকে আপন, সকলের মধ্যেও প্রিয়তমজন। এই অনুভবে সে তার বেদনার সমুদ্রে রত্নের সন্ধান পেল, অনির্দেশ্য জীবন সাগর ব'লে যাকে মনে হয়েছিল তাকেই সে এখন অত্যন্ত সুপেয়-সুপরিসর দিঘি বলে উপলব্ধি করল।

রুকমিণী ক্রমশই নিজেকে খুঁজে পেতে লাগল। রাজনের সঙ্গে এখন সে স্বাভাবিক। রাজন তার স্বামী। রুক্মিণীর জীবনে এখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির আছে, আছে গঙ্গার ধার। বন্ধুবান্ধবের আসাযাওয়া আছে, ওরাও যায় এর ওর বাড়িতে। সিনেমা হলের ভিড়ের মধ্যেও এখন ওরা একা হতে পারে। দু'জনে মিলে যে একা-একা তার মধ্যে থাকে একাকিত্বের আনন্দ, দ্বিত্বের উদ্বেল অন্তর। রুক্মিণী গান জানে না। কিন্তু মাঝে মাঝেই ওর যেন গান পেয়ে বসে। কেউ কোথাও না থাকলে, রাজন যখন কাজে যায় তখন ওর হৃদয় গান গেয়ে ওঠে। ও গুন গুন করে বিবশ আনন্দে মাতোয়ারা বোধ করে। রুক্মিণীর লজ্জা করে! এ-ওর কি হল? ও-কি পাগল হয়ে যাবে?

দেশের পরিচিত জনেরা এলে রুক্মিণী এক গলা ঘোমটা টেনে কলাবউ হয়ে যায়। রাজনের নির্দেশ মতো সব কাজ করে। কথা নেই কাজ আছে। আর যখন ওরা দু'জনে একা একা থাকে তখন সে ছল-ছলাৎ তরুণীটি হয়ে খিল খিল হাসে, রাজনের সঙ্গে দুষ্টুমি করে, রাগায় আবার অভিমান ক'রে রাজনকে বিব্রত করে। দিনে দিনে দিন যায় মাসে মাসে বছর পার হয়। ওদের জীবন-ঝরনাটি নদী হয়ে শান্ত মোহনার দিকে চলতে থাকে।

এবং সেই চলনেই রাজন প্রথম বিব্রত বোধ করে। একা হতে ভয় পায়। অনেক কান্নাকাটি, অনেক মান অভিমান, বিচার বিবেচনার পর রাজন রুক্মিণীকে তার মায়ের কাছে রেখে আসে। সময় মতো ছুটি নিয়ে অবশ্যই উপস্থিত হবে এই কথা দিয়ে ফিরে আসে কলকাতায়। একা ঘরে

বিদায় মুহূর্তে রুক্মিণী কথায় নয় চোখের জলের ধারায় তার মনের কথা রাজনকে শতলক্ষবার করে বলে দিল। রাজন মনক্যামেরায় স্ত্রীর কথাকে ছবি করে নিয়ে এলো।

একটা সিগারেট পাকাব বলে কলমটিকে কাগজের বুকে রেখে হাতটি সবে ফাঁকা করেছি; আমার কলম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হেসে ফেলল! 'এ তো তুমি রুক্মিণীর নয়, সব মেয়ের কথাই লিখছ। সেই ছোট বেলা, তারুণ্য আর কুমারী যৌবনের সাধারণ গল্প। রুক্মিণী কোথায়?' ভাবলাম জবাব না দিলে হয়তো আরো কিছু বলবে। তাই বললাম—'কেন? রুক্মিণীর জীবন কি অন্য সকলের থেকে আলাদা হবে? রুক্মিণীতে আর তোমাতে প্রভেদ কি? সব কুমারী মনেই তো প্রথম কদম ফুল ফোটে, মৌমাছিরা আসে যায়, কুঁড়ি ক্রমশই পূর্ণতা পায় এবং একদিন স্থির হয়ে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। তাহলে?' একটুক্ষণ দুষ্টু দুষ্টু করে আমার চোখেব দিকে তাকাল, একবার চোখ বুলিয়ে নিল কাগজের নিস্তরঙ্গ পবিত্র মুখে। তার পরে ফিক করে হেসে বলল,—'আমার কথা কিন্তু আলাদা, আমার কথাটা অত সহজে প্রকাশ করতে পারবে না তুমি! আমার জটিল জীবন। তাকে যদি সহজ 'ফরমুলায়' কখনও ফেলে তোমার রং-তুলিতে ফুটিয়ে তুলবে তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!' বললাম—'তোমার তামাসা থামাও; আমি রুক্মিণীর কথায় ফিরে যাই। ওর ফেরার সময় হল।'

রুক্মিণী ফিরে এলো। এবারে তার পুতুল খেলার ঘরে কাপড়ের নয়, একেবারে তাজা, চঞ্চল একটি পুতুল এলো। সন্তান প্রসবের সময় রাজন ওর কাছেই ছিল। ছেলে হবার পরে সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখের ছবিটি সঙ্গে করে সে ফিরে এলো তার এক-দুই-তিন-দুই-এক-এর জীবনে। এদিকে রাজনের দিন কাটে না ওদিকে রুক্মিণীর রাত কাটে না। দিন-রাতের সেতুবন্ধন হয়ে স-পুত্র যখন সে রাজন-সান্নিধ্যে এলো তখন দেখা গেল ওদের ঊষার শিশিরবিন্দু দিনের পত্র-ছায়া আর রাতের শান্তি কখন যেন একটি মানব শিশু হয়ে ওদের দুজনের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। সে এক নোতুন দিগন্ত, নোতুন চেতনা, নোতুন অনুভব। হাসলে মানিক ঝরে, কাঁদলে জগৎ অন্ধকার। পুত্র যেন স্বর্গের চাইতে বেশি, দেবতার চাইতেও কাঙ্ক্ষিত,

বিশ্বের চাইতেও বরেণ্য। রুক্‌মিণী রাজনের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ভাবে রাজনের মতিভ্রম হল নাকি? সে কি তার রুক্‌মিণীকে ভুলে গেল। আবার রাজন খুঁজে পায় না তার রুকমিণীকে। কোথায় যেন হারিয়ে গেল সে। ছেলের মধ্যেই যেন সে সম্পূর্ণ হতে চায়। দু'জনেই এই যে তৃতীয় জনের মধ্যে মিশে গেল, হারিয়ে গেল তা নিয়ে কোনও বিবাদ নেই, দ্বন্দ্ব নেই। কেমন করে হয়?

সেই একই অনুভবে রুক্‌মিণী আরও দু'বার নিজেকে টুকরো করলো। একা ত্রিধা বিভক্ত হয়েও রাজনের চোখে হারাল না। সংসারী রুক্‌মিণী এখন আর তার অতীতকে কোথায়ও খুঁজে পায় না। সে যে তার অতীতকে খুব একটা খোঁজে তাও না। রাজনও নয়। সংসার তরণী ওদের জীবনের নদীতে তরতর করে ভেসে চলেছিল। রাজন ভাল কর্ণধার।

কিন্তু ঝড় এলো। বিধ্বংসী ঝড়। সব ওলট পালট হয়ে গেল। 'নৌকোডুবি' হল ওদের। রাজন চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল কিন্তু ওদের সংসার তীরে রেখে গেল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নিদারুণ একাকিত্বের বোঝা। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, মা-বাবা সকলেই ওদের দেশের বাড়িতে চলে যেতে বলেছিল। রুক্‌মিণী যায় নি। প্রলয়-এর প্রথম ঝটিকাঘাতকে প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় রুখে দিয়ে দ্বিতীয় সংগ্রামের জন্যে সে প্রস্তুত হতে লাগল। দেশের বাড়িতে ও গেল না! কারো উপর নির্ভর করলে ওর সন্তানদের কি হবে? অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা একদিকে আত্মীয়তাকে নিঃশেষ করে তিক্ত করে তুলবে অন্যদিকে সন্তানদের ভবিষ্যৎ অন্যহাতে চলে যাবে। তাই রুক্‌মিণী দৃঢ়-সিদ্ধান্ত নিল সে এখানেই থাকবে। কি করে চলবে? ও জানিয়ে দিল ওর স্বামীর কারখানায় ওর একটা কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে ও আশ্বাস পেয়েছে। স্বজনেরা যে যার দায় মিটিয়ে চলে গেল আর রুক্‌মিণী নিজের কাঁধে ভবিষ্যতের সব দায় বহন করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হল। ও জানে কারখানায় ওর কাজ হবে না; ও জানে দেশে গিয়ে অপরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করা যাবে না। মর্যাদার প্রশ্ন আসবে। তাই এখানেই দু'এক জন সজ্জন ব্যক্তির গৃহে গৃহ-সহায়িকার কাজ পেলে একই সঙ্গে অর্থের যোগান হবে এবং স্বাধীনতাও থাকবে। মিলের এক বাবুকে অনুরোধ করে সুরাহা হল। সেখানে কাজ ক'রে থাকার ব্যবস্থাটা হয়ে গেল। একে একে ওর

স্বভাবের জন্যে ও কাজ পেল আরও ক'একটি বাড়িতে। সবাই যে ভাল তা নয়; তবে চলে যায়, চলে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর প্রয়োজন ছিল আরও একটি বাড়ির কাজের।

এরকম এক সময়ে আমি এক সকালে গল্পের রাজার মতো 'যাকে দেখবো তাকেই সিংহাসনে বসাবো'—মন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলাম। গৃহ-সহায়িকা-ঝি সঙ্গে নিয়েই ফিরব। এই ছিল পণ। নানান কারণে আমাদের ঘরে ঝি থাকছিল না। কেউ পালাচ্ছে অপরের ভাঙানিতে, কেউ চুরির দায়ে বিতাড়িত হচ্ছে। কেউ বা এতবড় বাড়ি, এত ঘর দেখে 'না' করে দিচ্ছে। এদিকে ঘরে নববধূ, আমার পুত্রবধূ। মেয়ে যায় সাড়ে সাতটায় অফিসে, ছেলে যায় ন'টায়। এই বৌমা'টি কি করে? তাই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বের হলাম। প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল; দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও তাই। চতুর্থ প্রচেষ্টায় খুঁজে পেলাম রুক্মিণীকে। এলো, কথা বলল এবং কাজে লেগে গেল। রুক্মিণী একা নয়, ওর মেয়েটিও কাজে লেগে গেল।

রুক্মিণী পাঁচটি বাড়িতে কাজ করে। ওর সময় নেই। ও সকলেরই সুবিধা অসুবিধা দেখে, বোঝে এবং যথাসম্ভব সেই অনুযায়ী কাজ করে। তাই ওর অনেক ঝামেলা। কিন্তু পরিষ্কার মনের বলে ওকে সেই সব ঝামেলা তাড়া করতে পারে না। ওর সময় নেই বলেই অনেক বেশি কাজ ও করতে পারে। যে সব কাজ ওর করার কথা নয়, অসুবিধা দেখলে, সে সব রুক্মিণী নিজে থেকেই করে দিয়ে যায়।

রুক্মিণী স্বাধীন। মনে, কাজে, ব্যবহারে এবং চলনে-বলনে। সে অতীতকে ত্যাগ করেছে বলে ভবিষ্যতকে সোজাসুজি দেখতে পায়। নিজের বাল্য-কৈশোর যৌবন রুক্মিণীকে ভাবায় না কারণ এখন সে-সব ও ওর মেয়েদের মধ্যে দেখতে পায়। একটা ছেলে আছে। রুক্মিণী বলে, 'দাদাবাবু ছেলেটাকে একটা কাজ দিন না'।

রুক্মিণী ভাল আছে। অনেকের চাইতেই ভাল আছে। অন্তত তার একাকিত্বের বোঝা নেই। ওর কাজ আছে। অনেক কাজ। এখনুও ওর অনেক কাজ বাকি। সে সব ওর নিজের দায়। তাইতো ওর সময় নেই! ও শুধু ছুটছে ছুটছে আর ছুটছে। সামনেই তো ওর সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার তাগিদ। এই তাগিদ আসছে রুক্মিণীর মনের ভিতর থেকেই। ছেলে হয়ে, মেয়ে হয়ে ওকে চালিত করছে। রাজন নেই তাই রুক্মিণীর সময় নেই।

।। প্রেম-অপ্রেম ।।

কিছুদিন হল আমাদের লাগোয়া ফ্ল্যাটখানা আর ফাঁকা নেই। প্রথম দিকের ধুপ্-ধাপ্ ঘটাং-ঘট আওয়াজ এখন খুট্‌খাট্ টুক্‌টাক্ শব্দের স্বাভাবিক সংসারতরঙ্গে পেঁৗছে গেছে। প্রতিবেশী সকলের মনেই যেমন সম্ভাব্য আনন্দের অনুভব জাগায় তেমনি একটা কি-জানি-কি-হয় কি-জানি-কেমন-হবে-র সংশয়ও খোঁচা মারতে থাকে। কিন্তু সকলেই আমরা প্রথম দর্শনে হাস্যমুখের অভ্যর্থনায় সেই সম্ভাবনাকে আনন্দগর্ভ করে তুলতে চেষ্টা করি। তাই যখন আমার ঘরের প্রবেশদ্বারটি সুরেলা কণ্ঠে বহির্দ্বারে অতিথির আগমনবার্তাটি ভিতরে বাজিয়ে দিল তখন বেশ উৎফুল্ল বোধেই দরজা খুলে দিলাম। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অনুমানটুকু দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষে সত্য হয়ে জাগ্রত দাঁড়িয়ে। বললাম, এবং বোধহয় একটু অধিক মাত্রায় আবেগের কণ্ঠক্ষরণ ঘটিয়েই বললাম, 'আসুন, আসুন। আপনাকেই মনে মনে আশা করেছিলাম বোধহয়।' চোখের পাতায় কিছু দ্রুত কম্পন আর চোখের তারায় কিছু গভীরতার ছোঁয়া মিশিয়ে নবাগতা বলেছিলেন, 'সে তো তাহলে আমার সৌভাগ্য। আমি ফ্ল্যাটার্ড! আমি বলেছিলাম, 'আপনার ভাগ্যে যদি সু-এর অবস্থান থেকেই থাকে তা হলে তা খণ্ডানোর ক্ষমতা কারোই নেই। তবে আনন্দের ভাগ আমার। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সাধ আমার সেদিন থেকেই প্রবল যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি আমাদের ফ্ল্যাট কম্‌পাউন্ডে। আপনার পরিচয় আমার আগেই জানা হয়ে গেছে।' 'আমার পরিচয় আপনি জানেন? কী সর্বনাশ!' শুধুমাত্র বিস্ময় নয় যেন একটু ভয়ের ভাগও সেই উচ্চারণে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি আশ্বস্ত করার মত করে বলেছিলাম, 'সর্বনাশের কোনও আশংকা আপাতত নেই। পরিচয় বলতে প্রধানত যে দুটি দিকের উদ্ঘাটন বোঝায় তার একটা সামাজিক পরিচয় —রিলেশনস্, অন্যটি মনের পরিচয়। আপনি নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারেন কারণ দ্বিতীয়টি বিষয়ে আমার জানাটা শূন্য ছাড়িয়ে সংখ্যায় পেঁৗছোয় নি!'

· সেই যে হাঁফ ছেড়ে খিল্ খিল্ হাসিটি ঘরের-মধ্যে ছিটকে দিয়েছিলেন তা স্টিরিও হয়ে আমাদের সেই সদ্য পরিচয়কে একটা স্বাভাবিক সরসতা দান

করেছিল। মিস্ মিতা রায়। কলকাতার একটি স্বনামধন্য মহাবিদ্যালয়েব বাংলার অধ্যাপিকা। বদলীর চাকরিতে, বহুঘাটের জল খেয়ে না বলে বলা ভাল যে বহু ট্রেজারির তাড়া খেয়ে খেয়ে উত্তর চল্লিশে এই কলকাতা আগমন। ফ্ল্যাটখানা তার লটারিও যেমন, ভাগ্যের যোগাযোগও তেমন একাধারে মূর্ত করে দিয়েছে। কলকাতা থেকে বহু দূরে এক প্রত্যন্ত শহরে পৈত্রিক আবাস। মা-বাবার দুটি মাত্র কন্যাসন্তানের মধ্যে মিতাদেবী ছোট। বড় সীতা। মিতা থেকে প্রায় দশ বছরের বড়। সীতাও অধ্যাপিকা, অর্থনীতিব। সীতা সেন আমার সহকর্মী অধ্যাপক মিঃ সেনের পত্নী। গৌরব সেনের সঙ্গে এক সঙ্গে কিছুদিন কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তখন সম্পর্কের পরিচয়টুকু আমাব জানা হয়ে-গেছিল। সরকারের সৌজন্যে বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রী যখন নৈকট্যেব পোস্টিং পেলেন তখন থেকেই গৌরব সেন আমার কাছে হারিয়ে গেলেন। নানা কলেজ ঘুরে ঘুরে আমিও এখন কলকাতায়। আমার ভাগ্য এবং ফ্ল্যাটেব লটাবি সমপাতে আমি যেমন মালিক তেমনি মিতা রায়ও মালিক। সংলগ্ন ফ্ল্যাটেব মালিক, বা বলা উচিত, মাল্‌কিন। তা, সেই গৌরব সেনের চিঠিতেই আমি মিতা রায়-এর আগমনবার্তাটি আগেই পেয়ে গেছি।

একই কলেজের না হয়ে মিতা রায় যে আমার একই বয়সের হয়েছিল তা আমাদের নৈকট্যকে ত্বরান্বিত করেছিল। এবং প্রাঞ্জল। ক'দিন যেতে না যেতেই মিতা আমার স্ত্রীব কাছে ঘনিষ্ঠতর এবং পুত্রকন্যার কাছে ঘনিষ্ঠতম হয়ে দেখা দিল। মিতা যেদিন আমার সন্তানদের 'মাসি' সম্বোধনটুকুকে আলতো করে শুধরে দিয়ে 'পিসি' করে দিল সেদিন আমার মনে প্রথম মিতাকে ঘিরে আগ্রহ জন্মেছিল। সময়ের হিসেব করে সময় নষ্ট করে না আর মিতা। ওদের মায়েব সঙ্গে লেগে থাকা মিতা তো স্বভাবতই 'মাসি' হবার কথা। তা, মিতা পিসিই হয়ে গেল।

যে কাজ আমাদের সংসারের প্রয়োজন মেটায় তা রোজকার নয়। যে কাজ মনের খাদ্য যোগায় তা দৈনন্দিনের। প্রথমটা রোজগার, তাই বাইরে যেতে হয়। দ্বিতীয়টি সংগ্রহ, তাই ধীরে সুস্থে পড়ার টেবিলে মনোযোগ দাবি করে। আমার মনোযোগের মধ্যে মধ্যে সংসার ঢুকে পড়ে; স্ত্রীর প্রয়োজন অপ্রয়োজন, সন্তানদের ঝগড়া-বিবাদ এবং আমার নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা। মিতার এসবের বালাই নেই। একটি সর্বগুণসম্পন্না কম্বাইন্ড হ্যান্ড থাকায়

মিতার একক জীবনে বহুর অভ্যর্থনা সহজ হয়ে আছে। একটি দরজা খুলে অন্যটিতে টোকা দিলেই দুদিকের মনের দ্বার উন্মুক্ত হবার অবকাশ পেয়ে যায়। মিতার এই আনন্দময় রূপটি আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করে। স্ত্রী বলেন, 'কি মিষ্টি স্বভাব। কলেজে পড়ায়। অথচ এতটুকু গুমর নেই, কখনই গম্ভীর হয়ে থাকে না।' ছেলেমেয়েরা তো 'পিসি' বলতে অজ্ঞান। ওদের বই-এর জটিলতাও যেমন এখন পিসির সমাধান অপেক্ষায় সময় কাটায় তেমনি ওদের ঝগড়াঝাটিও এখন আর আমার এজলাসের প্রতীক্ষা করে না। আগে প্রায়ই যে সব ঢেউ আমার টেবিল পর্যন্ত আছড়িয়ে পড়ত অথবা রান্নাঘরের তাপকে বাড়িয়ে দিত সে সব যেন কোন ভোজবাজির ইন্দ্রজালে গতি পথ এবং তীব্রতা হারিয়ে ফেলে ওপ্রান্তের দ্বিতীয় দরজার আড়ালে নিরুত্তাপ হারিয়ে যাচ্ছে মনে হয়। আমাদের পরিচয়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় অনুচ্ছেদেই আপনি আজ্ঞে ব্যাপারগুলো মিতার অমিত আক্রমণে পর্যুদস্ত, পলায়নে গৃহছাড়া।

আমাদের বৈকালিক চা'এর আসরে মাঝে মধ্যেই মিতার উপস্থিতি আনন্দঘন হয়ে উষ্ণতা বাড়াত। এমনি এক বিকেলে স্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন, 'তা, তুমি বিয়ে করলে না কেন?' মিতা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, 'ব্যর্থপ্রেমের আগুন নেভাতে আর জ্বালা প্রশমন করতেই বেলা চলে গেল যে!' আমি স্ত্রীকে বলেছিলাম, 'এসব অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন বেদনার কারণ হতে পারে, অনাগত চা'-এর আসর গুলোকে তিক্ত করেও দিতে পারে। তাই এমন প্রশ্ন করতে নেই।' মিতা আমাকে বাধা দিয়ে বলেছিল, 'না দাদা, যে ক্ষত অপরের হস্তক্ষেপে টন্‌টন্ করে, যন্ত্রণার উৎসমুখ খুলে দেয় সেই ক্ষত ব্যক্তিগতও বটে এবং সেই হস্তক্ষেপ তিক্ততার কারণও বটে। আমার আর ক্ষত নেই, হিল্‌ড আপ হয়ে গেছে, তাই সে এখন অতীতের গল্প।' একটু যেন মজা করার লোভেই বলেছিলাম, 'তাহলে তো তা আমার সম্পত্তি হয়ে গেছে। গল্প যারই হোক না কেন, সেই গল্পে লেখকের বা গল্পকারের অধিকার সাহিত্য স্বীকৃত। সবিশেষ, যদি সেই গল্প প্রেমের হয় এবং বেদনার পরিসমাপ্তিতে ট্রাজেডীর উপজীব্য হয়। তাহলে সেই প্রেম উপাখ্যানে রক্তক্ষরা নায়িকার চাইতে অনুভূতিশীল শ্রোতার বা পাঠকের অধিকার সমধিক হয়ে ওঠে।' মিতা পিছিয়ে না গিয়ে দু'কদম এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'সে

কথা সর্বৈব সত্য। কিন্তু সাহিত্যিক বা গল্পকার যে শিব গড়তে বাঁদর গড়বেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তখন যে অতীতের ব্যর্থ প্রেমের রক্তক্ষরণের সঙ্গে বর্তমানের ব্যর্থ উপস্থাপনার বেদনা যোগ হয়ে যন্ত্রণাকে অধিকতর তাজা করে তুলবে!' আমি বলেছিলাম, 'পরীক্ষা দিতে রাজি। অক্ষম প্রমাণে 'গল্প ফেরৎ-এর বদলে 'গল্প-উৎসর্গের' কড়ার রইল।' সেদিনের চা আসর বেশ হাল্কা মেজাজেই শেষ হয়েছিল।

কি একটা কারণে যেন সকল স্কুল কলেজ ছুটি ছিল। ছেলেমেয়ে পড়ার কাজ শেষ করে আপন মনেই অপাঠ্যের অকাজে ব্যালকনির অধিকার নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে। রান্নাঘরের কাজ বেড়ে যায় ছুটির দিনে। ছ্যাঁক-ছোঁক ভেসে ভেসে আসছে সেই রসনার তুষ্টি আর পাকস্থলীর পুষ্টি কেন্দ্র থেকে। মূর্তিমান ছুটির আনন্দ হয়ে মিতা ঘরে ঢুকেই ঘোষণা করল, 'খাতা কলম নিয়ে বসে যাও। আমি খনন শুরু করছি জীবনের। তিনটি জীবনের। তুমি নোটস্ নিতে থাক!' আমার যেন কেমন সব গুলিয়ে যেতে চাইল। যদি ব্যর্থ প্রেমের আগ্নেয় অতীত হয়, যদি সেই অতীতে বেদনার কোনও উৎসমুখ লুকিয়ে থাকে তাহলে মিতা এমন সরস ভঙ্গিতে আর সাবলীল ঢঙে সে তথ্যের উদ্ঘাটন প্রস্তাবটি রাখল কেমন করে? জীবনের যত অশ্রু ও পান করেছে প্রেমের শত-পদী অনুভবে সে সবই কি ওর অন্তরে কবিতা হয়ে ছন্দের ঝংকার হয়ে গেছে?' মিতার দিকে আমি উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

'প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগের কথা।' মিতা বলতে লাগল। 'প্রথম বর্ষের বাংলা সাম্মানিক শ্রেণীর ছাত্রী। পড়াশুনোর দিকে আমার মন ছিল না—এ অভিযোগ আমার মা-বাবা কখনও করেন নি। কিন্তু আমার মাথাটা যে দিদির মত পরিষ্কার নয়, বরং একটু আধটু ঘষামাজার অপেক্ষা রাখে সে বিষয়ে আমার মা-বাবা, দিদিঅন্তপ্রাণ, একমত। তা, সেই প্রথম থেকেই আমার জন্যে একজন যোগ্য শিক্ষকের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই ব্যবস্থা করতে দিদিকে বেশি বেগ পেতে হল না। নিজে অধ্যাপিকা, তাই সেই দূর বঙ্গের প্রত্যন্ত শহরের একমাত্র কলেজের সর্বকনিষ্ঠ উজ্জ্বল অধ্যাপক রত্নটিকেই আমার তালিমের জন্যে যোগাযোগ করলো এবং ধরে নিয়ে এলো। সদ্য বিদ্যালয় ছেড়ে কলেজে প্রবেশ করেছি। কলেজের গণ্ডূষ সময়ে আমার

শফরীর মত ফর্‌ফরায়মান জীবনে, অন্য সকলের মতই, বালকতুল্য এই জি. এস—গৌরব সেন—আমাকে লজ্জায় ফেলেছিল। লজ্জা আমার নিজের জন্যে নয়, গৌরব সেনের কারণেই। দু'চারদিন সবে ক্লাস করেছি। এক দুই তিন জন করে করে আমরা জি. এস. কে গৌরবদা বানিয়ে ফেলেছি। বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকেরা গুরুও বটেন গম্ভীরও বটেন। একমাত্র এই সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে, নিজের স্বজন পরিজন ছেড়ে আসা, দূর-দেশে নির্বাসিত তরুণটিই ছিল আমাদের সকলের দৃষ্টিভোজের ঝাড়লণ্ঠন। গড় বাঙালী মাপের প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি কিন্তু আর্য বর্ণ ও সৌম্য দীপ্তি গৌরবদাকে একটা অপ্রায়শদৃষ্ট দ্যুতি দান করেছিল। প্রথম প্রথম বলেই বোধহয় সহশিক্ষা কলেজের ক্লাস নিতে তিনি পিরিয়ডের প্রায় সর্বক্ষণই হাজিরা খাতার খোলা পৃষ্ঠায় নতদৃষ্টি থাকতেন। কদাচিৎ আমাদের কারো দিকে, মেয়েদের চোখে, চোখ পড়ে গেলে 'লো ভোল্টেজ টিউব লাইটের মত ফিনকার করে গৌরবদার আঁখি পাতা যেন থরথর কেঁপে উঠত। আমরা মজা পেতাম ; এবং আরও মজা করার জন্যে অকারণ কোনও প্রশ্ন করে সেই থরথর পল্লবের আড়ালে গৌরবদার পারাবত হৃদয়ের সন্ধান করতাম !

তা, দিদি যখন গৌরবদাকেই আমার গৃহ-শিক্ষক করে দিলেন তখন পাঠ কক্ষের একান্ত নৈকট্যে আমার চোখের পাতা লো ভোল্টেজের আক্রমণে যেন অ র উর্ধ্বমুখ কিরণ দানে অক্ষম হয়ে গেল। পরিচয়পর্বের প্রথম দিনেই বুঝে গেলাম যে দলের মধ্যে যা চঞ্চলতা-চপলতা হয়ে ঝরঝর করে চারদিকে ঠিকরোতে পারে, সেই আবার একান্ত হলে কেমন থরথর কেঁপে কেঁপে উঠতে পারে। পড়াশুনো শুরু হবার আগেই তাই কি যেন একটা লুকোচুরির আভাস পেলাম। দৃষ্টির লুকোচুরি। সে যে শুধু প্রাথমিক পরিচয়ের লজ্জা নয়, তার চাইতেও কিছু বেশি, কিছু গভীর তা যেন আমার অনুভবে সির সির করে বয়ে যেত। গৌরবদার অবস্থাও যে তথৈবচ তা বুঝতে আমার বুদ্ধি বা অনুমানের দরকার পড়ে নি। প্রকৃতি সব তরুণীদের মনে যে একটা মাইন্ড-ওয়েভ ধরার এ্যানটিনা স্বাভাবিকভাবেই ফিট্ করে দেয় তাতেই যুবক মনের নড়াচড়া ভাব-অনুভব ধরা পড়ে যায়।

সেই প্রথমদিন থেকেই আমরা দু'জনে দু'জনের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। মনে মনে। পঠনপাঠনের প্রস্তর কঠিন আবরণের ফাঁকে ফোকরে

মনের কিশলয় উদ্ভিন্ন হয়ে সকরুণ অপেক্ষায় তিরতির করতে থাকে। টের পাই। হয়ত বা চোখের পাতায় সেই শ্যামলের ছায়াও পড়ে। কিন্তু বিষয়বস্তুর মেঘ প্রাণের সূর্যালোক বন্ধ করে দিয়ে ফোটোসিন্‌থেসিস্‌ ঘটাতে দেয় না। কিন্তু যে প্রান্তরে দুটি নদী বহে বেগে, সমবেগে, সেখানে সিলেবাসের কী ক্ষমতা যে সেই নিরন্তর বহমান স্রোতের অগ্রগমন চিররুদ্ধ করে রাখে? বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্রোতধারা আর ফল্গু থাকেনি ফাল্গুনের আকাশের নিচে প্রবাহ পেতে থেকেছে। কলেজের ক্লাসরুম আর গৃহের পঠনকক্ষ ছাড়িয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি প্রান্তরের পার্শ্বে, আর কখনও নদীর পাড়ে। সিলেবাসের বাঁধন আলগা হয়ে হয়ে খুলে খুলে যায়। অনাস্বাদিত কবিতায়, অপূর্ব গানে আর বাঙ্‌ময় নীরবতায় আমরা ততদিনে সিলেবাসের ছিলে ছিঁড়ে আকাশের নীলে মনের প্রতিফলন খুঁজতে ব্যস্ত। আমার বন্ধুবান্ধবীরা তাদের নিজ নিজ মনের রান্নাঘরে আর অন্তরের পাকশালায় আমাদের ভবিষ্যতের পদ-প্রকরণ-মেনু নিয়ে ব্যস্ত। কারো চোখে ঈর্ষার আগুন, কারো দৃষ্টিতে অন্তর্দহনের জ্বালা। আবার কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে উপন্যাসের শিহরণ উপভোগের বাসনায় আপন হয়ে উঠতে ব্যস্ত, অনুসূয়া-প্রিয়ম্বদা হয়ে শকুন্তলার মনের ছোঁয়ায় নিজেদের উষ্ণতা বোধকে তাপে তৃপ্ত করে চলেছে। শরতের আকাশটাই আমাদের যৌথ মনের বিচরণক্ষেত্র হয়ে গেছে। ভাবনাচিন্তা কল্পনা পরিকল্পনা সেই আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু না! পরীক্ষা ব্যাপারটা কে বা কারা প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন তা জানি না। তবে তাঁরা যে নির্ঘাৎ মনে বৃদ্ধ এবং হৃদয়ে জড় ছিলেন তা আমরা, বিশেষ করে আমি, হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছিলাম। দ্বিতীয় বছরটি আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে বই-মুখ করে পাঠ-ঘরের খাঁচায় আবদ্ধ করে দিল। বড়রা বললেন হৃদয়ের বেলুনে চেপে জীবনের পথ বেশিদূর পার হওয়া যাবে না, সেখানে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্রের মূল্য অনেক বেশি। তাই বাধ্য হয়েই আকাশকে মনের মধ্যে আটকা রেখে সিলেবাসের মৃত্তিকায় পা রাখতে কৃতসংকল্প হলাম। পাঠকক্ষের এবং হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করে হুমড়ি খেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম সময়ের, দুঃখ সময়ের অবসানের, পরীক্ষান্ত অর্জনের এবং মুক্তির।

মিতা থেমে গেল। মনে হল যেন অতীতকে ও মনে মনে সাজিয়ে নিতে চাইছে। অথবা অঙ্ক বদলের আগে যেমন ড্রপসিন ফেলে মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন ঘটানো হয় তা'ও হতে পারে। সেই ফাঁকে আমি বলেছিলাম, 'তা, তোমরা এই যে খোলা মেলা প্রেম করছিলে, আধাশহরের ছোট্ট পরিসরে, অধ্যাপক ছাত্রীতে মিলে, তাতে কোনও গোলমাল ঘটে নি?'

'গোলমাল ঘটেছিল এবং অত্যন্ত গভীরভাবেই ঘটেছিল। সেই কথায় পরে আসছি।' মিতা যেন আমার 'গোলমাল' কথাটাকেই প্রকাশ করে বলার জন্যে লাইফবেল্ট করে নিল। বলল, 'অত্যন্ত আধুনিক বলে আমাদের পরিবারের নাম ছিল, বিশেষ করে আমার মা-বাবার। চিন্তা ভাবনায় আমরা স্বচ্ছতাকেই কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করতাম। প্রকাশে এবং আচরণেও। তাই দু'চার জোড়া চোখ জানালা পথে আমাদের সেই সব দিনের আকাশ-মন পথচারণ নিরীক্ষণ করেছিল কিনা অথবা দু'চারটি পরিবারের বাড়া ভাতের কল্পথালায় ভস্ম পরিবেশন করেছিল কিনা তা আমরা ভেবে দেখি নি। পরিচিত সকলেই আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন, অপরিচিতরা যথাসময়েই তাঁদের উৎকণ্ঠার পরিসমাপ্তি খুঁজে পেতেন। গোলমাল সেখানে ছিল না। আমাদের পরিবারে ক্যানসারের ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো আমার দিদির চেহারায় আমার প্রেমদেহে বৃশ্চিক রোগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।'

আমি হঠাৎই যেন আরব সাহারার মরুপথে অসহায় পথভ্রষ্ট বেদুইন, উদয় সূর্যের মৃত্যুতাপে আহত বোধ করতে লাগলাম। একটা অস্বস্তি, একটা অচিন্তপূর্ব ভয়, যেন আমার মধ্যে শীতল স্রোতের মত গুরুমস্তিষ্কের শিকড় থেকে ধীরে ধীরে মেরুপ্রবাহী হয়ে নিম্নমুখী নেমে যেতে লাগল। মিতার কণ্ঠস্বরে আমার সম্বিত ফিরে এলো। বলল, 'আমার অধ্যাপিকা দিদি বছরে দু'তিনবার বাড়ি আসত। দীর্ঘ সময় থেকেও যেত। হৈ হৈ করে কাটাতো। রান্নাঘরে মাকে ছুটি দিয়ে খাবার বানাতে আমাকে হাঁক ডাক করত। বাজারের থলি হাতে ভোর বেলায় ছুট দিত পছন্দ মত মাছ কিনবে বলে। বিকেলে কাউকে না কাউকে সঙ্গে করে দোকানে দোকানে ঘুরত, বেছেবেছে এটা ওটা কিনত আর যাকে তাকে বিলি করে দিত। দিদি ছিল আমাদের সকলেরই প্রাণের পাখি। ওর এই আবির্ভাবের হঠাৎ হঠাৎ পক্ষতাড়নায় আমরা উজ্জ্বল বোধ করতাম। মা বলতেন—হবে না? মেয়ে কার দেখতে হবে তো? বাবা বলতেন তা'ত' বটেই তা'ত' বটেই। তবে প্রাণ প্রতিষ্ঠার শিল্পী যে এই আমি তা'ত' ভুললে চলবে না। আমি ওদের দুজনকে বাধা দিয়ে দিদির পাশে বসে বলতাম—দিদি কার সেটাই আসল। আমার মত ছোট বোন না থাকলে সীতা রায়ের মত দিদি হতে পারে?'

বলেই আমি দিদিকে সাক্ষী মানতাম—তুমিই বল দিদি ?' একটা আনন্দের ঢেউ যেন সকলের মনের কূলে ধ্বনিময় ঘুরে ঘুরে বেড়াত।'

আমি মেয়ে, ছাত্রী এবং বোন। দিদি মেয়ে সহকর্মী এবং অভিভাবক। দিদির সঙ্গে গৌরবদা দীর্ঘ সময় আলোচনায় মগ্ন থাকে। বিষয়ের তাদের অভাব নেই। রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, গান, গানের ভাষা, গান কি কণ্ঠের দান না গায়কের অবদান এবং ইত্যাদি সহস্র বিষয় ওদের মতানৈক্যের ঝড়ে আর মতৈক্যের আনন্দবাতাসে উড়ে যায় আবার কাছেও আসে। বারে বারেই আসে। ওদের একবারের বৈঠক অসমাপ্ত থেকে পরবর্তী বৈঠককে সমূহ করে তোলে। একবারের ছুটি স্বল্পতার ছাপ পেয়ে পরের বারের ছুটিকে ত্বরান্বিত করে তোলে। পরীক্ষার সমূহ চাপে আমার আকাশ হারিয়ে গেছিল, ওদের সমস্যা-আলোচনা-বিশ্লেষণ আমার হৃদয়ের কণ্ঠটিকেও যেন শৃঙ্খলিত করে দিল। দিদির আসাটা বাড়তে লাগল, গৌরবদার ছুটিগুলো আমাদের সেই এঁদো শহরের নির্জনতায় কেমন যেন প্রাণের স্পর্শ খুঁজে পেল।

গৌরবদা আমাকে পড়ানোতে সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। এক মন এক লক্ষ্য হয়ে আমাকে পরীক্ষার ঘাটে পৌঁছে দিতে যেন কৃতসংকল্প। বই থেকে মুখ তুলে শৈবত আকাশে এতটুকু ফুট কাটার সময় পাই না। প্রেমিকের বদলে গুরুভার গুরুগিরি আমার প্রাপ্য হয়। ভাল রেজাল্টের নৈবেদ্যের উপর নাকি ভালবাসার কুঁড়িটি বেশি সুন্দর। গৌরবদা বলত। আরও বলত—প্রেমের সময় অনন্ত কাল ধরে পাওয়া যাবে, পরীক্ষার জন্যে আছে সময়ের অসীম কৃপণতা। তাই এই সময়টা হিসেব করে কাটান দরকার। বেহিসেবী সময় হাতে পেলে আবার আগের মত যথেচ্ছ খরচ করা যাবে।

পরীক্ষা শেষের প্রথম অবকাশেই তাই যখন বলেছিলাম 'গৌরবদা এবারে আমাদের যথেচ্ছ খরচের সময় এসে গেছে'—তখন গৌরবদা একটুখানি হেসে বলেছিলো 'ঐ যথেচ্ছাটুকুর মধ্যেই, যথা-ইচ্ছা ব্যাপারটার মধ্যেই তো আমাদের মনের মালিকানা মার খেয়ে যায়। তোমার এখনকার ইচ্ছার সঙ্গে পরের ইচ্ছা যে মিলবেই তার কি কিছু ঠিকানা আছে ? আমার তখনকার ইচ্ছার ?' তখনও আমি গৌরবদাকে বুঝিনি, এই এতদিন পরেও যে তাকে বুঝেছি তা বলতে পারব না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি দাদা, সেদিনের গৌরবকে, গৌরবের কথাকে না বুঝলেও কোথায়ও যে একটা ছন্দ পতন ঘটে গেছে তা টের পেয়েছিলাম। টের পেয়ে ভয়ও পেয়েছিলাম। একটা অজানা ভয়, একটা শংকা যেন আমার মনটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দিয়েছিল। আমি বোধহয় আমার উৎকণ্ঠাকে চেপে রাখতে পারি নি সেদিন। বলেছিলাম, 'কি

বলছ তুমি গৌরব? কি বলতে চাইছ?' আমার চোখ ফেটে কান্না ঝরে পড়েছিল। গৌরব আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল। তার কণ্ঠটিও সেদিন বেশ ভারি শোনাচ্ছিল। বলেছিল, 'বড় হলে বুঝবে মিতা। জীবনে সময়ের সিন্ধুর চাইতে কখনও কখনও মুহূর্তের বিন্দুগুলো দানবের মত বড় হয়ে দেখা দেয়। সিন্ধু দেয় প্রসারের পরিসর আর বিন্দুরা গ্রাস করে নিতে পারে। প্রকৃতির এই অঘটন-ঘটন পটুত্বই তো আমাদের জীবনের কক্ষপথ স্থির করে দেয়।' সেদিন আমি আর কোন কথা বলি নি। বলতে আমার ইচ্ছে করে নি। গৌরব বোধহয় অনেক কথা বলেছিল, আমি শুনি নি, মন দেই নি। তার পরে কখন যেন এক সময়ে উঠে চলে এসেছি।

একটা বেদনাবোধ আমার মনের মধ্যে অনেকক্ষণই আমাকে তাড়না করে চলেছিল। সুযোগ পেয়ে বলে ফেললাম, 'থাক মিতা, তোমাকে আর বলতে হবে না। একটা কষ্টবোধ তোমাকে এই এতদিন পরেও বেশ পীড়ন করছে। আমার শুনে কাজ নেই।' এমন সময় আমার স্ত্রী দুকাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। টি টেবিলে চা রেখে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বলে গেল, 'সেই তখন থেকে ওকে বকাচ্ছ। ওকে একটু বিশ্রাম দিলেও তো পার। তোমরা, লেখকরা, বড্ড স্বার্থপর। কণ্ঠে মৌন আর কলমে মুখর। অপরের জীবন নিয়েই তোমাদের কারবার!' আমি স্ত্রীর দিকে চেয়ে হেসে ফেললাম। মিতা একটু হাসার চেষ্টা করেই থেমে গেল!

তার পরের ইতিহাস প্রেমের আর অপ্রেমের। প্রেমের অংশে অসীম নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত এবং পরিবর্তন। অপ্রেমের অংশে দীর্ঘ জীবনের পথ পরিক্রমা অনুতাপ অনুশোচনা। মিতা বলেছিল। সীতা চলে এলো বদলী হয়ে সেই প্রত্যন্ত দেশের আধাশহরে। গৌরবের হাত ধরে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে শপথ পাঠ করে স্বামী-স্ত্রী হয়ে এলো। প্রেমের নাটকে পাত্রীবদল দেখে পরিচিত চোখগুলো গোল গোল হয়ে গেল। অপরিচিত উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিগুলো প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে এঁকে একে-ওকে খুঁজে বেড়ালো। অনুসূয়া প্রিয়ম্বদারা সহানুভূতি জানাতে এসে শকুন্তলাকেই খুঁজে পেল না। মিতা দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়। স্থান-কাল পাত্রের এহেন নাটকীয় পরিবর্তনে মিতার মা-বাবা নীরব-নির্বাক হয়ে গেলেন। মিতা তাঁদের আশ্বস্ত করে আর দিদিকে স্বাধীনতা দিয়ে স্থানত্যাগ করল। গৌরবের সঙ্গে সে দেখা করেনি। তবে দিদিকে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে গৌরব মুক্ত। গৌরব স্বাধীন। প্রার্থনা করেছে যেন অন্ধকার তার চলার পথকে কালো না করে, যেন রোদ্দুর তার জীবনের প্রাপ্তিকে আলো দিতে থাকে।

তার পর মিতা সতর্ক থেকে জীবনের চড়াই-উতরাই পার হয়েছে, সচেষ্ট

থেকে সম্ভাব্য প্রেমের আবর্তগুলো একে একে পার হয়ে এসেছে। অতীত নিয়ে তার আবাহন নেই বিসর্জনও নেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে সে দুর্ভাবনার কারণ ঘটায় না। বর্তমানকে নিয়ে সে নিজের মত করে খেলা করে, মনের মত করে খেলা করে, মনের মত করে সাজায় আর সংগ্রহের মত হলে ধরে রাখে।

কিন্তু মিতার দুঃখ তার দিদিকে নিয়ে, গৌরবের অগৌরব নিয়ে। প্রকৃতির মধ্যেই জীবনকে বেঁচে নিতে হয়, প্রকৃতির জন্যে নয়। তাই আজ সীতা-গৌরবের জীবনে একটি মাত্র সন্তান ছাড়া অপার দূরত্ব মরুভূমির তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মত 'আনব্রিজেবল' গ্যাপ তৈরি করে ফেলতে পারল। মনের অনুশোচনার জ্বালায়, দেহের ক্ষীয়মাণ শক্তির অনটনে, রোগব্যাধির জর্জর দহনে তার দিদি এখন জীবন্মৃত। কলেজে যাতায়াতের পথটুকু ছাড়া সকল পথই সে ত্যাগ করেছে, শ্রেণীকক্ষের অনির্দিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীছাড়া জনসংযোগ জীবন থেকে বাতিল করে দিয়ে চার দেয়ালের ঘেরাটোপে একেবারে একা একটা একান্ত জীবন যাপনের গ্লানি তার দিদিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সন্তানের জন্যে যেটুকু টান তা সেবিকার, মায়ের নয়। প্রায় অপ্রকৃতিস্থ এই জীবনটা তার দিদির কাছে একটা বিষম বোঝার মত, পাগলীর আলুথালু আঁচলের মত ভস্ম সন্ন্যাসীর জটার মত জড়িয়ে আছে।

আর তার গৌরবদা, গৌরব? একমুখ দাড়িগোঁফের আড়ালে এক জোড়া অসহায় চোখ। এককালে সেই চোখে চঞ্চলতা ছিল, ছিল উজ্জ্বলতা। গৌরব এখন সকাল কাটায় সন্তানের সঙ্গে, দুপুর কাটায় কলেজের স্টাফ রুমে আর সন্ধ্যাগুলোর ইজারা দিয়ে দিয়েছে গৃহের বাইরে সহজলভ্য জীবনের বেদনা উপশমের সন্ধানে। জীবন এতটা নিষ্ঠুর না হলেই পারত গৌরবের জন্যে। তার সীতাদি এতটাই পলায়নী না হয়ে গৌরবকে এবং নিজেকে এতটা শাস্তি না দিলেই পারত।

মিতার কথা শুনতে শুনতে বার বারই আমার কল্পনার চোখে গৌরব আর সীতার চেহারা ভেসে উঠছিল। বার বার ভেবেও কোন কূলকিনারা পেলাম না কেন এমন দুটি প্রাণ ব্যর্থ হতে বাধ্য; কেন ওরা পথহারা আপনহারা বেপথু জীবনের আবর্তে হারিয়ে যেতে বসেছে? একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কি কিছুই নেই ওদের জন্যে উৎসর্গ করার?

মিতা জানতে চেয়েছিল তার কি করণীয় ছিল। বলেছিল, 'তুমিই বল দাদা, ওদের এই শতছিন্ন দুর্বহ-দুঃসহ জীবনে আমার কোন অবদান আছে?'